মা

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের বই

উপন্যাস

ফাঁদ
ভালোবাসা, আমি তোমার জন্যে কাঁদছি
চিয়ারি বা বুদু ওরাঁও কেন দেশত্যাগ করেছিল
বীর প্রতীকের খোঁজে
হৃদিতা
মা

শিশুসাহিত্য

শিপরা

সমগ্র

প্রথম চার উপন্যাস
প্রেমের চার উপন্যাস

মা

আনিসুল হক

সময় প্রকাশন

মা
আনিসুল হক
স্বত্ব : পদ্য পারমিতা

৪র্থ মুদ্রণ (বর্ধিত সংস্করণ) : জুন ২০০৩
৩য় মুদ্রণ : মার্চ ২০০৩
২য় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০০৩
১ম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০০৩

সময় ৪২২
প্রকাশক
ফরিদ আহমেদ
সময় প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
সময় কম্পিউটার্স
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা

মুদ্রণ
সালমানী প্রিন্টার্স, নয়াবাজার, ঢাকা

মূল্য : দুইশত টাকা মাত্র

MAA a novel by Anisul Hoque, First Published : Book Fair 2003 by Farid Ahmed, Somoy Prakashan, 38/2ka Banglabazar, Dhaka.
Web : www.somoy.com E-mail : somoy@somoy.com
Writer's E-mail : anisulhoquem@yahoo.com

Price : Tk. 200.00 Only

ISBN 984-458-422-1

উৎসর্গ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নিয়ুত শহীদের প্রত্যেকের মা-কে

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

মা বই হিসাবে প্রকাশিত হওয়ার পর আমি আরো তিনজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণের সুযোগ পাই। তাঁরা হলেনঃ শহীদ আজাদের আরেক খালাতো ভাই, আজাদের ধরা পড়ার রাতে গুলিবিদ্ধ মুসলেহ উদ্দিন চৌধুরী টগর, আজাদের আরেক সার্বক্ষণিক সঙ্গী ক্রিকেটার সৈয়দ আশরাফুল হক এবং তাঁদের আরেক বন্ধু ইব্রাহিম সাবের। তাঁদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রাপ্ত কিছু তথ্য ও ঘটনা আমার কাছে অপরিহার্য বিবেচিত হওয়ায় এই বইয়ে তা সংযুক্ত না করে পারলাম না। এর বাইরেও কিছু সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন করা হলো, যা হয়তো প্রথম সংস্করণের চেয়ে এই সংস্করণটাকে কিছুটা পরিপূর্ণ করে তুলবে।
উপন্যাসের ব্যাপারে আমি একটা পুরনো সূত্র এখনও মাথা থেকে তাড়াতে পারি না—কী বলা হলো তার চেয়েও কীভাবে বলা হলো, সেটা গুরুত্বপূর্ণ।

মা বই হিসাবে প্রকাশিত হওয়ার পর সর্বস্তরের পাঠকের কাছ থেকে আমি যে সাড়া পেয়েছি—এরই মধ্যে এটির তিনটি মুদ্রণ হয়ে গেছে, এবং এটি এ বইয়ের চতুর্থ মুদ্রণ—শুধু বিক্রি বড় কথা নয়, পড়ার পর পাঠকের প্রতিক্রিয়াটাই হলো আসল, সেই জায়গায় আমি অভিভূত। শ্রদ্ধেয় জ্যেষ্ঠ লেখক থেকে শুরু করে তরুণ প্রজন্মের রাগী/অনুরাগী সদস্যটিও যেভাবে আমাকে ফোনে/চিঠিতে/ই-মেইলে/আলোচনায়/সাক্ষাতে তাদের ভালো লাগার কথা জানিয়েছেন, তাতে আমি সত্যি অনুপ্রাণিত।

আমি জানি, এই ভালোবাসা বা ভালো লাগাটা আমার কৃতিত্ব নয়; এটা আসলে দেশের জন্যে, মুক্তিযুদ্ধের জন্যে, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে, শহীদদের জন্যে, মায়ের জন্যে, সন্তানের জন্যে মানুষের ভালোবাসারই উৎসারণ।

দ্বিতীয় সংস্করণটির পাণ্ডুলিপিও সংশোধন করে দেওয়ার জন্যে দিয়েছিলাম সাপ্তাহিক ২০০০-এর সম্পাদক মুক্তিযোদ্ধা শ্রদ্ধেয় শাহাদত চৌধুরীকে। তিনি দ্বিতীয়বারও কষ্ট করে বইখানা পড়েছেন। তারপর একটা মন্তব্য জুড়ে দিয়েছেন : 'এটা ডকু-ফিকশন। তোমার লেখায় ঢাকার গেরিলাদের চিত্রটা তো চমৎকার এসেছে। আমিও তো অনেক কথা ভুলে গিয়েছিলাম। তোমার উপন্যাস পড়ে মনে পড়ল। তুমি যেভাবে দেখেছ, শুনেছ, সেভাবেই থাকুক। ঘটনা কিন্তু একেকজন একেকভাবে ব্যাখ্যা করে। সেইভাবে দেখলে সংশোধন করাটা দরকারি নয়।'

তথাস্তু। নানা জনের কাছে শুনে, নানা বইপত্র ঘেঁটে যা পেয়েছি, সেভাবেই থাকুক। তবে কুশীলবদের কারো যদি মনে হয়, বড় রকমের কোনো ভুল রয়ে গেছে, নিশ্চয় ভবিষ্যতে সেটা সংশোধনের চেষ্টা করব।

আসলে তো, এরপরও ভুলত্রুটি থাকবে এবং থাকবে বিরূপ সমালোচনাও, তা থেকে আমরা আবারও নিশ্চিত হতে পারব যে আমরা কাজ করছি।

আনিসুল হক
১লা এপ্রিল, ২০০৩

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

এই কাহিনীর সন্ধান সর্বপ্রথম আমাকে দেন মুক্তিযোদ্ধা নাট্যজন নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু। তারপর অনেক দিন এই কাহিনী আমাকে তাড়িয়ে ফেরে। অতঃপর আমি একটা উপন্যাস লেখার আশায় মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে শুরু করি। শহীদ আজাদের আত্মীয়স্বজনের খোঁজ পাওয়ার জন্যে আমি পত্রিকায় বিজ্ঞাপনও দিয়েছিলাম। বিজ্ঞাপনের সূত্র ধরেই শহীদ আজাদ সম্পর্কে যাঁরা জানেন, এমন অনেকের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। তাঁরা আমাকে দিনের পর দিন তথ্য দিয়ে, উপাত্ত দিয়ে সাহায্য করেছেন। যাঁদের সাক্ষাৎকার আমি নিয়েছি, তাঁদের নামের তালিকা এ বইয়ের শেষে সংযুক্ত করে দিলাম। তাঁদের সকলের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। আর বেশ কিছু বইয়েরও সাহায্য দরকার হয়েছে। সেই তালিকাটাও এই বইয়ের শেষে থাকল।

এই উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে আমি নানা জনের কাছ থেকে উৎসাহ, অনুপ্রেরণা পেয়েছি। ফেরদৌস আহমেদ জায়েদের কথা এখানে বিশেষভাবে উলেখ করতে হয়। সাপ্তাহিক ২০০০-এর সম্পাদক শাহাদত চৌধুরী আমাকে দিনের পর দিন সময় দিয়েছেন, সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, উৎসাহ দিয়েছেন এবং এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি সংশোধন করে দিয়েছেন। তাঁদের কাছে আমার ঋণ জীবনেও শোধ হওয়ার নয়।

এই উপন্যাস রচনাকালে এবং ঈদসংখ্যা প্রথম আলো ২০০২-এ এর সংক্ষিপ্ত রূপ প্রকাশের পর অনেকের কাছ থেকেই আমি অনেক উৎসাহ পেয়েছি। বিশেষ করে পাঠকেরা, তাঁরা ঈদসংখ্যা প্রথম আলো পড়ে এবং সাপ্তাহিক ২০০০-এ ১৬ ডিসেম্বর ২০০২-এ প্রকাশিত আমার লেখা প্রচ্ছদকাহিনী শহীদ আজাদের মায়ের সন্ধানে পড়ে ফোনে, চিঠিতে ও সরাসরি কথা বলে আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন। আলাদা করে আমি আর তাঁদের নাম বলতে চাই না, তাঁরা নিশ্চয়ই এই লেখা থেকেই আমার কৃতজ্ঞতাটুকু গ্রহণ করে নেবেন।

এখন একটা দরকারি কথা। এই উপন্যাস সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত। তবে এটা ইতিহাস নয়, উপন্যাস। ইংরেজিতে যাকে বলে ফিকশন। ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোর বেলায় সত্যতা রক্ষার চেষ্টা করেছি পুরোপুরি। যেমন শহীদ আজাদের চিঠিগুলো আসল। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ঘটনাগুলোর বেলায় অনেক জায়গায় কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছে, এটা বোধহয় বলাই বাহুল্য। সব ফিকশনেই এটা নেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মিলি-সংক্রান্ত বিবরণগুলো পুরোটাই বানানো। কিন্তু একটি মেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়ার কথা আজাদ নিজেই লিখেছিলেন তাঁর মাকে লেখা চিঠিতে।

এই উপন্যাস কাউকে আঘাত দেওয়ার বাসনা থেকে রচিত নয়, বরং বাঙালির এক বীরোচিত আখ্যানকে তুলে ধরার আশায় লিখিত ও প্রকাশিত। যদি কোনো অংশ কাউকে সামান্যতম অস্বস্তিতে ফেলে, তবে আমি তাঁকে বলব, ওই অংশটুকু সম্পূর্ণ কাল্পনিক ধরে নেবেন।
প্রিয় পাঠক, আপনার মঙ্গল হোক, মঙ্গল হোক এই দেশটার।

এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা
২৪ জানুয়ারি, ২০০৩

আনিসুল হক

আজাদের মা মারা গেছেন গতকাল বিকালে, পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে আজাদের ধরা পড়ার ঠিক ১৪ বছরের মাথায়, একই দিনে।

আজ তাঁর দাফন।

আলোকোজ্জ্বল শারদীয় দুপুর। আকাশ ঘন নীল। বর্ষাধোয়া গাছগাছালির সবুজ পাতায় রৌদ্ররশ্মি আছড়ে পড়ে পিছলে যাচ্ছে স্বর্ণলতার মতো। শেওলা-ধরা ঘরবাড়ি দরদালানগুলো রোদে শুকুচ্ছে, যেন তারা বিছানা-বালিশ, বর্ষার আর্দ্রতা তাড়াতে তাদের কে যেন মেলে দিয়েছে রোদে। রাস্তার কারুকার্যময় রিকশাগুলো ঝকমক করছে আলোয় আলোয়। রিকশার ঘন্টির ক্রিং ক্রিং আওয়াজও যেন রোদে ঝিলিক দিচ্ছে। এই চনমনে রোদের নিচে জুরাইন গোরস্তান চত্বরে সমবেত হয়েছেন এক দল শবযাত্রী। তাঁদের মধ্যে অনেকেই মুক্তিযোদ্ধা। গোরস্তানের সীমানা-প্রাচীরের বাইরে রাস্তায় গাড়িতে বসে আছেন জাহানারা ইমাম।

আজাদের মাকে সমাহিত করা হবে একটু পরেই।

আজ ৩১শে আগস্ট। ১৯৮৫ সাল। গতকাল, ৩০শে আগস্ট, আজাদের মা মারা গেছেন। ১৪ বছর আগে, ১৯৭১ সালের ৩০শে আগস্ট রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা আজাদকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। আজাদ আর ফিরে আসেনি। এটা শহরের অনেক মুক্তিযোদ্ধারই জানা যে, এই ১৪টা বছর আজাদের মা একটা দানা ভাতও মুখে দেননি, কেবল একবেলা রুটি খেয়ে থেকেছেন; কারণ তাঁর একমাত্র ছেলে আজাদ তাঁর কাছে ১৪ বছর আগে একদিন ভাত খেতে চেয়েছিল; পরদিন তিনি ভাত নিয়ে গিয়েছিলেন রমনা থানায়, কিন্তু ছেলের দেখা আর পাননি। তিনি অপেক্ষা করেছেন ১৪টা বছর, ছেলের আগমনের আশায় পথের দিকে চেয়ে থেকে। অপেক্ষার এই ১৪টা বছর তিনি কোনো দিন বিছানায় শোননি, শানের মেঝেতে শুয়েছেন, কি শীত কি গ্রীষ্ম, তাঁর ছিল একটাই পাষাণশয্যা, কারণ তাঁর ছেলে আজাদ শোওয়ার জন্যে রমনা কি তেজগাঁ থানায়, কি তেজগাঁ ড্রাম ফ্যাক্টরি সংলগ্ন এমপি হোস্টেলের মিলিটারি টর্চার সেলে বিছানা পায়নি।

শহরের মুক্তিযোদ্ধারা, বিশেষ করে যাঁরা ছিলেন আরবান গেরিলা দলের সদস্য, তাঁরা এসেছেন আজাদের মায়ের দাফনে শরিক হতে। আজাদের মা মারা যাওয়ার আগে বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি মারা যাচ্ছেন, তিনি তাঁর ভাগ্নে জায়েদকে বলে রেখেছিলেন যেন আত্মীয়স্বজন কাউকে তাঁর মৃত্যুসংবাদ অবহিত না করা হয়; কিন্তু জায়েদ মুক্তিযোদ্ধাদের খবরটা না দিয়ে পারে না। জায়েদের কোমরে আর উরুতে আছে বুলেট বের করে নেওয়ার ক্ষতচিহ্ন, ১৪ বছর আগে এই ৩০শে আগস্টের রাত্রির শূন্য ঘণ্টায় পাকিস্তানি সৈন্যদের ছোড়া বুলেট তার শরীরে বিদ্ধ হয়েছিল, তারপর থেকে সে সারাক্ষণ ভুগে আসছে হাত-পা-শরীরের অস্বাভাবিক জ্বলুনিতে। এই জায়েদ মুক্তিযোদ্ধা কাজী কামালকে ফোন করে আজাদের মায়ের মৃত্যুসংবাদ অবহিত করে। আম্মার মারা যাওয়ার খবরটা-এই খালাকে জায়েদরা ডাকত আম্মা বলে-মিসেস জাহানারা ইমামকে জানানোও জায়েদ অবশ্যকর্তব্য বলে জ্ঞান করে। কারণ জাহানারা ইমাম আর কেউ নন, রুমীর আম্মা; আজাদ দাদার বন্ধু, সহযোদ্ধা, সহ-শহীদ রুমী ভাইয়ের আম্মা। ১৯৭১ থেকে ১৯৮৫-সন্তানের জন্যে নীরবে অপেক্ষা করা, আর পথ চেয়ে থাকা, আর ক্রমশ চারদিক থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার এই ১৪টা অন্ধকার নির্জন করুণ বছরে আজাদের মায়ের কাছে যে অল্প কজন সুহৃদ আসতেন, তাঁর খোঁজখবর নিতেন, তাঁর মনের ভেতরের দুষ্পাঠ্য শিলালিপি পাঠ করতে পারতেন সমবেদনার সঙ্গে, জাহানারা ইমাম তাঁদের একজন।

জাহানারা ইমাম অতঃপর রুমীর সহযোদ্ধা বন্ধুদের খবর দিতে থাকেন; শাহাদত চৌধুরী থেকে ফতেহ চৌধুরী, হাবিবুল আলম থেকে নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু, রাইসুল ইসলাম আসাদ থেকে চুল্লু-ভাই, আবুল বারক আলভী থেকে শহীদুলাহ খান বাদল, সামাদ, মাহবুব, হ্যারিস, উলফত, লিনু বিলাহ, হিউবার্ট রোজারিও-সবাই খবর পেয়ে যান-আজাদের মা মারা গেছেন, তাঁর দাফন হবে জুরাইন গোরস্তানে। জনা তিরিশেক মুক্তিযোদ্ধার কেউ সরাসরি, কেউবা শাহজাহানপুরে আজাদের মায়ের বাসা ঘুরে এসে জুরাইন গোরস্তান এলাকায় জড়ো হয়েছেন।

নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চুর স্মৃতিতে আজাদের মায়ের দাফনের দৃশ্যটাও চিরস্থায়ীভাবে সংরক্ষিত হয়ে যায়। তাঁর মাথায় একটা প্রশ্নবোধক চিহ্নও চিরকালের মতো আঁকা হয়ে যায়-শরৎকালের এ রৌদ্রোজ্জ্বল দিনটায় বেলা ১২টার ঘন নীল আকাশ থেকে বৃষ্টি নামল কীভাবে। আজাদের মায়ের শবদেহ খাটিয়ায় করে বয়ে চলেছেন মুক্তিযোদ্ধারা, জুরাইন গোরস্তানের দিকে। জুরাইন গোরস্তানটা দেখতে অন্য যে-কোনো গোরস্তানের মতোই-কিছু কাঁচা কবর, কিছু পাকা; পাকা কবরগুলোর কোনোটার চারদিকে কেবল ৫ ইঞ্চি ইটের দেয়াল, পলেস্তারাহীন, শেওলা-লাগা, আবার কোনোটা মার্বেল পাথরে ঢাকা, এপিটাফে নামধাম জন্মমৃত্যুসনতারিখ, কোনো কোনো সমাধিসৌধ বেশ জলুসপূর্ণ, তাতে নানা রঙিন কাচ-পাথর বসানো, কোনোটায় টাইলস বসানো, দু-তিন দিন বয়সী কবরের মাটি এখনও ঝুরঝুরে, শিয়রে খেজুরপাতা, একটা

কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দুহাত তুলে চোখ বন্ধ করে মোনাজাত করছে দুজন টুপি-মাথা শাদা-পাঞ্জাবি তরুণ-এসব দৃশ্যের মধ্যে এমন কিছু নাই যা আলাদা করে চোখে পড়বে। আম্মা, জাহানারা ইমাম, গোরস্তানের মধ্যে মহিলাদের ঢোকা শাস্ত্রসম্মত নয় বলে বাইরে রাস্তায় বসে আছেন গাড়িতে, আর মুক্তিযোদ্ধাদের এ দলটা এগিয়ে যাচ্ছেন যুদ্ধে হারিয়ে যাওয়া এক সহযোদ্ধার মাকে খাটিয়ায় তুলে নিয়ে। সঙ্গে মরহুমার কিছুসংখ্যক আত্মীয়স্বজন। তাদের অনেকের মাথায় টুপি। কবরে নামানো হয় শাদা কাফনে মোড়ানো নাতিদীর্ঘ শরীরটাকে, প্রথম মাটিটা দিতে বলা হয় আজাদের খালাতো ভাই জায়েদকে, জায়েদ কথার মানে বুঝতে পারে না, তাকিয়ে থাকে নির্বাক আর নিষ্ক্রিয়, তখন একজন তাকে ধরে তার হাতে একমুঠো মাটি তুলে দেয়, এবং মাটিটা ফেলে দেওয়ার জন্যে তার আঙুলগুলো আলগা করে ধরে, জায়েদের হাত থেকে মাটি ঝরে যায়। তারপর একজন একজন করে মুক্তিযোদ্ধা গোরে মাটি দিতে থাকেন, ঠিক তখনই নির্মেঘ আলোকোজ্জ্বল আকাশ থেকে ঝিরঝির করে নেমে আসে বৃষ্টি। একই সঙ্গে প্রতিটা মুক্তিযোদ্ধার ঘ্রাণেন্দ্রিয়তে একটা অজানা মিষ্টি সুগন্ধ হানা দেয়, আর তাঁরা মাথার ওপরে তাকালে দেখতে পান একখণ্ড বিচ্ছিন্ন মেঘ। রোদ আর বৃষ্টি একসঙ্গে পড়াটা এই বাংলায় কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা নয়, রোদ হচ্ছে বৃষ্টি হচ্ছে খেঁকশিয়ালির বিয়ে হচ্ছে-ছোটবেলা থেকে এ ছড়াটা কারই বা জানা নাই, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রতিটা মুক্তিযোদ্ধার মনে হতে থাকে-এই সুগন্ধ, এই সালোক বৃষ্টির অন্য কোনো মানে আছে; তাঁদের মনে হয়-এই শবযাত্রীদলে তাঁদের হারিয়ে যাওয়া শহীদ-বন্ধুরা ফিরে এসেছে, যোগ দিয়েছে। বাচ্চু এর পরে বহু বছর এ আফসোস করবেন যে কেন তাঁরা সেদিন ঘাড় ঘোরাননি, ঘোরালেই তো দেখতে পেতেন যুদ্ধদিনে চিরতরে হারিয়ে ফেলা তাঁর সহযোদ্ধা বন্ধুদের অনেককেই, আবার এই ১৪ বছর পরে; হাতের এতটা কাছে তিনি পেয়ে যেতেন শহীদ জুয়েলকে, পূর্ব পাকিস্তানের সেরা ব্যাটসম্যান জুয়েল, যার হাতে গুলি লেগেছিল বলে ধরা পড়ার রাতেও ডান হাতের আঙুলে ছিল ব্যান্ডেজ, সেই ব্যান্ডেজঅলা আঙুলেই জুয়েল কবরে মাটি দিচ্ছে; দেখতে পেতেন শহীদ বদিকে, স্ট্যান্ড করা ছাত্র বদিউল আলম হয়তো আলবেয়ার কামুর আউটসাইডারটা প্যান্টের কোমরে গুঁজে এক হাতে মাটি দিচ্ছে সমাধিতে; দেখতে পেতেন শহীদ আজাদকে, মরহুমার একমাত্র সন্তান হিসেবে যে এসেছে কর্তব্য পালন করতে, মায়ের শেষকৃত্যে অংশ নিতে; কিন্তু যার পকেটে এখনও আছে জর্জ হ্যারিসনের গানের নিজের হাতে লেখা কপি, মাই ফ্রেন্ড কেম টু মি, স্যাডনেস ইন হিজ আইস...বাংলা দেশ, বাংলা দেশ, সে যেন জর্জ হ্যারিসনের মতোই ভাঙা উচ্চারণে গাইছে ব্যাংলা দেশ, ব্যাংলা দেশ আর গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলের মতো মাটি ছিটিয়ে ঢেকে দিচ্ছে কবরখানি। আবুল বারক আলভী দেখতে পান শহীদ আলতাফ মাহমুদকে, যে-কোদাল দিয়ে একাত্তরের ৩০শে আগস্ট ভোরে তিনি তাঁর রাজারবাগের বাসার আঙিনায় লুকিয়ে রাখা অস্ত্র তুলছিলেন মিলিটারির বেয়নটের খোঁচা খেতে খেতে, সেই কোদাল নিয়েই এসে গেছেন আলতাফ মাহমুদ, একটু একটু করে মাটি ঢালছেন গোরে। তাঁর কপালে বেয়নটের একটা খোঁচা লাগায় ভুরুর ওপর থেকে চামড়া কেটে নেমে গিয়ে ঝুলে আছে কপালের ওপর, এখনও, যেমনটা ছিল ১৪ বছর আগের সেই ভোরে। আজ তাঁর মুখে যেন আবার বেজে উঠছে অস্ফুট সুর, তারই নিজের কম্পোজিশন : আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি। হয়তো শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের এই ভিড়ে এসেছে শহীদ বাকের, এসেছে শহীদ আশফাকুস সামাদ, এসেছে আজাদদের বাসায় থাকা পেয়িং গেস্ট মর্নিং নিউজের সাংবাদিক শহীদ বাশার। এসেছে শহীদ আজাদের সহযোদ্ধা আরো আরো শহীদ মুক্তিযোদ্ধারা।

আজাদের মাকে সমাহিত করে প্রথানুযায়ী দোয়া-দরুদ পড়ে মোনাজাত সেরে একে একে গোরস্তান ছেড়ে চলে আসেন শবযাত্রীদলের সবাই। জায়েদ কবরের গায়ে মরহুমার একটামাত্র পরিচয় উৎকীর্ণ করে রাখে : শহীদ আজাদের মা। এই তাঁর একমাত্র পরিচয়। তাঁর আর কোনো পরিচয়ের দরকার নাই। এই পরিচয়-ফলক দেখে কেউ কেউ, যেমন আজাদের দূর-সম্পর্কের মামারা, সরোষে এ মত প্রদান করেছিলেন যে কবরের গায়ে মুসলমান মহিলার অবশ্যই স্বামীর নাম থাকা উচিত, কিন্তু জায়েদ নাছোড়, 'আম্মা মরার আগে আমারে স্পষ্ট ভাষায় কইয়া গেছে, বাবা রে, আমি যাইতেছি, তুমি এইটা এইটা কইরো, এইটা এইটা কইরো না, আম্মার হুকুম, কবরের গায়ে একটাই পরিচয় থাকব, শহীদ আজাদের মা। ব্যস আর কিছু না।'

১৯৮৫ সালের শরতেই শুধু নয়, তারও এক দশক দু দশক পরে, যে জিয়ারতকারীরা বা শবযাত্রীরা জুরাইন গোরস্তানে যাবে, যদি লক্ষ করে, তারা দেখতে পাবে একটি কবরের গায়ে এই নিরাভরণ পরিচয়-ফলকখানি: মোসাম্মৎ সাফিয়া বেগম, শহীদ আজাদের মা। কী জানি, তাদের মনে কোনো প্রশ্ন জাগবে কি জাগবে না। কিন্তু জায়েদ জানে, এ ছাড়া আর কোনো পরিচয়েরই আম্মার দরকার নাই, বরং অন্য কোনো পরিচয় কেবল অনাবশ্যক নয়, অবাঞ্ছিত বলে গণ্য হতে পারে।

তবু ঢাকার মুক্তিযোদ্ধাদের কারো কারো মনে হবে, তাঁর পরিচয়টা শুধু শহীদ আজাদের মা-ই নয়, তিনি নিজেও এক অসমসাহসিকা যোদ্ধা, তিনি বীর, তিনি সংশপ্তক, তিনি কেবল জাতির মুক্তিযুদ্ধে ছেলেকে উৎসর্গ করেছেন, তা-ই নয়, সারাটা জীবন লড়ে গেছেন তাঁর নিজের লড়াই এবং সেই যুদ্ধে তিনি হার মানেননি।

২

১৯৮৫ সাল। শরৎ এসেছে এই বাংলায়, এই ঢাকায়, সদ্য-মাজা কাঁসার বাসনের মতো আলোকোজ্জ্বল আকাশ, তার তীব্র নীল, আর ভাসমান দুধের সরের মতো মেঘমালা, আর শিউলির বোঁটায় বোঁটায় জমে থাকা শিশিরবিন্দু নিয়ে। রাতের রাজপথ এখানে এখন কারফিউ-কাতর, দিনের রাজপথ জনতার বিক্ষোভ-মিছিলের পদচ্ছাপগুলো ধারণ করবে বলে প্রতীক্ষমাণ। প্রতিবছর শরৎ এলেই ঢাকার বেশ কজন মুক্তিযোদ্ধার মাথা এলোমেলো হয়ে যেতে থাকে। স্বাধীনতার ১৪ বছর পর ১৯৮৫-র এই শরৎও তার ব্যতিক্রম নয়। বরং ৩০শে আগস্ট আজাদের মায়ের মৃত্যু আর ৩১শে আগস্ট তাঁর দাফনের পর ঢাকার মুক্তিযোদ্ধারা সবাই যেন বড় বেশি তাড়িত, বড় বেশি নিমজ্জিত হয়ে পড়েন। অতীত তাঁদের তাড়িয়ে ফেরে, স্মৃতি তাঁদের ঘিরে ধরে অক্টোপাসের মতো। কাজী কামাল উদ্দিন বীরবিক্রম চন্দ্রগ্রস্তের মতো হয়ে যান। চাঁদটা যেন তাঁর কাছে একটা পেয়ালা, জ্যোৎস্না যেন পানযোগ্য, চরাচরব্যাপী যতটা জ্যোৎস্না, সবটা তিনি গলাধঃকরণ করে ফেলতে পারেন। তাঁর আফসোস হতে থাকে, রেইডের রাতে তিনি যদি সমর্থ হতেন পাকিস্তানি আর্মি অফিসারের হাত থেকে মেশিনগানটা কেড়ে নিয়ে পুরোপুরি তার দখল নিয়ে নিতে, যদি জিম্মি করতে পারতেন পাকিস্তানি অফিসারটাকে, তাহলে তো তাঁদের হারাতে হতো না এত এত সহযোদ্ধাকে! আর কী দামি একেকটা অস্ত্র। তাঁর প্রিয় পিস্তলটা! আর সেই রকেট লাঞ্চারটা! হাবিবুল আলম বীরপ্রতীকের মনে হতে থাকে, আরেকটু সাবধান বোধহয় হওয়া যেতে পারত। খালেদ মোশাররফ তো বলেইছেন, ইউ ডিড নট ফাইট লাইক আ গেরিলা, ইউ ফট লাইক আ কাউবয়। শাহাদত চৌধুরী চোখের জল আটকাতে পারেন না। তাঁর চশমার কাচ ঝাপসা হয়ে যায়। সামান্য ভুলের জন্যে এতগুলো প্রাণ গেল, এত অস্ত্র গোলাবারুদ! তিনি বা আলম যদি তখন ঢাকায় থাকতেন, তাহলে হয়তো এতগুলো তরুণপ্রাণের ক্ষয় রোধ করা যেত! বড় ভাই হিসাবে, শাচৌ হিসাবে মৃত্যুভয়-তুচ্ছজ্ঞানকারী এইসব কিশোর-তরুণের নিরাপত্তা-বিধানের তথা তাদের গাইড করার একটা অলিখিত দায়িত্ব তাঁর ছিলই! ফতেহ চৌধুরীর মনে হয়, ২৯শে আগস্ট বিকালেই যখন জানা গেল, উলফত খবর দিল, সামাদ ভাই ধরা পড়েছে, তখনও যদি তিনি সবগুলো বাড়ি চিনতেন, যদি সবাইকে বলে দিতে পারতেন, সাবধান, তাহলে হয়তো রুমী মরত না, জুয়েল মরত না, আজাদ মরত না, বাশার মরত না...

শহীদ রুমীর মা জাহানারা ইমামের মনে হয়, রুমী যখন যুদ্ধে যাওয়ার জন্যে জিদ ধরল, তখন তিনি কেন বলে ফেললেন, যা, তোকে দেশের জন্যে কুরবানি করে দিলাম, আলাহ বুঝি তাঁর কুরবানি কথাটাই শুনেছেন, আহা রে, এ কথাটা যদি তিনি না বলতেন, যদি বলতেন, যা রুমী যুদ্ধ জয় করে বীরের বেশে স্বাধীন দেশে ফিরে আয়, তাহলে হয়তো আলাহ তাঁর ছেলেটাকে নিতেন না, ছেলেটা ফিরে আসত ১৬ই ডিসেম্বরে, যেমন করে ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৭১ তাঁর এলিফ্যান্ট রোডের বাসা কণিকায় এসেছিল শাহাদত, মেজর হায়দার, বাচ্চু, হাবিবুল আলমেরা, স্টেনগান কাঁধে নিয়ে, লম্বা চুল, কারো কারো গালে দাড়ি, দাড়িতে কেমন লাগত রুমীকে... আচ্ছা ওটা তো আমার মনের কথা ছিল না, শাহাদত, বাচ্চু, উলফত, চুলু, হাবিব, কামাল, ওটা তো আমার মনের কথা ছিল না, আলাহ না অন্তর্যামী, তিনি আমার মুখের কথাটা ধরলেন, আমার মনের কথাটা পড়তে পারলেন না...

শরৎ এলেই এইসব স্মৃতি আর শোচনা তাঁদের উদ্ভ্রান্ত করে ফেলে, মনে হয়, পৃথিবীর সমান নিঃসঙ্গতা তাঁদের গিলে ফেলতে আসছে, তার আগেই যদি তাঁরা ধরে ফেলতে পারেন পরস্পরের বিশ্বস্ত আঙুল। কিন্তু এটা ১৯৮৫ সাল, ১৯৭১ নয়। যুদ্ধদিনের পরশপাথর ছোঁয়ানো দিন কি আর ফিরে আসবে? কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনের কুলি সর্দার রশিদ আর সাপ্তাহিক বিচিত্রা সম্পাদক শাহাদত চৌধুরী কি আবার একই সিগারেট ভাগ করে খাওয়ার শ্রেণীভেদাভেদ ভুলে যাওয়া দিনে ফিরে যেতে পারেন?

নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু ঘুমহীনতায় জেগে ওঠেন! কেবল যুদ্ধে হারানো সহযোদ্ধাদের মুখই নয়, নয় শুধু কিশোর মুক্তিযোদ্ধা টিটোর গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত দেহের ছবি, নয় শুধু গুলিবেঁধা শরীর নিয়ে শেষবারের মতো নড়ে ওঠা মানিকের চোয়াল আর দুই ঠোঁটের অব্যক্ত ধ্বনির ফিসফাস, তিনি দেখতে পান যুদ্ধের পরও প্রতিবাদী মুক্তিযোদ্ধাদের একে একে মরে যাওয়ার ছবি, চলচ্চিত্রের মতো, একের পর এক, সার সার মৃতদেহ শুধু, মুক্তিযোদ্ধাদের-খালেদ মোশাররফ নাই, হায়দার নাই, মুখতারের লাশ পড়ে আছে স্বাধীন দেশের রাস্তায়, খালেদ মোশাররফ বলতেন, স্বাধীন দেশ জীবিত গেরিলাদের নিতে পারে না, তার চাই শহীদ...

জায়েদ হাহাকার করে ওঠে। মোটরের গ্যারাজ থেকে ফিরতে ফিরতে রাতের বেলা সে ফিসফিস করে, 'আমি আজাদ দাদাকে সাবধান কইরা দিছলাম, ওই বেটা কামরুজ্জামান পাকিস্তানি আর্মির ইনফরমার, ওই বেটা ক্যান আমগো বাড়ির চারদিকে ঘুরে, দাদা কয় বাদ দে, তুই আজাইরা ভয় পাস! ক্যান ওই বাড়িতে রাইতের বেলা ওনারা থাকতে গেল?'

আফসোস করে ওঠেন আজাদের বন্ধু বাস্কেটবল খেলোয়াড় ইব্রাহিম সাবেরও-ওই দিন দুপুরবেলা, একাত্তরের ২৯শে আগস্টেই, তিনি যখন আজাদদের বাসায় যাচ্ছিলেন-প্রায়ই তিনি ওদের বাসায় দুপুরে খেতে যেতেন, আজাদের মা ইলিশ পোলাওটা খুব ভালো রাঁধতেন-বাসার কাছেই একটা দোকান, তাতে তিনজন যুবক বসে, তিনি

আজাদের বাসার দিকে হেঁটে যাচ্ছেন আর যুবকত্রয় মাথা বের করে দেখছে, একজন তাঁকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, 'ভৈরব ব্রিজটা পাহারা দিতেছে পাকিস্তানি আর্মিরা, ওই আর্মিগো অ্যাটাক করতে হইলে আমি সাহায্য করতে পারি', শুনে তাঁর সন্দেহ হয়, এরা বাসাটায় নজর রাখছে নাকি, আর্মির ইনফরমার নয় তো, আজাদদের বাসায় গিয়ে তিনি আজাদকে বলেন, 'আজকের রাতটা তোরা এখানে থাকিস না', কিন্তু ওরা তাঁর কথায় পাত্তাই দিল না, কেন যে দিল না?

একেকজন মুক্তিযোদ্ধার বিচ্ছিন্ন দশটা আঙুল কোনো এক সহযোদ্ধার আরো দশটা আঙুলের সন্ধানে মিকেলাঞ্জেলোর ছবির মতো সঞ্চরণশীল হয়ে ওঠে। একজন আরেকজনকে পেয়ে যান। সরব স্মৃতিচারণ কিংবা নীরব স্মৃতি রোমন্থনের মধ্যে জন্ম নিতে থাকে নিজেদেরই যাপিত জীবনের কিংবদন্তি। এ-কথা সে-কথায় এসে যায় আজাদের প্রসঙ্গ। উচ্চারিত হয়, কিংবা স্মৃত হয়, শেষ পর্যন্ত মাথা নত না করে লড়ে যাওয়া আজাদের মায়ের অবিস্মরণীয় ব্যক্তিগত সংগ্রামের কথা।

তাঁদের মনে পড়ে যায়, আজাদের শেষ দিনগুলো কেটেছে মগবাজারের বাসায়, যুদ্ধদিনের বন্ধুরা এ বাসায় গেছেন অনেকেই। কিন্তু যাঁরা তার ছোটবেলার বন্ধু, তাঁরা স্মরণ করেন যে, ২০৮ নিউ ইস্কাটনে আজাদদের বাসাটা ছিল ঢাকা শহরের সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ বাসা। তাঁরা নিঃসন্দেহ যে এই বাসার কোনো তুলনা ছিল না।

'বাসাটা ছিল দুই বিঘা জমির ওপরে'-একজন বলেন।

'বাসাটায় হরিণ ছিল, একদিন আমার হাত থেকে বাদাম নিতে গিয়ে একটা হরিণ আমার হাতের তালু চেটে দিয়েছিল।' কাজী কামাল এ কথা বলতেই পারেন। কারণ তিনি ছিলেন আজাদের সহপাঠী। সেন্ট গ্রেগরি স্কুলের ছাত্র ছিল আজাদ। গ্রেগরি স্কুলের ছাত্র ছিল লে. সেলিমও। সেও তো শহীদ। সেন্ট গ্রেগরির ছাত্র ছিল রুমী, রউফুল হাসান, ওমর ফারুক, চৌধুরী কামরান আলী বেগ, মেজর সালেক চৌধুরী। তাঁদের মনে না পড়ে কোনো উপায় থাকে না। তাঁরা ফিরে যান সুদূর অতীতে, তাঁদের শৈশবের দিনগুলোয়, যে-অতীত এত দিন ঢাকা ছিল কালের যবনিকার আড়ালে।

'হরিণের বাচ্চা হচ্ছে, সেগুলো বড় হচ্ছে, এইভাবে হরিণের সংখ্যা দাঁড়ায় অনেকগুলো'-স্মরণ করে টগর, আজাদের আরেক খালাতো ভাই, জায়েদের সঙ্গে একাত্তরের ৩০শে আগস্টের সেই রাতে গুলিবিদ্ধ হয়েছিল যে।

'বাড়িতে তাদের ঝরনা ছিল, সরোবরে রাজহাঁস সাঁতার কাটত, বিরাট লন ছিল, ছিল মসলার বাগান। আমি একদিন ওদের দারুচিনির গাছ থেকে পকেট ভরে ছালবাকল এনেছিলাম'-একজন বিড়বিড় করেন।

'বিরাট বাড়ি, আগাপাস্তলা মোজাইক, ঝকঝকে দামি সব ফিটিংস, আজাদের মায়ের ড্রেসিং রুমটাই একটা বেডরুমের সমান বড়'-জাহানারা ইমাম লেখেন।

'আজাদের বাবা ইউনুস চৌধুরী ছিল ঢাকা শহরের সবচেয়ে বড়লোকদের একজন'-বলেন একজন।

'বড়লোকদের একজন না। সবচেয়ে বড়লোক'-আরেকজন প্রতিবাদ করে ওঠেন।

তখন অভিজ্ঞতা আর কিংবদন্তি এসে তাঁদের সম্মিলিত স্মৃতিকে সরগরম করে তোলে। সেই স্মৃতি, সেই কিংবদন্তি, সেই ইতিহাস, সেই পুরাণ, মগবাজারের সেই বাড়িটার দেয়ালে বিঁধে থাকা গুলির প্রত্নগাথা, জায়েদের ট্রাঙ্কে সযত্নে তুলে রাখা আজাদের মাকে লেখা আজাদের চিঠির মধ্যে চিরস্থায়ী হয়ে বেঁচে থাকা ইতিহাস-এইসব যদি জোড়া দেওয়া যায়, কী দাঁড়ায়?

যুদ্ধের ভেতর থেকে উঠে আসে আরেক যুদ্ধ, ইতিহাসের ভেতর থেকে উঠে আসে এক মহিলার নিজস্ব সংগ্রামের অবিশ্বাস্য অবিস্মরণীয় উপাখ্যান।

৩

তখনও আদমজীর বাড়ি হয়নি। বাওয়ানির বাড়িও ছিল খুব বিখ্যাত, কিন্তু সেটা আজাদদের ইস্কাটনের বাড়ির তুলনায় ছিল নিষ্প্রভ। অজাদের বাবা ইউনুস চৌধুরী ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার, টাটা কোম্পানিতে চাকরি করতেন, ছিলেন বোম্বেতে, কানপুরে, কলকাতায়। কানপুরেই জন্ম হয় আজাদের। ইউনুস চৌধুরী আর সাফিয়া বেগমের একটা মেয়ে হয়েছিল, তার নাম ছিল বিন্দু, কিন্তু সে বেশি দিন বাঁচেনি। বসন্ত কেড়ে নিয়েছিল তার জীবন। প্রথম মেয়েকে হারিয়ে সাফিয়া বেগম অনেকটা পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলেন, ফলে তাঁর কোলে যখন আজাদ এল, তিনি আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতো করে আগলে রাখতে শুরু করলেন ছেলেকে। আজাদের একটা ছোট ভাইও হয়েছিল পরে, বিক্রমপুরে, কিন্তু সাত দিনের মাথায় সেও মারা যায় আঁতুড়ঘরেই। ফলে আগে-পরে আজাদই ছিল সাফিয়া বেগমের একমাত্র সন্তান। অন্ধের যষ্টি বাগধারাটা আজাদ আর তার মায়ের বেলায় প্রয়োগ করা যেতে পারত। আজাদ ছিল পাকিস্তানের প্রায় সমবয়সী, তবে আজাদই একটু বয়োজ্যেষ্ঠ। তাঁর জন্ম হয় ১১ই জুলাই, ১৯৪৬। আজাদি আজাদি বলে যখন পাগল হয়ে উঠেছিল সারা ভারতবর্ষ, তখনই আজাদের জন্ম বলে তার নাম রাখা হয় আজাদ। ১৯৪৭-এর আগস্টে ভারত-

পাকিস্তান দুটো দেশ আলাদা হওয়ার পর বোম্বে থেকে চৌধুরী সাহেব চলে আসেন ঢাকায়। নিয়তির হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে চলে আসেন তিনি। আসবার ইচ্ছা তেমন ছিল না তাঁর, কিন্তু সাফিয়া বেগম জন্মভূমি ফেলে রেখে অন্য দেশে রয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না একেবারেই। ইউনুস চৌধুরী বিক্রমপুরের ছেলে, মেদিনীমণ্ডল গ্রামে তাঁর পৈতৃক নিবাস। টাটা কোম্পানির চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঢাকায় এসে ইউনুস চৌধুরী ব্যবসা শুরু করেন। নানা ধরনের ব্যবসা। যেমন সাপাই আর কন্ট্রাকটরি। প্রভূত উন্নতি করেন তিনি, বিষয়-সম্পত্তি বাড়তে থাকে অভাবনীয় হারে। লোকে বলে, ইউনুস চৌধুরীও বলে বেড়ান, এসবের মূলে ছিল একজনের সৌভাগ্য : আজাদের মা। বউয়ের ভাগ্যেই সৌভাগ্যের সিংহদুয়ার খুলে যায় চৌধুরীর। যদিও তাত্ত্বিকেরা এ রকম ব্যাখ্যা দিতে পারে যে, পাকিস্তান কায়েম করাই হয়েছিল মুসলমান মুৎসুদ্দি ও উঠতি ধনিকদের স্বার্থকে নিরঙ্কুশ করার জন্যে, সে-সুযোগ কাজে লাগান ইউনুস চৌধুরী; তবু, চৌধুরী নিজেই তাঁর বৈষয়িক উন্নতির জন্য তাঁর স্ত্রীর ভাগ্যকে মূল্য দিতেন। আসলে, এটা দৃষ্টিগ্রাহ্য যে, বিয়ের পরই ধীরে ধীরে ভাগ্য খুলতে থাকে তাঁর। ইউনুস চৌধুরী যে কানপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়েছেন, তার টাকা যুগিয়েছেন সাফিয়া বেগম। ঢাকায় আসার পর তিনি যে ব্যবসাপাতি শুরু করেন, তারও প্রাথমিক মূলধন যুগিয়েছিলেন সাফিয়া বেগমই, বাবার কাছ থেকে বিয়ের সময় পাওয়া গয়নার কিয়দংশ বিক্রি করে। পাকিস্তানে চলে আসার পর আস্তে আস্তে আজাদের বাবা হয়ে ওঠেন ইউনিয়ন ব্যাংকের চেয়ারম্যান, চিত্তরঞ্জন কটন মিলের চেয়ারম্যান, একুয়াটি শিপিংয়ের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। একটা কাস্টম ফোর্ড গাড়ি ছিল তাঁর। গাড়ির নম্বর ছিল ইপিডি ৪৩৪৯। জনশ্রুতি আছে যে, ইরানের শাহ পাহলভি যখন পূর্ব পাকিস্তানে আসেন, তখন তাঁর গাড়ি হিসাবে ব্যবহারের জন্য ইউনুস চৌধুরীর গাড়ি সরকার ধার নিয়েছিল। এ রকমও শোনা যায়, প্রিন্স ফিলিপ শিকারে এসে আজাদদের বাসায় উঠেছিলেন। ভিন্নমতও শোনা যায়, না ঠিক বাসায় ওঠেননি, চৌধুরীর গাড়িটা প্রিন্সের জন্যে ধার নিয়েছিল সরকার, আর আজাদের বাবা তাদের সফরসঙ্গী হয়েছিলেন।

যা-ই হোক না কেন, আজাদের বাবা ছিলেন এই শহরের খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক ব্যক্তি। আর আজাদদের ইস্কাটনের বাড়িটা ছিল শহরের সবচেয়ে দর্শনীয় বাড়ি। বহু লোক শুধু বাড়ি দেখতেই এ ঠিকানায় আসত।

স্মৃতিচারণকারীদের মনে পড়ে যায়, এই বাড়ির একটা রেকর্ড রয়ে গেছে ৩৫ মিলিমিটার সেলুলয়েডে। ডাকে পাখি, খোলো আঁখি, দেখো সোনালি আকাশ, বহে ভোরের বাতাস-সিনেমার এই গানটা শুটিং হয়েছিল এই বাসাতেই। টেলিভিশনের ছায়াছবির গানের অনুষ্ঠানে এটা অনেকবার দেখানো হয়েছে।

সিনেমার ওই গানের অংশটা খেয়াল করে দেখলেই বোঝা যাবে বড় জব্বর ছিল ওই বাড়িটা।

আজাদ ছিল বাড়ির একমাত্র ছেলে।

আর আজাদের মা সাফিয়া বেগম ছিলেন বাড়ির সুখী গৃহিণী। ছোটখাটো মানুষটার শাড়ির আঁচলে থাকত চাবি। তিনি বাড়িময় ঘুরে বেড়াতেন। আর আল্লার কাছে শোকর করতেন। জাহানারা ইমামের বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরোয়-আজাদের মাকে তিনি দেখেছেন এ রকম : 'ভরাস্বাস্থ্যে গায়ের রঙ ফেটে পড়ছে, হাতে-কানে-গলায় সোনার গহনা ঝকমক করছে, চওড়া পাড়ের দামি শাড়ির আঁচলে চাবি বাঁধা, পানের রসে ঠোঁট টুকটুকে, মুখে সব সময় মৃদু হাসি, সনাতন বাঙালির গৃহলক্ষ্মীর প্রতিমূর্তি।'

ইউনুস চৌধুরী সেদিন বলেছেন, 'ওগো শুনছ, আজাদের মা! বাড়িটা আমি তোমার নামেই রেজিস্ট্রি করিয়েছি। এ বাড়ির মালিক তো তুমি।'

সাফিয়া বেগম রাগ করেছেন। 'আমি বিষয়-সম্পত্তির কী বুঝি? এটা আপনি কী করেছেন? না না। আপনার বাড়ি আপনি নিজের নামে রেখে দিন।'

ইউনুস চৌধুরী হেসে উঠেছেন। ছাদ কাঁপানো হাসি। 'তুমি তো আমার আছই। তাইলে বিষয়-সম্পত্তিও আমার আছে। কেন, ফরাশগঞ্জের বাড়িও তো আমি তোমার নামে রেখেছি। হা-হা-হা।' তারপর হাসি থামিয়ে বলেছেন, 'তোমার বরাতেই আমার বরাত খুলেছে। বাড়িটা তোমার নামেই রাখাটা ন্যায্য।'

স্বামীর কথা শুনে আশ্বস্ত বোধ করলেও কী এক অজানা আশঙ্কায় সাফিয়া বেগমের মনটা তবু যেন কেন কেঁপে উঠেছে। বেশি সম্পত্তির মালিক হওয়া ভালো নয়। টাকা-পয়সা বেশি হলে মানুষ বদলে যায়। আর আজাদের বাবা লোকটা দেখতে এত সুন্দর-তিনি লম্বা, তাঁর গাত্রবর্ণ ফরসা, গাঢ় ভুরু, উন্নত কপাল, উন্নত নাক, উজ্জ্বল চোখ, ভরাট কণ্ঠস্বর-সব মিলিয়ে তিনি এমনি যে মেয়ে-মাত্রই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতে বাধ্য। আরেকটা ছবি, হয়তো অকারণেই, সাফিয়া বেগমের মনের পটে মাঝে মধ্যে উদিত হতে থাকে। বোম্বে থাকতে ইউনুস চৌধুরী একটা মঞ্চনাটকে অভিনয় করেছিলেন কৃষ্ণের চরিত্রে, একদিকে রাধা, অন্যদিকে অনেকগুলো গোপিনী কৃষ্ণের জন্যে প্রাণপাত করছে, এই দৃশ্য প্রেক্ষাগৃহের সামনের আসনে বসে দেখেছিলেন সাফিয়া বেগম, বহুদিন আগে, কিন্তু এ দৃশ্যটা মাঝে মধ্যেই দুঃস্বপ্নের মতো তাঁকে তাড়া করে ফেরে।

এই বাড়ি এত বড়, তবু যেন মনে হয় ফরাশগঞ্জের বাড়িই ভালো ছিল। তিনতলার ও-বাড়িটা এত জাঁকজমকঅলা নয়, কিন্তু যেন ওই বাড়িটাতে তিনি নিজেকে খুঁজে পেতেন। ইস্কাটনের বাড়িটা বাড়াবাড়ি রকমের বড়। এটায় নিজেকে কেমন অথৈ বলে মনে হয়। তাই তো তিনি চাবি আঁচলে বেঁধে বাড়িময় ঘুরে বেড়ান। চাকর-বাকর, মালি-বাবুর্চি,

দারোয়ান-ড্রাইভার মিলে বাড়ি সারাক্ষণই গমগম করছে। আর আছে আত্মীয়স্বজন, আশ্রিতরা। বাড়িতে রোজ রান্না হয় ৫০ জনের খাবার। তাদের কে কী খায়, না খায়, এসব দিকেও খুবই খেয়াল রাখেন আজাদের মা। আলাহতায়ালা তাঁদের দু হাত ভরে দিয়েছেন, সেখান থেকে আলাহর বান্দাদের খানিকটা দেওয়া-থোয়া করলে তো তাঁদের কমছে না, বরং ওদেরও হক আছে এসবের ওপর।

ফরাশগঞ্জের তিনতলা বাড়িটাই যেন তাঁর বেশি প্রিয় ছিল বলে মনে হয়। ওখান থেকে আজাদের স্কুলও ছিল কাছে। আজাদ সেন্ট গ্রেগরি স্কুলে ভর্তি হয়েছিল ইনফ্যান্ট ক্লাস থেকেই। একেক দিন একেক পোশাক আর জুতো-মোজা পরে সে যখন স্কুলের দিকে রওনা হতো, ছেলের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সাফিয়া বেগমের চোখে অশ্রু এসে যেত। আনন্দের অশ্রু, মায়ার অশ্রু। ছেলেটা দেখতেও হয়েছে মাশালাহ চোখজুড়োনো। নিজের ছেলে বলে কি তাকে বেশি সুন্দর দেখছেন? না। ফরসা, লম্বা, নাকটা টিকালো, চমৎকার বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। স্বাস্থ্যও মাশালাহ ভালো। কাছেই বুড়িগঙ্গা। স্টিমারের শব্দ শোনা যেত। রাত্রিবেলা যখন স্টিমারের সিটির আওয়াজ আসত কানে, কিংবা সার্চ লাইটের বিক্ষিপ্ত আলোয় হঠাৎ হঠাৎ ঝলকে উঠত আকাশ, বাড়ির ছাদ, মাওয়ার সারেং পরিবারের মেয়ে সাফিয়া বেগমের মনটা নিজের অজান্তেই চলে যেত তাঁর শৈশবের দিনগুলোতে। তাঁদের মাওয়ার বাড়িতে ছিল নতুন টিনের চকচকে বড় বড় ঘর, তাতে নানা নকশা কাটা, টিনের চালে টিন-কাটা মোরগ, বাতাসে ঘুরছে আর বাতাসের দিক বলে দিচ্ছে। দূর থেকে লোকে দেখতে আসত তাদের পৈতৃক বাড়িটা। তাঁর বাবার সারেং হওয়ার কাহিনীটাও কিংবদন্তির মতো ভাসছে মাওয়ার আকাশে-বাতাসে : তাঁর বাবা ভাগ্যান্বেষণে উঠে পড়েছিলেন এক ব্রিটিশ জাহাজে, স্টিম ইঞ্জিনচালিত জাহাজ। কী কারণে ব্রিটিশরা তাঁকে ছুড়ে ফেলেছিল গনগনে কয়লার আগুনে, তারপর তাঁকে ফেলে দিয়েছিল সমুদ্রের জলে, কিন্তু তিনি মারা যাননি। তখন ব্রিটিশ নাবিকেরা বলাবলি করতে লাগল, এই ছেলে যদি বাঁচে, তাহলে সে একদিন কাপ্তান হবে। অগ্নিদগ্ধ শরীরটাকে নিয়ে আসা হলো মাওয়ায়, তাঁকে ডুবিয়ে রাখা হতো কেঁচোর তেলে, মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে তোলা হতো কেঁচো আর কেঁচো, তখন সারেংবাড়ির আশপাশে লোকজনের প্রধান কাজ দাঁড়িয়ে যায় কোদাল হাতে খুরপি হাতে মাটি খোঁড়া আর কেঁচো ধরা, বড় বড় চাড়িতে কেঁচো সব কিলবিল করছে, মোটা কেঁচো, চিকন কেঁচো, লাল কেঁচো, কালচে কেঁচো, সেসব পিষে তৈরি করা হচ্ছে তেল, আর সেই তেল দু বেলা মাখা হতো আজাদের নানার শরীরে, এই আশ্চর্য ওষুধের গুণে তিনি বেঁচে যান, সেরে ওঠেন এবং শেষতক ফিরিঙ্গিদের ভবিষ্যদ্বাণীকে অব্যর্থ প্রমাণ করে হয়ে ওঠেন জাহাজের কাপ্তান। ধনসম্পদের মালিক হন, মাওয়ার সবচেয়ে দর্শনীয় বাড়িটার অধিকারী হন। সারেংবাড়ির মেয়ে হিসাবে সাফিয়া বেগমের মাথা সব সময় উঁচুই ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও বলতে হবে, মাওয়ার দিনগুলোতে, বিয়ের আগে, নিজের বিবাহোত্তর জীবনের যে সুখ-সম্পদময় ছবি সাফিয়া কল্পনা করতেন, নদীর ধারে দাঁড়িয়ে সওদাগরি বড় নৌকাগুলোর দিকে তাকিয়ে যে বিত্তবৈভবশালী সওদাগর বরের কথা তিনি ভাবতে পারতেন, বিয়ের রাতে বিশেষভাবে রিজার্ভ করা লঞ্চে করে শ্বশুরবাড়ি বিক্রমপুর যাওয়ার পথে নদীর বাতাস চুলে-মাথায়-ঘোমটায় মাখতে মাখতে যে ঐশ্বর্যময় ভবিষ্যতের ছবি তিনি আঁকতে পেরেছিলেন, তার জঙ্গিতম সংস্করণের চেয়েও আজ তিনি পেয়েছেন বেশি। এই বোম্বে কানপুর, এই ঢাকার ফরাশগঞ্জের বাড়ি, আবার ইস্কাটনে দুবিঘা জমির ওপর নিজের প্রাসাদোপম বাড়ি।

তাঁরা ফরাশগঞ্জের বাড়িতে থাকতেই আজাদদের স্কুলে একটা মজার কাণ্ড ঘটেছিল। ব্রাদার ফুল জেম তখন সেন্ট গ্রেগরির প্রিন্সিপ্যাল। সে-সময় পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন এক বিখ্যাত বাঙালি। ভালো ছাত্র হিসাবে যাঁর নামডাক এখনও রয়ে গেছে কিংবদন্তি হিসেবে। তাঁর ছেলে পড়ত সেন্ট গ্রেগরিতে। গভর্নর সাহেব একদিন স্কুলের শিক্ষকসহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিকে দাওয়াত করলেন নিজের বাসভবনে। উদ্দেশ্য, তাঁদের ভালো করে খাওয়াবেন। সে দাওয়াতে আজাদরাও ছিল আমন্ত্রিত। ভোজনপর্ব যা হলো তা ঐতিহাসিকই বলা চলে। তবে খেতে খেতে শিক্ষকদের মধ্যে শুরু হলো গুঞ্জন। কারণ গভর্নর জানাচ্ছেন, আজকের এই মজলিশের উপলক্ষ হলো তাঁর সেন্ট গ্রেগরিতে অধ্যয়নরত ছেলের ভালো ফল। শিক্ষকদের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে-গভর্নরের ছেলে তো মোটেও ভালো ফল করেনি! তাহলে গভর্নর কেন এত বড় পার্টি এত ধুমধামের সাথে দিলেন? পরে জানা গেল ঘটনার গোমর। একই নামে দুজন ছাত্র আছে ক্লাসে। এর মধ্যে অপরজনের রেজাল্ট খুবই ভালো। গভর্নরের ছেলে সেই চমৎকার প্রগ্রেসিভ রিপোর্টটা তুলে দিয়েছে তার বাবার হাতে। সেটা দেখেই বাবা উচ্ছ্বসিত হয়েছেন-বাহ্, এক বছরেই ছেলের এত উন্নতি। যাক, ছেলে তাঁর বাবার নাম রেখেছে। কী সুখের বিষয়! দাওয়াত করো সবাইকে। সেই দাওয়াত খেয়ে শিক্ষকদের সবার মনমেজাজ অন্তত এক মাস খারাপ ছিল।

শুধু মন নয়, পেটও খারাপ ছিল।

৪

দোহার এলাকার মুক্তিযোদ্ধা গাজী আলী হোসেন এসেছিলেন আজাদের মায়ের জানাজায়। সম্পর্কে আজাদের চাচা হন তিনি। ইউনুস চৌধুরীর খালাতো ভাই। আজাদের মা মারা গেছেন শুনে ছুটে এসেছেন। গোরের পাশে যখন তিনি দাঁড়িয়ে, নানা স্মৃতির ভিড়ে তাঁর চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। তাঁর মনের ভেতরে বইতে থাকে রোদনধারা। ভাবি আকারে ছিলেন ছোটখাটো, কিন্তু তাঁর হৃদয়টা ছিল অনেক বড়। ইস্কাটনের বাড়িতে আলী হোসেনও থাকতেন। এ রকম আশ্রিত বা অতিথি আরো অনেকেই থাকত বাসায়। আজাদ আর ভাবির সঙ্গে তিনি বহুদিন ক্যারমও খেলেছেন। পরহেজগার মহিলা ছিলেন আজাদের মা। নামাজ-রোজা ঠিকভাবে করতেন। দান-খয়রাত করতেন দু হাতে। বাড়ির সব আত্মীয়স্বজন অনাত্মীয় আশ্রিত প্রতিটা লোকেরই আতিথেয়তা করতেন আন্তরিকতার সঙ্গে।

আলী হোসেনের বন্ধুবান্ধবরা খুব একটা এ বাড়িতে আসত না। কিন্তু আলী হোসেনের শখ বন্ধুদের বাড়িটায় আনেন, বাড়িটা বন্ধুরা ঘুরেফিরে দেখুক। এই সুবিশাল আর জাঁকজমকপূর্ণ বাড়িটা তো বাইরের কত লোক শুধু দেখতেই আসে। এই বাড়িতে তিনি থাকেন, সেটা বন্ধুবান্ধবদের একটিবার দেখাতে কি সাধ হয় না! বন্ধুরা বাড়িটাও দেখুক, আর তাঁর ভাবির হাতের রান্না একটু ভালোমন্দ খেয়ে যাক। ওরা তো হলে থাকে, কী খায় না খায় কে জানে!

কথাটা তিনি পাড়েন সাফিয়া বেগমের কাছে, 'ভাবি, আমার বন্ধুরা তো জানতে চায় আমি কোথায় থাকি, বললাম, ইস্কাটনে ইউনুস চৌধুরীর বাড়িতে, শুনে ওরা বিশ্বাসই করতে চায় না, বলে গুলগাপ্পি বাদ দাও তো ভায়া... কী করি বলেন তো!'

ভাবি বলেন, 'একদিন নিয়ে আসেন তাদের। কবে আনবেন, আগে থেকে জানাবেন।'

আলী হোসেন বন্ধুদের সাঙ্গে আলাপ করে দিনক্ষণ ঠিক করেন। ভাবিকে জানান। ভাবি রান্না করতে পছন্দ করেন খুব। আলীর বন্ধুরা আসবে, এ উপলক্ষ পেয়ে লেগে যান রাঁধতে। কত পদের কত রান্নাই না রাঁধেন। বন্ধুরা আসে। তখন আলী সাফিয়া বেগমকে বলেন, 'ভাবি, আপনি কি ওদের সামনে একটু আসবেন?'

সাফিয়া বেগম হেসে বলেন, 'আমি তো আপনার বন্ধুদের চিনিও না, তাদের সাথে আমার পরিচয়ও হয়নি, কিন্তু আপনি যখন বলছেন, আমি নিশ্চয় তাদের সামনে যাব। আর তা ছাড়া তাদের খাওয়ার তদারকিটাও তো করতে হবে। তুলে না দিলে মেহমানরা কী খাবে না খাবে কে জানে! আমি তাদের তুলে খাওয়াব।'

ভাবি সামনে আসেন আলী হোসেনের বন্ধুদের। হেসে হেসে কথা বলেন। বন্ধুরা সহজেই আপন হয়ে যায় তাঁর। তিনি খুব যত্ন করে দেবরের বন্ধুদের পাতে খাবার তুলে তুলে দেন। বন্ধুরা ফিরে যায় মোহিত হয়ে।

কিন্তু সবচেয়ে মোহিত হন গাজী আলী হোসেন নিজে, যখন আরেক দিন সাফিয়া বেগম বলেন, 'বাচ্চু ভাই (আলী হোসেনের ডাকনাম), আপনার বন্ধুদের মাঝে মধ্যে আনবেন। হলে থাকে। বাবা-মার কাছ থেকে কত দূরে। এদের খাওয়াতে পারলে দিলের মধ্যে একটা শান্তি লাগে।'

গোরের পাশ থেকে ফিরতে ফিরতে আরো কত কথাই না মনে পড়ে আলী হোসেনের। ইস্কাটনের বাসায় অনেক ফালতু মেহমানও থাকত আশ্রিতের মতো। এদের সবাইকে যে সাফিয়া বেগমের পছন্দ হতে হবে, এমন তো নয়। সবাই পছন্দের ছিলও না হয়তো। আলী হোসেন ছিলেন দেবর, তাঁর ভাবি হিসাবে সাফিয়া বেগম নানা আবদার অত্যাচার সহ্য করতেন। কিন্তু আলী হোসেনের একজন মামা ছিলেন, কাদের, যাঁকে সাফিয়া বেগম ঠিক পছন্দ করতেন না। এটা কাদেরও বুঝতেন, সাফিয়াও যেন বোঝাতে চাইতেন। একদিন আলী হোসেন আর কাদের একসঙ্গে বসেছেন সকালের নাশতা করতে, সাফিয়া বেগম আলী হোসেনের পাতে দুটো ডিমের অমলেট দিলেন, তারপর কাদেরের পাতেও দিলেন দুটো ডিমেরই অমলেট। পরে কাদের বলেন, 'বুঝলে ভাগ্নে, তোমার ভাবির মনটা অনেক বড়। ছোটলোকি ব্যাপারটাই তার মধ্যে নাই।'

৫

গাড়ির মধ্যে বসে ছিলেন জাহানারা ইমাম, জুরাইন গোরস্তানের বাইরে; ভেতরে অল্প কজন আত্মীয় আর বেশ কজন মুক্তিযোদ্ধা দাফন করছিলেন আজাদের মাকে। হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলে জাহানারা ইমাম বেরিয়ে আসেন গাড়ি থেকে। তাঁর কী হয় তিনিই জানেন। তাঁর মতো স্নিগ্ধরুচি সূক্ষ্ম আচারবোধসম্পন্ন মানুষের এ রকমটা করার কথা নয়-দিনের বেলা বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি থেকে নেমে সেধে সেধে ভেজা। জাহানারা ইমাম তা করেন। গোরস্তানের ফটকের কাছে বসে থাকা ভিক্ষুকেরা তাদের বিলাপ ও যাচনা বন্ধ করে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে, এক ভদ্রমহিলা অকারণে হঠাৎ আসা বৃষ্টিতে ভিজছে। কারণটা তারা আন্দাজ করতে পারে না, এবং সেটা নিয়ে গবেষণা করার আগেই তাদের নিজেদের মাথা বাঁচানোর জন্যে সচেষ্ট হতে হয়। এভাবে বৃষ্টিতে ভেজার কারণটা স্বয়ং জাহানারা ইমামও ধরতে পারেন না। শুধু আবছা একটা অনুভব, হয়তো

বেহেশতের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে, আর শহীদেরা, তাঁর রুমীরা, আজাদেরা আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করছে। এই বৃষ্টি যেন বৃষ্টি নয়। আর এই যে সুবাসটা, না, এটা আতরের নয়, গোলাপজলের নয়, লোবানের নয়, এ হলো বেহেশ্‌ত থেকে নেমে আসা অপার্থিব সৌরভ। দাফন শেষ করে বাচ্চু, শাহাদত, কাজী কামাল, হ্যারিস, হাবিবুল আলম প্রমুখ ফিরে এলে জাহানারা ইমাম সংবিৎ ফিরে পান। তিনি গাড়িতে ওঠেন। তাঁর গাড়িতে কেউ কেউ লিফ্‌ট নেয়। গাড়িতে উঠেও এই মুক্তিযোদ্ধাদের কেউই বৃষ্টিতে ভেজার ব্যাপারটা নিয়ে কোনো কথা বলে না। কারণ তারা নিজেরাই ঘোরগ্রস্ত। কেবল তরুণ ড্রাইভার বলে, 'খালাম্মা, তোয়ালে দিব, মাথা মুছবেন নাকি?' জাহানারা ইমাম মাথা নাড়েন না-সূচক ভঙ্গিতে। গাড়ি চলতে থাকে। তিনি প্রতিটা মুক্তিযোদ্ধাকে তাদের শেষ গন্তব্যে নামিয়ে দিয়ে এলিফ্যান্ট রোডের বাসা কণিকায় ফিরে আসেন। স্মৃতির দংশন তাঁকে অস্থির করে তোলে।

আজাদের বাবার সঙ্গে জাহানারা ইমামদের পরিচয় মেছের নামে তাঁদের এক ভাগ্নের মাধ্যমে। জাহানারা ইমাম কয়েকবার গেছেন আজাদদের ফরাশগঞ্জের বাড়িতে। ইস্কাটনের বাড়িতে গেছেন অনেকবার। সঙ্গে থাকত তাঁর দুই ছেলে রুমী আর জামী। জামী তখন খুবই ছোট। রুমীর সঙ্গে খুব সহজেই বন্ধুত্ব হয়ে যায় আজাদের। এত বড় বাড়ি পেয়ে রুমী তো আনন্দে অস্থির হয়ে যেত। এই লংপে-রেকর্ড চালাচ্ছে, এই টেপ রেকর্ডার নিয়ে ছড়া টেপ করছে, এই আবার যাচ্ছে হরিণ দেখতে। আজাদ বলেছে রুমীকে, একটা বাঘও আনার কথা ছিল। কিনেও নাকি ফেলেছিলেন আজাদের বাবা। কিন্তু আনার পথে বাঘটা মরে যায়।

আজাদের মা খুবই পছন্দ করতেন রাঁধতে। রেঁধে মেহমানদের খাওয়াতে। বাসায় বাবুর্চি ছিল। কাজের লোকে গমগম করত বাড়িটা। তবু জাহানারা ইমামদের জন্যে নিজ হাতে নানান পদ রেঁধে তাঁদের খাওয়ানোর জন্যে তিনি উদ্বেল হয়ে উঠতেন। জাহানারা ইমাম বলতেন, 'আপা, আপনি বসেন। আমরা কি খেতে এসেছি, নাকি আপনার সাথে গল্প করতে এসেছি?' আজাদের মা হাসতেন। স্মিত স্নিগ্ধ হাসি। কথা তিনি বেশি বলতেন না। কিন্তু হাসিটা দিয়েই যেন অনেক কথা বলা হয়ে যেত। বলতেন, 'পান খান। রেকর্ডের গান শোনেন। আপনি তো দেখতে লোকে বলে সুচিত্রা সেনের মতো। সুচিত্রা সেনের সিনেমার গানের রেকর্ড আছে শোনেন। আমি আগে সিনেমা থিয়েটার দেখতাম। এখন আর দেখি না। আপনি বোন বসেন। আমি যাব আর আসব। রুমী কী খেতে পছন্দ করে? জামীর জন্য কি আলাদা কিছু রাঁধতে হবে? আপনার সাহেবকে আনেননি কেন?' পানের একটা রেকাবি জাহানারা ইমামের সামনে রেখে আজাদের মা রান্নাঘরে চলে যেতেন। এই রেকাবিটাও ছিল যেন শিল্পকর্মের একটা অপূর্ব নিদর্শন। কত ধরনের জর্দাই না তাতে থাকত। একেকটা খোপে একেক রকম জর্দা আর তবক সাজানো। আজাদের মা বলতেন, 'এটা হলো কিমাম জর্দা, এটা হলো কস্তুরি। পাকিস্তান থেকে আনানো।' জাহানারা ইমাম তেমন পান খেতেন না। আজাদের মাকে খুশি করার জন্যে খানিকটা মুখে দিতেন।

টমি নামে আজাদদের পোষা কুকুর ছিল একটা, স্প্যানিয়েল। এসে জাহানারা ইমামের গায়ের ঘ্রাণ নিত। এই কুকুর দেখে রুমী আর জামীর শখ হলো তারা কুকুর পুষবে। রুমীদের পোষা কুকুর মিকি মারা গেছে একাত্তরের ২৫শে মার্চের রাতে। আজ থেকে ১৪ বছর আগে! জাহানারার বুক চিরে শুধুই দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসতে চায়। রুমীর ১৪তম মৃত্যুদিনও হয়তো সামনের কোনো একটা দিন। এই সেপ্টেম্বরের ৪ তারিখ হলেও হতে পারে। রুমীর বাবা শরিফ ইমামও আজ ১৪ বছর হলো নাই।

৬

আজাদের মায়ের জীবনে এত সুখ, এত প্রাচুর্য! তবু তাঁর বুকটা কেমন যেন হঠাৎ হঠাৎ কেঁপে ওঠে। এখান থেকে ওখান থেকে মেয়েরা ফোন করে, আজাদের বাবাকে চায়। আবার মাঝে মধ্যে ফোন আসে, তিনি ধরেন, হয়তো তাঁর গলা শুনেই ফোন রেখে দেয়। তিনি আজাদের বাবাকে বলেন, 'কী ব্যাপার, মেয়েরা আপনাকে এত ফোন করে কেন?' আজাদের বাবা হাসেন। 'আরে সব কাজের ফোন। তুমি এত চিন্তা করো কেন? চিন্তা করতে করতে তুমি শুকিয়ে যাচ্ছ।'

'কাজের ফোন, তাহলে আমি ধরলে কেটে দেয় কেন?'

'কেটে দেয় নাকি? তাহলে মনে হয় তোমাকে কাজের লোক ভাবে না। হা-হা-হা।' আজাদের বাবা হাসি দিয়েই যেন সবকিছু আড়াল করতে চান।

আজাদের মা স্বামীর কোনো দোষত্রুটি এখনও দেখেননি। কিন্তু তাঁর মনের ভেতরে কেমন যেন কাঁটা খচখচ করে। বোম্বের দিনগুলোতে সেই যে কৃষ্ণরূপী ইউনুস আর তাঁকে ঘিরে থাকা রাধার সখিদের কলকাকলির দৃশ্য তিনি দেখেছিলেন, সেটা তিনি সারাক্ষণ মানস-চোখে দেখতে পান।

আর যেখানে কাঁটার ক্ষত, বাইরের আঘাতগুলো এসে সেই জায়গাতেই লাগে।

একদিন একটা ফোন আসে। 'হ্যালো, আজাদের মা কইতেছেন?'

'জি।'

'আমারে আপনে চিনবেন না। তয় আমি আপনার উপকারের জন্যে ফোন করতেছি। আপনার আজাদের বাপেরে আপনে কতটা চিনেন?'

'আমি তাকে কতটা চিনি, সেটা কি আপনাকে বলতে হবে?'

'আরে রাগ করেন ক্যান। আমি আপনের উপকার করনের লাইগাই ফোন করছি। আজাদের বাপে যে এক মহিলার লগে গিয়া দেখা করে, আপনি কিছু জানেন না?'

'আপনি কে আমি জানি না। কিন্তু আপনাকে যদি আমার সামনে পেতাম, চড় দিয়ে দাঁত নড়িয়ে দিতাম।'

'রাগ করেন ক্যান? আমারে চড় মারলে কি আপনে আপনের স্বামীরে বশ করতে পারবেন? নিজের ঘরটা সামলান।'

সাফিয়া বেগম ফোন রেখে দেন। দুপুরে ভাত খান না। রাতেও না।

আজাদের দাদীর বোধহয় তৃতীয় নয়ন আছে। তিনি তাঁর বিছানায় বসে পেষা পান চিবাচ্ছেন আর বকে চলেছেন, 'অ আজাদের মা, তুমি যে দুপুরের ভাত অহনও খাইলা না! পিত্তি পইড়া যাইব না?'

সাফিয়া বেগম জবাব দেন না।

রাত্রিবেলা স্বামী আসেন। তিনি তাঁর সামনে যাওয়া থেকে বিরত থাকেন।

ইউনুস চৌধুরী বিস্মিত হন। তিনি ঘরে আসামাত্রই সাফিয়া তাঁর কাছে আসে, তাঁর কোট খুলে দেয়, তাঁর ঘরে পরার স্যান্ডেল পোশাক এগিয়ে দেয়, তাঁর খোঁজখবর নেয়। কিন্তু আজকে সাফিয়ার কী হলো?

সাফিয়া বেগমের কাছে যাওয়ার আগে চৌধুরীকে যেতে হয় তাঁর মায়ের কাছে। তিনি ডাকছেন, 'তারা, তারা, এদিকে আয়।' (তারা ইউনুস চৌধুরীর ডাকনাম)

ইউনুস চৌধুরী মায়ের ঘরে যান।

'বউমা ভাত খাইতেছে না ক্যান। দুপুরে খায় নাই। বিকালে খায় নাই। অহনও দেখি ঘর থন বারাইতেছে না। ব্যাপার কী?'

আজাদের বাবা প্রমাদ গোনেন।

'যা দ্যাখ বউয়ে কী চায়?'

চৌধুরী এবার মনে মনে একটু হাসেন। সাফিয়া আর কী চাইতে পারে! তার চাইবার কিছু থাকলে অবশ্যই তাকে তা তিনি দিতেন। সেটা অনেক বেশি সহজ হতো। কিন্তু তিনি জানেন সাফিয়া কিছুই চাইবে না। বরং সে জেদ ধরেছে নিশ্চয় না চাইবার জন্যে।

আজাদ কিন্তু ঠিকই বুঝতে পারছে মা তার রাগ করেছেন। সে আস্তে করে তার ঘরে গিয়ে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছে কমিক্‌স পড়ায়। তাতে মন বসাতে না পেরে সে বের করে স্কুলে হোম-টাস্কের খাতা। বিছানায় বইখাতা ছড়িয়ে লিখতে থাকে।

চৌধুরী তাঁদের শোবার ঘরের দিকে পা বাড়ান। বিরাট শয়নকক্ষ। সঙ্গে বাথরুম। তার সংলগ্ন ড্রেসিং রুমটাই একটা বেডরুমের সমান। ঝাড়বাতি নেমে এসেছে ছাদ থেকে। বিদেশী ফিটিংস সব। আসবাবপত্র সব সেগুন কাঠের। বড় বড় জানালায় ভারী বিদেশী পর্দা। খাটটা কারুকার্যময়। তাতে শাদা চাদর। তারই ওপরে একপাশে ঘাড় কাত করে শুয়ে আছেন সাফিয়া বেগম। হাতে একটা বই, তবে সেটা তিনি পড়ছেন, নাকি মুখটা সরিয়ে রাখার জন্যে ধরে আছেন, বলা মুশকিল।

'কী ব্যাপার, শরীরটা কি খারাপ?'

আজাদের মা কথার জবাব দেন না।

'আজকে তো আমি তাড়াতাড়িই ফিরেছি, নাকি?'

আজাদের মা চুপ করে থাকেন।

'খুব খিদে পেয়েছে। আসো। ভাত দাও।'

আজাদের মা উঠে পড়েন। 'বাবুর্চি, টেবিলে সাহেবের খানা লাগাওনি?'

'আরে, বাবুর্চি তো টেবিলে খানা লাগাবেই। তুমি না থাকলে আমি একা একা খাব নাকি?'

চৌধুরী হাতমুখ ধুয়ে এসে টেবিলে বসেন। সাফিয়া বেগম কোনো কথা না বলে প্লেটে ভাত তুলে দেন।

'নাও। তুমিও বসো'-চৌধুরী বলেন।

সাফিয়া বেগম কথা বলেন না। স্বামীর সঙ্গে খেতে বসার কোনো লক্ষণও তাঁর মধ্যে দেখা যায় না।

'দুপুরেও নাকি খাওনি?'

জবাব নাই।

'নাও। বসো। তুমি না খেলে আমি খাব না।'

চৌধুরী স্ত্রীর হাত ধরেন। সাফিয়া বেগম হাত শক্ত করে ফেলেন।

'থাকুক। বড় খিদে পেয়েছিল। আজকে আর খাওয়া হলো না।' ইউনুস চৌধুরী উঠে পড়ার ভঙ্গি করেন।

'বসেন। আপনি খাবেন না কেন?'

'তাইলে তুমিও বসো।'

'হাত ছাড়েন। আম্মা ওই ঘরে।'

'আম্মাই তো বেশি চিন্তা করছে। তুমি বসো।'

'না, আমি পরে খাব। বাসার আরো লোক খাওয়ার আছে।'

'বাসার আরো লোকদের নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি বসো।'

সাফিয়া বেগম খেতে বসেন। কিন্তু তার মুখে অন্ন রুচছে না। তিনি শুধু ভাত নাড়েন-চাড়েন, খান না।
চৌধুরী বলেন, 'তোমার সমস্যাটা কী বলবা তো!'
'বলব। আপনি খেয়ে ওঠেন।'
ভাত খাওয়া হয়ে গেলে সাফিয়া বেগম স্বামীর জন্যে পান সাজিয়ে নিয়ে ঘরে যান। আস্তে আস্তে মুখ খোলেন, 'আজকে একটা ফোন এসেছিল। বলল, চৌধুরী সাহেব কী করে, কার কাছে যায়, কিছু জানেন? এক মহিলার কাছে...'
সাফিয়া বেগম ডুকরে কেঁদে ওঠেন।
চৌধুরী বিপন্ন বোধ করেন। তিনি পরিস্থিতি সামলানোর জন্যেই বোধহয় বলেন, 'আমাকে নিয়ে এসব কথা তোমাকে কে লাগিয়েছে। ছি-ছি-ছি। এত বড় মিথ্যা কথা বলতে পারল। তার মুখে পোকা পড়বে। আর তুমিও কেমন? তুমি আমাকে না জিজ্ঞাসা করে কে কী বলল না বলল সেইটাই মনে করে বসে আছ। আরে তোমার স্বামী বড়, না ফোনের লোক বড়। কে ফোন করেছে, নাম বলেছে? দাঁড়াও, তাকে আমি দেশছাড়া করব!'
'না, নাম বলেনি।'
'তাইলে তুমি কেন একটা অচেনা অজানা লোকের কথায় বিশ্বাস করলা? বলো।'
'আপনি এক মহিলার সাথে দেখা করতে যান না?'
'না।'
'আমার মাথা ছুঁয়ে বলেন।'
'তোমার মাথা ছুঁয়ে বলতে হবে না। আমি আমার মাথা ছুঁয়েই বলতে পারি। আমি যদি মিথ্যা কথা বলি তাহলে আমার মাথাতেই যেন বাজ পড়ে। মাথা হলো পবিত্র জিনিস। আলাহর কালামের মতোই শরিফ জিনিস।'
সাফিয়া বেগম স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর ধীর কিন্তু স্পষ্টস্বরে বলেন, 'আপনাকে একটা কথা বলে রাখি, আপনি যদি কোনো কিছু উল্টাপাল্টা করেন, আমি কিন্তু সোজা এই বাড়ি ছেড়ে আজাদকে নিয়ে চলে যাব, আর আমার মরা মুখটাও আমি আপনাকে দেখতে দেব না।'
বিদ্যুৎ-বাতির আলোয় সাফিয়া বেগমের মুখটাকে পিতলের তৈরি ভাস্কর্যের মতো কঠিন বলে মনে হয়। আর তাঁর কণ্ঠস্বর যেন ভেসে আসে কোনো গভীর কুয়ার তলদেশ থেকে। ইউনুস চৌধুরীর ছেলেবেলায় মেদিনীমণ্ডল গ্রামে কাঁঠালতলার পাকা ইঁদারায় পড়ে গিয়েছিল এক মহিলা, সম্ভবত ঝাঁপিয়েই পড়েছিল, ইঁদারার গভীর থেকে তার কণ্ঠস্বর যে রকম গমগম করে ভেসে এসেছিল, আজ সাফিয়ার গলায় তিনি যেন সেই সুর শুনতে পান। চুপ করে থাকেন কিছুক্ষণ। তখন এমন নীরবতা নেমে আসে যে, মাথার ওপরে ঘূর্ণমান ফ্যানের শব্দকেও প্রায় কর্ণবিদারী বলে ভ্রম হয়।
চৌধুরী বলেন, 'এইসব উল্টাপাল্টা চিন্তা করে তুমি তোমার মনটাকে বিষিয়ে রেখো না। তোমার মনে দুঃখ লাগে, এ রকম কোনো কিছু আমি করব না।'
সাফিয়া বেগম স্বামীর কথায় আশ্বস্ত বোধ করেন। তিনি এশার নামাজ পড়ার জন্যে ওজু করবেন বলে ওঠেন।
তিনি আজাদের ঘরে উঁকি দেন। আজাদ বিছানার ওপরে বইখাতা ছড়িয়ে হোম-টাস্ক করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে। ইস্। স্কুলটাতে এত পড়ার চাপ কেন? কত ইংরেজি বাংলা বই-আজাদের বইপত্র গুছিয়ে রাখতে রাখতে সাফিয়া বেগম ভাবেন। ছেলেটা হাতমুখ না ধুয়েই শুয়ে পড়েছে। এতগুলো কাজের লোক। কিন্তু ছেলেটাকে একটু যত্নআত্তি করবে, তার লোক নাই। অবশ্য সাফিয়া বেগম ছেলের যত্নের ভার অন্যের ওপর ছেড়ে দিতে পছন্দ করেন না। আজকে দিতে হয়েছে, কারণ আজ তিনি রাগ করে ছিলেন। এখন রাগ কিছুটা কমেছে। মাথা ঠাণ্ডা হচ্ছে। ছেলেটাকে কি এরা ঠিকমতো রাতের খাবার খাইয়েছে? ছেলে তাঁর মাছ খেতে পছন্দ করে, কিন্তু মাছের কাঁটা বাছতে পারে না। ছেলের বয়স আর কত হবে? সে হিসাবে ভালোই লম্বা হয়েছে। বিছানায় এলিয়ে পড়া আজাদের শরীরটা দেখতে দেখতে সাফিয়া এক ধরনের আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন। ছেলেটার হাতপা কী রকম ডাঙর হয়েছে! পরক্ষণেই তিনি মাশালা-মাশালা-বলে নিজের দু গালে দুবার করে ডান হাত বোলান। মায়ের নজর না আবার ছেলের গায়ে লেগে যায়। আস্তে আস্তে ছেলেকে ডাকেন, 'আজাদ, আজাদ, ঘুম? বাবা, ঘুমাবি, না উঠবি? ওঠ। হাত-পা ধুসনি, বিকালে কী খেয়েছিস না খেয়েছিস, রাতেও তো খাওয়া দেখতে পারিনি, উঠে পড় বাবা। হোম-টাস্ক কি বাকি আছে?'
আজাদের ঘুম ভেঙে যায়। সে কেঁদে ওঠে-'উম্‌ম্। আমাকে ঘুমাতে দাও।'
'খিদে লাগেনি? কী খেয়েছিস না খেয়েছিস?'
'আরে ভাত খেয়েছি না। সরো তো।'
'হোম-টাস্ক করেছিস?'
'ভোরে ডেকে দিও।'
'আচ্ছা ঘুমা। আমি একটু ভাত মেখে আনি।'
সাফিয়া বেগমের মন মানে না। তিনি আবার ডাইনিং টেবিলে যান। আজাদের ফুলঅলা প্লেটে ভাত বাড়েন। তরকারি নেন। রুই মাছের দুটো টুকরো নিয়ে তাড়াতাড়ি কাঁটা বাছতে লেগে পড়েন। তারপর ছেলের ঘরে এসে দেখেন সে ঘুম। দুটো বালিশ দেয়ালে দিয়ে তিনি ছেলেকে বিছানায় বসান। ঘুমন্ত ছেলে বালিশের চেয়ারে বসে থাকে। 'দেখি

বাবা, হা কর তো' বলে তিনি ছেলের মুখে ভাত পুরে দেন। ছেলে মুখে ভাত নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

পুরনো গৃহপরিচারিকা জয়নব তাই দেখে বকতে থাকে, 'দ্যাখো তো আম্মাজানের কারবার। ছেলেটারে কেমনে খাওয়ায়। ও খাইছে না। আমগো সামনেই তো খাইল।'

'নিজের হাতে আজাদ খেতে পারে? মাছের কাঁটা বাছতে পারে? কী যে বলো না তুমি?' সাফিয়া পরিচারিকাকে বলেন।

কয়েক গ্রাস ভাত ছেলের মুখে তুলে দিয়ে তারপর প্রশান্তি আসে। এক গেলাস পানি একই কায়দায় খাইয়ে দিয়ে ছেলের মুখটা ভালো করে মুছে দেন তিনি। শেষে একটা ছোট বালতিতে করে পানি আর তোয়ালে আনান। খাটের একপাশে ছেলের দু পা ঝুলিয়ে দেন। তারপর বালতির পানিতে তার ছোট্ট পা দুটো ডোবান। নিজের হাত দিয়ে ডলে ডলে ছেলের পা দুটো তিনি পরিষ্কার করেন। বালতি মেঝেতে রেখে পা দুটো তোয়ালে দিয়ে মুছে দেন ভালো করে। ভেজা তোয়ালে ডলে ছেলের হাত দুটো আর মুখটা মুছে দিয়ে তারপর তিনি ক্ষান্ত হন। ছেলেকে ঠিকভাবে শুইয়ে দিয়ে কোলবালিশটা তার একপাশে যথাস্থানে রেখে ছেলের দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকান। ছেলে তাঁর ঘুমের কোন অজানা দেশে! শেষে ডিমলাইট জ্বালিয়ে বাতি নিভিয়ে মা কক্ষ ত্যাগ করেন।

৭

আজাদ একটু একটু করে বড় হতে থাকে, আর ধীরে ধীরে হয়ে উঠতে থাকে দুষ্টের শিরোমণি। সিনেমা দেখার পোকা যেন সে। নাজ সিনেমা হলে ইংরেজি ছবি বেশি চলে। দেখতে যায় বন্ধুবান্ধব মিলে। ছুটির দিনের মর্নিং শো প্রায় কোনোটাই বাদ যায় না। সম্প্রতি তারা একটা ছবি দেখেছে। তাতে পাত্রপাত্রীরা চোখ ঢেকে রাখে চামড়ার মুখোশে। ঢাকার একটা দোকানে সেই মুখোশ পাওয়া যাচ্ছে। বন্ধুবান্ধব মিলে বেরিয়ে পড়ে সেই মুখোশ কিনতে। দোকানে গিয়ে এক ঢিলে দু পাখি শিকার। স্মোকগান পাওয়া যায়। বন্দুক, গুলি করলে ধোঁয়া বের হয় নল দিয়ে। বন্দুক আর মুখোশ কিনে ফেলে তারা। চলে আসে বাসায়। দরজা লাগিয়ে চলে খেলা। স্মোকগান খেলা। চোখে মুখোশ। তারপর এ ওকে ঘুসি মারে, ও একে। ঘুসি খেয়ে কেউ পড়ে যায়। কেউবা পড়তে চায় না। চালাও গুলি। বন্দুকের মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। 'এই তুই মরা, মরা, তোকে তো আমি গুলি করেছি।' 'কিসের। তার আগেই তোকে না আমি ফায়ার করলাম। না, আমি মরা না।' খেলার নিয়মকানুন কেউ মানতে চায় না। গুলি খেয়েও উঠে পড়ে। একটা রেফারি থাকলে ভালো হতো। তবু খেলা চলে। হৈচৈয়ে ঘরের আশপাশে কারো তিষ্ঠানো দায়। এরই মধ্যে আজাদের খালাতো ভাই ছোট্ট জায়েদ আসে। দরজায় নক করে।

'কে?' আজাদ বলে।

'আমি জায়েদ।'

'কী চাস?'

'আমাকেও খেলায় ন্যাও।'

'যা যা, এটা বড়দের খেলা।'

'আমিও বড় হইছি।'

'হি-হি-হি-হি। আরো বড়ো হ। তুই তো মার ইনফরমার।'

'না, আমি আম্মারে কিছু কই না।'

'আমি আম্মারে কিছু কই না। কস। সেদিন যে স্কুল পালিয়ে স্টেডিয়ামে খেলা দেখতে গিয়েছিলাম, তুই ছাড়া মারে কে লাগিয়েছে?'

'আমি না।'

'যা ভাগ, ডোন্ট ডিস্টার্ব। গেট লস্ট।'

জায়েদ বুঝতে পারে, এরা শুধু স্মোকগান খেলে না। অন্য কোনো ব্যাপার আছে। জানালার পর্দা তুলে দেখে, হ্যাঁ, স্মোকগানের আড়ালে বেশ চলছে সিগারেট খাওয়া। দাদা একটা করে টান দেয়, আর কাশে।

কামাল বলে, 'তুই তো ফল্‌স টান দিচ্ছিস। জেনুইন টান দে।'

আজাদ বলে, 'সুয়ের আপঅন, জেনুইন টান দিচ্ছি।'

'নাক দিয়ে স্মোক ছাড় তো!'

আজাদ নাক দিয়ে ধোঁয়া বের করার চেষ্টা করে। কাশি দিতে দিতে তার চোখ দিয়ে পানি এসে যায়।

জায়েদ দৌড় ধরে। আম্মাকে এই গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশনটা জানানো জরুরি। খালাকে আম্মা বলে ডাকে সে। সমস্যা হলো, দাদা সহজেই ধরে ফেলে ইনফরমারটা কে! তা ধরে ফেলুক। দৌড়ে সাফিয়া বেগমের কাছে পৌঁছে যায় জায়েদ। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, 'আম্মা, আম্মা, দেইখা যান।'

'কী?'

'আরে চলেন না ওই ঘরে। দাদায় কী করে?'

'কী করে?'

'সিগারেট খায়।'

'তুই কেমন করে বুঝলি!'

'আমি দেখছি।'
'আরে ওরা স্মোকগান খেলে। তার ধোঁয়া। যা তো। আমার কাজ আছে।'
'আরে না, আমি নিজ চোখে দেইখা আইলাম। বগা সিগারেট খাইতেছে। আয়েন না।'
সাফিয়া বেগম ভাগ্নের হাত ধরে যান। জানালার কাছে যেতেই নাকে পান সিগারেটের গন্ধ। তিনি দরজায় ধাক্কা দেন–'এই, দরজা খোল।'
সর্বনাশ। মা এসে গেছে। মুহূর্তে স্থির হয়ে যায় কর্তব্য। তারা লুকিয়ে ফেলে যে যার সিগারেট। তারপর ভেজা বেড়ালের মতো মুখটি করে খোলে দরজা।
'ঘরে ধোঁয়া কিসের?' মা বলেন।
'স্মোকগান খেলছি না!' আজাদ জবাব দেয়।
'গন্ধ কিসের!'
'স্মোকগানের স্মোকের!'
'স্মোকগানের স্মোকের মধ্যে কি ওরা তামাক দিয়েছে?'
মা সিগারেট খোঁজেন। গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। মনে হয় এখনও ধোঁয়া উঠছে। কিন্তু জিনিসটা ওরা লুকিয়ে রেখেছে কোথায়? খোঁজ খোঁজ। শেষে পাওয়া যায় এক দুর্গম এলাকায়। হুঁকার নল ধরে যাত্রা শুরু করে অন্তিমে হুঁকার মধ্য থেকে বেরোয় সিগারেট।
কিন্তু সেদিনও আজাদের মা মারেননি আজাদকে। কঠিন মহিলা ছিলেন তিনি। খুবই কঠিন। তা সত্ত্বেও নিজের ছেলের গায়ে কোনোদিন হাত তোলেননি সাফিয়া বেগম। বাচ্চাদের মারধর করা তাঁর নীতিবিরুদ্ধ ছিল।
কত কথা, কত স্মৃতি। হাতের তালু আবার ঘামতে থাকে জায়েদের। সমস্ত শরীর যেন পুড়ে যাচ্ছে, এত দাহ। আম্মাকে কবরে নামিয়ে রেখে এসে সে যেন আর শান্তি পাচ্ছে না একটুও। মোটরের গ্যারাজের কাজে যাওয়া হয় না তার ইদানীং। কিছুই ভালো লাগে না। শুধুই উত্তাপ! শুধুই উত্তাপ! বারবার মনে হয় একাত্তরের আগস্টের সেই দৃশ্যটা, আজাদ দাদা দরজার চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে আছে, মগবাজারের বাড়িতে, ঘরভরা আজাদের খালাতো ভাইবোন, মা তাদের পাতে ভাত তুলে দিচ্ছে, রাত্রিবেলা, ইলেকট্রিসিটির হলুদ আলোয় পুরোটা ঘরের সব কটা মানুষ যেন ভিজছে, কোনো প্রসঙ্গ ছাড়াই আজাদ বলে, 'মা, তুমি কিন্তু মা আমাকে কোনো দিনও মারো নাই...'
স্মোকগানের ঘটনাটা মনে হয় ফরাশগঞ্জের বাড়ির। তিনতলায় আজাদ দাদার একটা আলাদা ঘর ছিল। সেই ঘরেই ঘটেথাকবে এই ছেলেবেলাকার ছেলেখেলা।
ফরিদাবাদে এক চাচার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল আজাদ আর জায়েদরা। আজাদ তখন হয়তো সদ্যতরুণ, আর জায়েদ নিতান্তই বালক। ঠিক কোন সময়ের কথা, এতদিন পরে জায়েদ সেটা হুবহু মনে করতে পারে না। গ্রামে গিয়ে তারা বেরিয়ে পড়ে মাঠে-ঘাটে-প্রান্তরে। পুকুরপাড়, শ্মশানঘাট, বাজে পোড়া জামগাছতলা। একটা শীর্ণ নদীও বয়ে যাচ্ছে গ্রামের একপাশ দিয়ে। আজাদের পায়ে জুতা। জায়েদেরও।
নদীতীরে দাঁড়িয়ে আজাদ বলে, 'দেখবি, আমার জুতার কী রকম পাওয়ার!' পকেট থেকে দিয়াশলাইয়ের কাঠি বের করে জুতায় ঘষতেই আগুন জ্বলে ওঠে। ঠোঁটের সিগারেটে আগুন ধরিয়ে টানতে থাকে আজাদ। তারপর সিগারেটটা হাতে নিয়ে এক পশলা ধোঁয়া সে ছেড়ে দেয় জায়েদের মুখ বরাবর।
জায়েদ বলে, 'আমারে একটা কাঠি দ্যাও। আমিও পারুম।'
'কী পারবি?'
'আমার জুতা থাইকা আগুন জ্বালাইতে!'
'পারবি না!'
'পারুম।'
'আরে এটা জ্বালাতে শরীরে পাওয়ার লাগে। তাহলে জুতায় এই পাওয়ার আসে।'
'দ্যাও না দাদা একটা কাঠি।'
'নে।'
আজাদ দিয়াশলাইয়ের অনেক কটা কাঠি তুলে দেয় জায়েদের হাতে। জায়েদ নিজের জুতার গায়ে কাঠি ঘষে। আগুন জ্বলে না। কাঠির মুখের বারুদ ক্ষয়ে যায়। কাঠি ভেঙে যায়। একটার পর একটা। না, কাঠি আর জ্বলে না।
'দাদা, ঘটনা কী? কও দেখি।'
'পাওয়ার রে। পাওয়ার। সিনেমায় দেখিস না। হিরোরা কেমনে পারে। একটা হিরো কয়েকটা ভিলেনকে একাই মেরে ছাতু বানায়। কেমন করে? শরীরে পাওয়ার থাকে তো তাই। আমার শরীরে সেই রকম পাওয়ার আছে।'
নাজ সিনেমা হলের শিক্ষা এসব। মর্নিং শোর।
জায়েদের মনে পড়ে, ফরাশগঞ্জের বাসাতেও তো জাহানারা ইমাম আসতেন। রুমী আসত। জামী আসত। প্রথম দিন যেদিন জাহানারা ইমামকে দেখল জায়েদ, সেদিনটার কথা তার খুব মনে আছে। হারানো সুর নামে একটা ছবি দেখতে সে ঢুকেছিল গুলিস্তান হলে। তাতে অভিনয় করেছেন সুচিত্রা সেন। ছবি দেখে কেবল সে ফিরে আসছে ফরাশগঞ্জের বাসায়। হলের মধ্যে অন্ধকার। আবার বৃষ্টির দৃশ্যও ছিল। জায়েদের ধারণা, বাইরেও খুব অন্ধকার নেমে এসেছে আর বৃষ্টি হচ্ছে। মেটিনি শোর ছবি ভাঙলে গ্রীষ্মের এই দিনে সে দেখতে পায় বাইরে এখনও সূর্যের আলো। পুরো ব্যাপারটায় কেমন ধন্দ লাগে তার। আর ছবিটাও বড় আবেগজাগানিয়া। সবটা মিলে একটা ঘোরের মধ্যে ছিল জায়েদ। নবাবপুর রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে দুপাশের রিকশার ঘণ্টির আওয়াজ মাথার

মধ্যে যেন ঝিঁঝিপোকার ডাকের মতো অবিশ্রান্ত বলে মনে হয়। ফরাশগঞ্জের বাসায় ফেরে সে। কনে-দেখা হলুদ আলো পড়েছে বাড়ির দোতলা তিনতলায়। জায়েদের পুরো ব্যাপারটা অবাস্তব লাগছে। সদর দরজা পেরিয়ে বৈঠকখানায় যেতেই তার চক্ষুস্থির। আরে আরে, হারানো সুর ছবির নায়িকা এখানে বসে আছে কেন? সে চোখ ডলে। না, সুচিত্রা সেনই তো। সে কলতলায় যায়। চোখ ধোয়। আবার উঁকি দেয় বৈঠকখানায়। না তো, কোনো ভুল নাই। সুচিত্রা সেন তাদের বাসায়। আসা অসম্ভব নয়। এদের বাসায় নানা রকমের বড় বড় মানুষেরা আসে।

তখন সে পাশের ঘরে মামা-চাচাদের ফিসফাস শুনতে পায়। সিদ্ধেশ্বরী গার্লস স্কুলের হেড মিস্ট্রেস এসেছেন তাঁর দুই ছেলে নিয়ে। আজাদ দাদার তিনতলার ঘরে যায় জায়েদ। দেখতে পায় হেড মিস্ট্রেসের দুই ছেলেকে। বড়টা রুমী। আজাদ দাদার চেয়ে লম্বায় একটু ছোট। আরেকটা জামী। সে তার (জায়েদের) চেয়ে একটু ছোট হতে পারে। কিছুক্ষণের ভেতরেই তারা ছাদে গিয়ে খেলতে আরম্ভ করে। বাড়ির আরো ছেলেমেয়েরা তাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

ওপেনটি বায়োস্কোপ,
নাইন টেন তেইশকোপ,
সুলতানা বিবিয়ানা,
সাহেব বাবুর বৈঠকখানা,
মেম বলেছেন যেতে...
পান সুপারি খেতে
আমার নাম রেণুবালা,
গলায় আমার মুক্তার মালা।

আজাদ আর রুমী পরস্পরের হাত ধরে তোরণের মতো দাঁড়িয়ে আছে। আজাদ দাদা করে কি, পুরো ছড়াটা বলে না, যেই মেয়েকে পছন্দ হয়, তার গলাতেই মুক্তার মালা না হলেও তার হাতের মালা পরিয়ে দেয়। তখন মেয়েরা 'হয় নাই, চোট্টামি করছে' বলে চেঁচাতে থাকে। রুমী বলে, 'এই আজাদ, বারবার তুমি ছড়াটা ভুলে যাচ্ছ কেন? নাও, এবার পুরোটা ঠিকমতো বলো।'

'ওপেনটি বায়োস্কোপ
নাইন টেন টুয়েন্টিথ্রি কোপ...' আজাদ বলতে শুরু করে।

'এই, কী বলো?' রুমী বলে, 'তেইশ কোপ তো।'

'নাইন টেনের পরে টুয়েন্টিথ্রি হওয়া উচিত না? ইংরেজির সাথে আবার বাংলা আসে কী করে?' আজাদ হাসে।

কাজী কামালের মনে সেন্ট গ্রেগরি স্কুলের সহপাঠী হিসাবে আজাদের স্মৃতি উদিত হয় কেমন ছাড়া-ছাড়া ভাবে। হয়তো স্মৃতি মাত্রই তাই। আজকে কে বলতে পারবে গতকাল ২৪ ঘণ্টায় প্রতিটা মিনিটে সে কী করেছে, কী ভেবেছে? কী করেছে গত এক বছরে, রোজ? আজাদের সঙ্গে একই স্কুলে একই সঙ্গে পড়বার স্মৃতির সবই যে নিখাঁদ ভালোবাসা আর বন্ধুত্বের, তাও কিন্তু নয়। আজাদ যে ভয়াবহ বড়লোকের ছেলে ছিল, একেক দিন একেকটা পোশাক পরে আসত, আসত ভীষণ দামি গাড়ি চড়ে, তার পকেটে সব সময় টাকা-পয়সা থাকত, এসব নিয়ে কাজী কামালের ছোটবেলায় একটা অব্যাখ্যাত শ্রেণীহিংসাও হয়তো ছিল। তবুও আজাদকে পছন্দ না করেও তাদের নিম্নমধ্যবিত্ত দলের কোনো উপায় ছিল না। কারণ আজাদ তাদের সিনেমা দেখাত। সিনেমা দেখার একটা প্রবল ঝোঁক ছিল আজাদের। আর বন্ধুদের দেখানোর বেলাতেও তার কোনো কার্পণ্য ছিল না। আজাদের সঙ্গেই সে দেখেছিল মৌলভীবাজারের ভেতরে তাজমহল সিনেমা হলে দি ওল্ডম্যান অ্যান্ড সি। বুড়ো জেলে একটা বিরাটকায় মাছ ধরার জন্যে সংগ্রাম করছে, এই সংগ্রামে সে কিছুতেই হার মানবে না-দেখে ভালোই লেগেছিল কামালের। তখন টিকেটের দাম ছিল কম, মর্নিং শোতে বারো আনা হলেই ডিসিতে ছবি দেখা যেত। কামালরা ছবি দেখলে কোন ক্লাসে দেখত, সেটা বড় ব্যাপার ছিল না। কিন্তু আজাদের কাছে এগুলো অনেক বড় ব্যাপার ছিল। সে কখনও থার্ড ক্লাসে ছবি দেখেওনি, দেখায়ওনি। লায়ন, রূপমহল, মুকুল, মায়া-এসব সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা দেখা চলত। তবে নাজে আসত ভালো ভালো ইংরেজি ছবি।

আজাদদের বাসায় যাওয়াটাও একটা আনন্দের ব্যাপার ছিল তার সহপাঠীদের জন্যে। কারণ তার মা খাওয়াতে খুব পছন্দ করতেন। খালাম্মা সেধে সেধে একদম পেটপুরে খাওয়াতেন। নানা পদের খাবার। সেই লোভেও অনেক সময় যাওয়া চলত আজাদদের বাড়িতে। সে ফরাশগঞ্জের বাড়ি হোক, আর নিউ ইস্কাটনের বাড়িই হোক।

আজাদ যে পড়াশোনায় খুব ভালো ছিল, তা নয়। তবে খারাপ সে ছিল না। পরীক্ষায় কখনও ফেইল করেনি। আবার ফার্স্ট সেকেন্ডও হয়নি। কিন্তু আশ্চর্য ভালো করেছিল রহমতউল্লা-স্যারের ক্লাসে। তিনি নিতেন আজাদদের হাতের লেখা ভালো করার ক্লাস-পেনম্যানশিপ ক্লাস। একটা চার্ট ঝোলানো থাকত এই ক্লাসে, আমেরিকান স্টাইলে বাঁকা বাঁকা হরফে তাতে ইংরেজি বর্ণমালা লেখা। কলম না তুলে তেরছা করে অ থেকে ত পর্যন্ত লিখতে হতো। কোনো অক্ষরের সময়ই কলম তোলা যাবে না। রহমতউল্লা-স্যারের নিজের হাতের লেখা ছিল অতি চমৎকার। দেখে মনে হতো সার্টিফিকেটের লেখা নিশ্চয় এই স্যারের কাছ থেকে লিখিয়ে নেওয়া হয়। হাতের লেখার এই ক্লাসে আজাদ খুব ভালো করত। প্রায়ই ভেরি গুড পেত আজাদ, তার কপিতে।

আজাদের এই ভালো ইংরেজি লেখাটা শেষ পর্যন্ত কাজে লেগেছিল তার ধরা পড়ার মাত্র দিন সাতেক আগে। সে জর্জ হ্যারিসনের বাংলাদেশ গানটা কপি করে নিয়েছিল নিজের জন্যে, আর তখন রুমী, জুয়েল, কামাল, বদি তাকে অনুরোধ করেছিল তাদেরকেও একটা করে কপি দেওয়ার জন্যে। আজাদ ছবিও ভালো আঁকত। মধু মোলা-নামের এক আর্টের শিক্ষক তাকে ছবি আঁকা শেখাতে আসতেন বাসায়। তাঁর কাছে শিখে শিখে আজাদ একটা ছোটখাটো আর্টিস্ট হয়ে গিয়েছিল। বিজি চৌধুরী স্যার শুক্রবার স্কুল ছুটির পর আলাদাভাবে বসাতেন ড্রয়িংয়ের ক্লাস। এই ক্লাস করতে চাইলে স্যারের কাছে গিয়ে নাম লেখাতে হতো। আজাদও নাম লিখিয়েছিল। কিন্তু সে ক্লাস করতে চাইত না। বলত, 'আরে রাখ রাখ, এ সময়টা ক্রিকেট মাঠে না-হলে সিনেমা হলে কাটিয়ে আসাটাই তো বেশি লাভের ব্যাপার।' বিজি চৌধুরী স্যার বছরে দুবার ছবি আঁকার প্রতিযোগিতার আয়োজন করতেন। পুরস্কার থাকত খুবই আকর্ষণীয়। সেই পুরস্কারের লোভে হোক, অথবা নিজের প্রতিভা যাচাই করে নেওয়ার খাতিরে হোক, আজাদ ছবি আঁকা প্রতিযোগিতায় একবার অংশ নিয়েছিল। ওর ছবিটা ভালো হয়েছিল। আর ও পেয়েছিল ৮০-তে ৭৫। আর প্রতিদ্বন্দ্বী কাশেম পেয়েছিল ৮০-তে ৬০। কিন্তু স্যার প্রথম পুরস্কার দিলেন কাশেমকে, তার কারণ হিসেবে স্যার বলেছিলেন বাকি ২০ মার্কস হলো উপস্থিতির জন্যে। এতে কাশেম ২০-এ ২০ পেয়েছে। আজাদ পেয়েছে ০। দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়ে আজাদ বেশি খুশি হয়েছিল, কারণ প্রথম পুরস্কারটা ছিল রঙের বাক্স, আর দ্বিতীয়টা ছিল একটা খেলনা গাড়ি। ও ঠোঁট উল্টে বলেছিল, 'আরে কালার বক্স আমার বহুত আছে।'

আজাদের আরেক সহপাঠী কামরান আলী বেগের মনে পড়ে যায়, ক্লাসে সূত্রধর স্যার একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, এয়ার-বাস কী? ঢাকা টু ঈশ্বরদী তখন এয়ার-বাস চলতে শুরু করেছে। স্যার এই ব্যাপারটাই বোঝাচ্ছিলেন। আজাদ স্যারের কথা শুনছিল না। সে ব্যস্ত ছিল পার্শ্ববর্তী সহপাঠীর সঙ্গে কাটাকুটি খেলায়। স্যারের নজরে পড়ে যায় সে। স্যার জিজ্ঞেস করেন, 'আজাদ, ওঠো। কী করছিলে?'

'কিছু না স্যার।'

'আমি কী পড়াচ্ছি, শুনছিলে?'

'জি স্যার।'

'আচ্ছা বলো তো এয়ার-বাস কী?'

আজাদ উসখুস করে। ঠিক এই সময় পিয়ন আসে কী একটা নোটিস নিয়ে। স্যার সে-নোটিসটা পড়ে তাতে স্বাক্ষর করে পিয়নকে বিদায় করেন। ইত্যবসরে আজাদ পেছনে বসা বেগকে জিজ্ঞেস করে ফিসফিসিয়ে, 'এই, এয়ার-বাস কী রে?'

বেগ বলে, 'আরে এয়ার-বাস বুঝলি না? আকাশ দিয়ে বাস ওড়ে। তার দরজায় থাকে কন্ডাক্টর। সে বাসের গায়ে চাপড় মেরে বলে, আইসা পড়েন ডাইরেক্ট সদরঘাট। তার দরজায় ঝোলানো থাকে দড়ির সিঁড়ি। প্যাসেঞ্জাররা সেই সিঁড়ি দিয়ে তাতে উঠে পড়ে।'

পিয়নকে বিদায় করে সূত্রধর স্যার আবার গর্জন করে ওঠেন, 'হ্যাঁ আজাদ, বলো, এয়ার-বাস কী?'

আজাদ বলতে শুরু করে, 'আকাশ দিয়া বাস যায় স্যার, দরজায় থাকে দড়ির সিঁড়ি, সেই সিঁড়ি দিয়া প্যাসেঞ্জার উঠিয়া থাকে...'

পুরো ক্লাস হেসে গড়িয়ে পড়ছে। স্যার হাসবেন না কাঁদবেন, বুঝতে পারছেন না। শেষে হাসি চেপে বলেন, 'দাঁড়িয়ে থাকো। ঘণ্টা না বাজা পর্যন্ত বসবে না।'

৮

শহরের মুক্তিযোদ্ধা আর আজাদের বন্ধুবান্ধবদের মনে পড়ে যে, আজাদের মায়ের দুঃস্বপ্নের দৃশ্যটাই শেষতক ইউনুস চৌধুরীর জীবনে বাস্তব রূপ লাভ করেছিল। এখান থেকে ওখান থেকে কৃষ্ণের ষোলশ গোপিনী না হলেও চৌধুরীর জীবনে নারী-ভক্তের উপস্থিতি সাফিয়া বেগম টের পেতে শুরু করেন।

এরই মধ্যে একজন ছিলেন যিনি চৌধুরীর আত্মীয়া, বিবাহিতা, আর সম্পর্কে তাঁর বড় ভাইয়ের স্ত্রী। তাঁর সঙ্গে মেলামেশাটা সাফিয়া বেগম একদমই সহ্য করতে পারতেন না। মহিলা নিউ ইস্কাটনের বাসায় একবার বেড়াতেও এসেছিলেন। অতিথি-বৎসল সাফিয়া বেগম সব ধরনের অতিথির ঝামেলা হাসিমুখে সহ্য করলেও এই মহিলাকে সহ্য করতে পারেননি। সম্ভবত তাঁর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাঁকে ভবিষ্যতের অশনিসংকেত জানান দিচ্ছিল। সাফিয়া বেগম স্বামীকে বলেন, 'এই মহিলাকে আপনি আমার বাসা থেকে যেতে বলেন। আমি আর এক মুহূর্তও তাকে এই বাড়িতে দেখতে চাই না।'

চৌধুরী সাহেব তখন তরলের গুণে বেশ উচ্চমার্গে অবস্থান করছিলেন। তিনি বলেন, 'কেন? থাকতে পারবে না কেন?'

'কারণ ওই মহিলা ভালো না। তার স্বভাব-চরিত্র চালচলন আমার ভালো ঠেকছে না।'

'কিন্তু আমার কাছে ভালো ঠেকছে।'

'তা তো ঠেকবেই। আপনার সাথে তার কী সম্পর্ক, আমি বুঝি না। ছি-ছি-ছি। উনি না আপনার সম্পর্কে ভাবি হয়?'

'নিজের তো আর ভাবি না।'

'নিজের ভাবি না হলেই আপনি একটা ছেলের বাবা হয়ে আরেকটা ছেলের মায়ের সাথে সম্পর্ক রাখবেন?'

'কী সম্পর্ক?'

'তা আমি কী জানি?'

'তাহলে কথা বলো কেন?'

'আপনি তাকে বের করে দেবেন, এই হলো আমার শেষ কথা!'

'যদি বের করে না দেই।'

'তাহলে আমি বের করে দেব। সে এখানে এসেছে কোন অধিকারে?'

'তুমি অধিকারের কথা জিজ্ঞাসা করো। তাহলে আমি তাকে অধিকার দিব। সে এখানে থাকবে আমার স্ত্রীর অধিকার নিয়ে।'

'খবরদার। এই কথা শোনার আগে আমার মরণ হলো না কেন?'

'আমার হক আছে, আমি চারটা পর্যন্ত বিবাহ করতে পারি। তুমি তো শরিয়ত মানো, নামাজ রোজা ইবাদত বন্দেগি করো, তুমি আমার হক মানবা না?'

'না। মানব না। শরিয়তে আছে চারটা বিয়ে করা যাবে। কিন্তু চার বউকে একদম এক সমান নজরে দেখতে হবে। কাউকে এক সরিষা পরিমাণ বেশি বা কম ভালোবাসা যাবে না। আবার একটু কম বা বেশি অপছন্দও করা যাবে না। সেটা কারো পক্ষে করা সম্ভব না। কাজেই দুই বিয়ে করা ধর্মের মতে উচিত না।'

'তুমি বেশি বোঝো? তুমি জানো আমার পায়ের নিচে তোমার বেহেশত।'

'যে স্বামী স্ত্রীর হক আদায় করতে পারে না, তার পায়ের নিচে বেহেশত থাকতে পারে না।'

'কথা পেঁচিও না। আমি ওকে বিয়ে করবই।'

'আপনি ওই মহিলাকে বিয়ে করলে আমার মুখ আর জীবনেও দেখবেন না। বড় ভাইয়ের বউকে বিয়ের কথা ভাবে, আমি কী আজরাইলের পালায় পড়েছি।'

'আমি তোমাকে আরো গয়না দেব। তোমার নামে একটা জাহাজ লিখে দেব।'

'আপনার গয়নায় আমি থুতু দেই।'

'কী বললা তুমি?'

'আপনাকে মিনতি করে বলি। আপনি ওই মহিলাকে ছাড়েন। এই বাড়ি-টাড়ি সব আমি আপনার নামেই লিখে দেব। তবু পাগলামি ছাড়েন।'

'না, আমি ওকে বিবাহ করবই।'

'তাহলে আপনি আমার মরা মুখ দেখবেন।'

সাফিয়া বেগম কেঁদেকেটে অন্য ঘরে চলে যান। পাশের ঘরে আজাদ। সে সব কথা শুনছে। তার মাথা গরম হচ্ছে। অথচ ঠিক করতে পারছে না সে কী করবে। মা-বাবা ঝগড়া করছেন। বাবা আরেকটা বিয়ে করতে চাইছেন। বাড়িতে এইসব হতে থাকলে তার বুঝি কষ্ট হয় না? তার বুঝি খারাপ লাগে না? তার বুঝি ইচ্ছা হয় না নিজের ওপরে শোধ নিতে। তার কান দুটো গরম হয়ে ওঠে। সে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে জোরে গান ছেড়ে দেয়। শক্তিশালী গানের যন্ত্র মাথায় তোলে পুরোটা বাড়িকে।

মহিলাকে চৌধুরী আপাতত বিদায় করেন ইস্কাটনের বাসা থেকে।

কিন্তু তাঁর জীবন থেকে নয়। মাঝখানে কিছুদিন চৌধুরী ব্যয় করেন তাঁর দ্বিতীয় বিয়ের আনজাম সম্পন্ন করতে। তাঁর বৃদ্ধ পিতা আর মাতার অনুমতি আদায় করেন দ্বিতীয় বিয়ের ব্যাপারে। আজাদের দাদা-দাদী বিয়ের অনুমতি দিতে খুব বেশি কুণ্ঠা দেখান না। ছেলে তাঁদের শিক্ষিত হয়েছে, বড় হয়েছে, আর টাকাকড়ি আয়-উন্নতি করেছে কত! তার তো একাধিক স্ত্রী থাকতেই পারে। মহিলার দিক থেকেও আইনগত প্রস্তুতির ব্যাপার ছিল। তাঁকে প্রথম স্বামীর কাছ থেকে ডিভোর্স নিতে হয়। তারপর চৌধুরীর কয়েকজন অতি ঘনিষ্ঠ নিকটাত্মীয় আর বন্ধুর উপস্থিতিতে মগবাজারের এক আত্মীয়ের বাসায় এক রাতে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়।

রাত তখন একটার মতো বাজে। সাফিয়া বেগমের বিশ্বস্ত পরিচারিকা জয়নব এসে খবর দেয়, 'আম্মাজান, আব্বায় আরেকটা বিয়া কইরা বউ নিয়া এ বাড়িতেই আইছে।'

সাফিয়া বেগম মুহূর্তখানেক স্তব্ধ হয়ে চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। মুহূর্তখানেকই শুধু। তখন পুরোটা পৃথিবী নৌকার মতো একবারের জন্যে দোল খেয়ে ওঠে। তারপর স্থির হয়। তিনি পরিস্থিতি অনুধাবন করার চেষ্টা করেন। তাঁর সমস্ত শরীর সংকল্পে নড়ে ওঠে। মাথা থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত গলিত আগুনের ধারা বয়ে যায়। তিনি কর্তব্য স্থির করেন। পরিচারিকাকে বলেন, 'আজাদকে এখানে আসতে বলো।' তাঁর কণ্ঠস্বরে প্রতিজ্ঞার ধাতব টঙ্কার।

আজাদ আসে। তার মাথার চুল এলোমেলো, চোখের নিচে কালির আভাস, পরনে নিদ্রাপোশাক। সে নিচের পাটির দাঁত ওপরের পাটির সামনে আনছে।

মা বলেন, 'আমি এখন এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আর কোনো দিন আমি তোর বাবার মুখ দেখব না। তুই কি এই বাড়িতে থাকবি, না আমার সাথে যাবি?'

আজাদের সাত-পাঁচ ভাবার দরকার নাই। সে বলে, 'তোমার সাথে যাব।'

'চল। বইপত্র গুছিয়ে নে। তাড়াতাড়ি কর। ৫ মিনিট টাইম দিলাম।'

আজাদ তার ঘরে যায়। তার জিনিসপত্র গোছাতে থাকে। স্কুলের ব্যাগে বইপত্র গোছানোই আছে। কিন্তু তা-ই তো সব নয়। কত কাপড়চোপড়। কতশত গল্পের বই, কমিক্সের

বই। খেলনা শত পদের। ক্যামেরা, আর আছে সত্যিকারের একটা রিভলবার। তাদের একটা বন্দুকের দোকানও আছে। সেখান থেকে রিভলভারটা সে নিয়েছে, তার নামেই লাইসেন্স করে।

আজাদ কোনটা রাখবে, কোনটা নেবে! রিভলবারটা সে সঙ্গে নেয়। এটা এই গণ্ডগোলের সময়ে কাজে লাগতে পারে। সে আর তার মা একা বের হচ্ছে। রাত্রির এই ঘন অন্ধকারের অজানা পেটের ভেতরে ঢুকে যাবে তারা। কোথায় যাবে, কী হবে, সবই অনিশ্চিত। তার টেপ রেকর্ডারে রুমীর কণ্ঠে একটা কবিতার আবৃত্তি টেপ করা আছে। বীরশিশু।

মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে,
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে,
তুমি যাচ্ছ পালকিতে মা চড়ে,
দরজা দুটো একটুকু ফাঁক করে...
এমন সময় হারেরেরেরে,
ওই যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে...

ওই ডাকাতদলের হাত থেকে মাকে কে রক্ষা করেছিল? তার ছেলেই তো।

পাড়ার লোকে সবাই বলত শুনে,
'ভাগ্যে খোকা ছিল মায়ের কাছে।'

আর আজাদের মায়ের যদি কিছু হয়! কে তাঁকে বাঁচাবে বিপদ-আপদ থেকে! আজাদকেই তো দায়িত্ব নিতে হবে।

আজাদ তার স্কুলের ব্যাগের মধ্যে রিভলবার আর বুলেট তুলে নেয়।

সাফিয়া বেগম এই বাড়ির কোনো কিছু সঙ্গে নেবেন না। যাকে বলে একবস্ত্রে যাওয়া, তা-ই তিনি যাবেন। কিন্তু তাঁর বাবার দেওয়া গয়নাগুলো আলমারিতে একটা আলাদা বাক্সে তোলা আছে। এগুলো না নেওয়াটা উচিত হবে না। এগুলো চৌধুরীর নয়। আর তা ছাড়া আজাদ থাকবে তাঁর সঙ্গে। তাকে তো মানুষ করতে হবে। পড়াতে হবে। খাওয়াতে হবে। পরাতে হবে।

তিনি আলমারি খোলেন। রাশি রাশি গয়নার মধ্যে থেকে কেবল নিজের পিতৃদত্তটুকুন একটা পুঁটলিতে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। 'বাদশা, গাড়ি বের করো।'

বাদশা বাড়ির ড্রাইভার। বেগম সাহেবার নির্দেশে সে গাড়ি বের করে। পোর্চে রাখে।

আজাদ আর তার মা বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। বাড়ির কাজের লোক, আশ্রিতজন, আত্মীয়স্বজন সব নীরবে তাকিয়ে থাকে তাদের চলে যাওয়ার দিকে। তাদের মাথার ওপর থেকে যেন ছায়া সরে যাচ্ছে।

পরিচারিকা জয়নব কেঁদে ওঠে। সাফিয়া বেগম চাপা গলায় তাঁকে ধমকে দেন, 'পাড়ার লোকদের রাতের বেলায় জাগিয়ে তুলবি নাকি? বাড়িতে কি লোক মারা গেছে? চুপ।'

আজাদ আর তার মা বারান্দা পেরোয়। বারান্দার চারদিকে লাইট। আজাদের পায়ের কাছে নিজের অনেকগুলো ছায়া তাকে ঘিরে ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। ছায়াগুলোর দৈর্ঘ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। টমি, স্প্যানিয়েল কুকুরটা, কী করবে বুঝে উঠছে না। একবার আজাদের কাছে আসছে, একবার ভেতরে ঢুকছে। আজাদ সেদিকে তাকাবে না। তারা গিয়ে গাড়িতে ওঠে। গাড়ি স্টার্ট নেয়। দারোয়ান দৌড়ে এসে সদর দরজা খুলে দেয়। মেম সাহেব বেরিয়ে যাচ্ছেন, সঙ্গে ছোট সাহেব, সে সালাম দেয়। গাড়ি গেট পেরোয়।

আজাদ আর তার মায়ের পেছনে ইস্কাটনের বাড়ির গেট বন্ধ হয়ে যাওয়ার শব্দ রাত্রির নীরবতা ভেদ করে প্রকটিত হয়ে উঠলেও তারা পেছনে তাকায় না।

জীবনে শেষবারের মতো সাফিয়া বেগম তাঁর নিজ নামে রেজিস্ট্রিকৃত ইস্কাটনের রাজপ্রাসাদতুল্য বাড়িটা ছেড়ে চলে যান।

গাড়ি ইস্কাটন থেকে বেরিয়ে অগ্রসর হতে থাকে ফরাশগঞ্জের দিকে। রাতের রাস্তাঘাট দেখতে অন্য রকম লাগে। দোকানপাট বন্ধ। রাস্তাজুড়ে নেড়ি কুকুরের রাজত্ব। সেকেন্ড শো সিনেমা দেখে দর্শকরা ফিরছে। নিয়ন সাইন জ্বলছে এখানে-ওখানে। হঠাৎ হঠাৎ একটা দুটো রিকশা। সেই রিকশার যাত্রী আর চালক দুজনকেই মনে হয় ঘুমন্ত। হয়তো গাড়ির হেড লাইটের আলো চোখে পড়ায় তারা চোখ বন্ধ করে ফেলে বলে এ রকম মনে হয় আজাদের। গাড়ি গিয়ে ফরাশগঞ্জের বাসার সামনে থামে। এ বাসাটায় এখন সাফিয়া বেগমের নিজের ছোট বোন শোভনা আছে ছেলেমেয়ে নিয়ে। আছে জায়েদ, চঞ্চল, মহুয়া, টিসু, কচি প্রমুখ আজাদের খালাতো ভাইবোনেরা। এদের বাবা আবার সম্পর্কে চৌধুরীর ভাই হয়। জিনিসপত্র নিয়ে আজাদ নামে। মায়ের সঙ্গে তেমন কিছু নাই। শুধু একটা ছোট্ট থলে ছাড়া। ড্রাইভার বলে, 'আম্মা, আমি কি থাকব?' মা মাথা নেড়ে 'না' বলেন। আজাদ ডোরবেল টিপলে প্রথমে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। আজাদ ফের বেল টেপে। ভেতর থেকে শোনা যায় আজাদের খালা শোভনার কণ্ঠস্বর : 'কে?' 'আমি আজাদ' উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে যায়। খালার চোখেমুখে শাড়িতে ঘুমের চিহ্ন। তিনি বলেন, 'এত রাতে যে, বুবু?' সাফিয়া বেগম তাঁর প্রশ্নের জবাব দেন না। সিঁড়ি ভেঙে সোজা ওঠেন তিনতলার একলা ঘরটায়। এটা আগে ছিল আজাদের ঘর। তিনি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন।

আজাদ আর তার খালা সাফিয়া বেগমকে অনুসরণ করে তিনতলা পর্যন্ত এসে বারান্দায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। খালা বলেন, 'কী রে? বুবু রাগ?'

'হুঁ।'

'কেন?'

'আব্বা বিয়ে করে নতুন বউ নিয়ে এসেছেন।'

'বলিস কি!' শোভনা বেগম এমনভাবে আর্তনাদ করে ওঠেন যেন তার নিজের স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করে এইমাত্র ঘরে ঢুকল। তারপর তিনি নিজেও নীরব হয়ে যান।

সাফিয়া বেগম পাঁচ দিন তিনতলার ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখেন। একটাবারের জন্যেও দরজা খোলেন না।

তাঁর ছোটবোন শোভনা, বোনের ছেলেমেয়েরা আর আজাদ প্রথম দিন দুপুর থেকে দরজায় ধাক্কা দিতে থাকে। সাফিয়া বেগম স্পষ্ট গলায় বলেন, 'এই, দরজায় ধাক্কা দিবি না। সবাই সবার নিজের কাজে যা।'

তাঁর কণ্ঠস্বরে কী একটা ক্ষমতা ছিল, কেউ আর তাঁকে জ্বালাতন করে না। সবাই নিচে নেমে যায়।

পরের দিন আবার সকালে সবাই চিন্তিত উদ্বিগ্ন মুখে তিনতলার ঘরের সামনে জড়ো হয়। তারা দরজায় ধাক্কা দিতে আরম্ভ করলে তিনি আবার শান্ত কিন্তু গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, 'এই, বলেছি না, দরজায় ধাক্কা দিবি না।'

সবাই আবার নেমে যায়।

তৃতীয় দিন সকালে ফের সবাই ভীষণ চিন্তিত হয়ে সাফিয়া বেগমের বন্ধ দরজার সামনে অবস্থান নেয়। জায়েদের মা শোভনা বেগম আজাদকে শিখিয়ে দিয়েছেন, 'বল, তুমি কিছু খাবে না? না খেয়ে মরে যাবে? তাহলে আমি বাঁচব কাকে নিয়ে? আমাকে দেখবে কে?' আজাদ এত কিছু বলতে পারে না। শুধু বলে, 'মা কিছু খাবা না? না খেয়ে মরবা নাকি?'

মা বলে, 'না খাব না। খিদে পায়নি। খিদে লাগলে নিজেই খাবার চেয়ে নেব।'

চতুর্থ দিনে সবাই ভাবে, সাফিয়া বেগম নিশ্চিত মরতে যাচ্ছেন। শোভনা বলেন, 'বুবু, তুমি কি আত্মহত্যা করবা? তাইলে তো তোমার দোজখেও জায়গা হবে না।'

সাফিয়া বেগম বলেন, 'না, আমি মরব না। একটা আজরাইলের জন্যে আমি মরব না।'

'ঘর থেকে বার না হও, কিছু একটা খাও। জানলা দিয়া ভাত দেই?'

সাফিয়া বলেন, 'তুই বেশি কথা বলিস। চুপ থাক।'

ওই দিন রাতেই চৌধুরী সাহেবের গাড়ি দেখা যায় ফরাশগঞ্জের বাসার সামনে। জায়েদ এসে খবর দেয় আজাদকে, 'দাদা, আপনের আব্বায় আইছে।'

আজাদ তখন তার সঞ্চয় থেকে তার জিনিসটা বের করে। রিভলবার। এটা সে সঙ্গে এনেছিল ভবিষ্যতে কোনো না কোনো কাজে লাগতে পারে, এ আশায়। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে কাজে লেগে যাবে, সে বুঝতে পারে নাই। সে রিভলবারের মধ্যে গুলি ভরে। তারপর রিভলবারটা হাতে নিয়ে তিনতলার সিঁড়ির মুখে দাঁড়ায়।

চৌধুরী নিচের তলার ঘর পর্যন্ত ঢোকেন। তাঁকে গৃহবাসীরা সাবধান করে দেয়, যেন তিনি ওপরে না ওঠেন। তাঁকে আরো বলা হয়, তিনি যদি ওপরে ওঠার চেষ্টা করেন, তাহলে আজাদের হাতের অস্ত্র গর্জে উঠতে পারে। সে তার মাকে পাহারা দিয়ে রেখেছে।

চৌধুরী ফিরে যান।

বন্ধ ঘরের জানালার অন্যপাশ থেকে ঘটনা বিবৃত করা হয় সাফিয়া বেগমকে। সাফিয়া বেগম সব শোনেন। পঞ্চম দিন সকালে তিনি বন্ধ দরজা খুলে দেন।

জায়েদের মা তাঁর জন্যে ভাত আনেন। তরকারি আনেন। তিনি বলেন, 'মাছমাংস কেন এনেছ? এইসব নিয়ে যাও। খালি একটু ডাল-ভাত দাও। আর শোনো, আমাকে একটা শাদা শাড়ি দাও। আমার স্বামী তো আর আমার কাছে জীবিত নাই। আমি কি আর রঙিন শাড়ি পরতে পারি!'

বাড়ির পরিচারিকারা আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্তে আসে যে, বড় আম্মার পোষা জিন আছে। তারাই তাঁকে এ পাঁচ দিন খাবার সরবরাহ করেছে। না হলে পাঁচ-পাঁচটা দিন একটা দানা মুখে না দিয়ে কেউ বাঁচতে পারে!

এর পরের তিনটা বছর তিনি কারো সঙ্গে বলতে গেলে কথাই বলেননি।

৯

চৌধুরী সাহেব এত দূর পর্যন্ত ভাবতে পারেননি। কে-ইবা ভাবতে পেরেছে? আজাদের মা কঠিন মহিলা, কিন্তু তিনি যে হীরার চেয়েও কঠিন, পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন পদার্থের চেয়েও কঠিন, সেটা একটু একটু করে উদ্‌ঘাটিত হতে থাকে। এবং যতই দিন যায়, তখন আগের উপলব্ধিটাও যথেষ্ট ছিল না বলে মনে হয়। চৌধুরী সাহেব ভেবেছিলেন, আজাদের মা তাঁর দ্বিতীয় বিয়েটা মেনে নেবে। কেন নেবে না? তাকে তিনি অর্থে-অন্নে-বস্ত্রে রানীর হালেই রাখতে পারেন। তার বদলে একবস্ত্রে বের হয়ে আজাদের মা কি ভিখিরিনীর মতো করে জীবনযাপন করতে পারবে? আজাদই কি পারবে এই রাজৈশ্বর্য ছেড়ে গিয়ে দীনহীন জীবন বেছে নিতে? নিশ্চয় পারবে না। তাদের ফিরে আসতেই হবে।

দিন যায়। চৌধুরীর মনোবাঞ্ছাপূরণ হয় না। আজাদের মায়ের নমনীয় হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। তিনি তাঁর অর্থসাহায্য গ্রহণ করা তো দূরের কথা, মুখটা পর্যন্ত দেখতে নারাজ।

আজাদ স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দেয়। তার কিছু ভালো লাগে না। বাবার কাছ থেকে যে-মাসোহারা পায়, ওই সময়ে সেই মাসোহারা তার পক্ষে অধঃপাতে যাওয়ার জন্যে যথেষ্ট। মা তার এই মাসোহারার টাকা থেকে কিছুই নেবেন না, একটা পয়সা না, একটা দানা না। সে বন্ধুদের নিয়ে সিনেমা দেখে। গল্পের বই কেনে ইচ্ছামতো। সন্ধ্যার সময় রেস্টুরেন্টে বসে আড্ডা মারে। তার বন্ধুরা খেলাধুলা করে। সৈয়দ আশরাফুল হক, কাজী কামাল, ইব্রাহিম সাবের, রউফুল হাসান আর জুয়েল। তাদের সঙ্গে সেও কখনও কখনও যায় মাঠে। সারা দুপুর ক্রিকেট খেলে। প্রায় প্রতিটা ইংরেজি ছবি দেখে। মাঝে মধ্যে চলে যায় শিকার করতে। সব হয়, শুধু স্কুলে যাওয়ার বেলায় তার দেখা নাই।

প্রথম প্রথম বহুদিন সে যায়নি ইস্কাটনের বাসায়। মাসোহারার টাকা আনার জন্যে ওই বাসায় সে পাঠিয়ে দিত জায়েদকে। তার বইপত্র আর কত সংগ্রহের জিনিসপাতি সবই তো পড়ে আছে ইস্কাটনের বাসায়। কয়েক মাস পর থেকে সেসব আনতে মাঝে মধ্যে আজাদ যায় সেখানে। দেখা হয় নতুন মায়ের সঙ্গে।

ভদ্রমহিলাও এক অদ্ভুত সংকটেই পড়েছেন। ভালোবেসে, মোহগ্রস্ত হয়ে, দিওয়ানা হয়ে-যেভাবেই হোক আত্মসংবরণ করতে না পেরে তিনি ছুটে চলে এসেছেন চৌধুরীর ঘরে। আগুনের টানে পতঙ্গ যে রকম ছুটে আসে, তেমনি করে চলে এসেছেন তাঁর অতীতকে অবলীলায় ত্যাগ করে। এটাও কি একটা ত্যাগস্বীকার নয়? কিন্তু এ বাড়িতে পরিবেশ তেমন অনুকূল নয়। বাড়ির চাকর-বাকরেরা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে ভালো করে কথা বলে না। আত্মীয়স্বজনরা তাঁর দিকে কেমন রোষের দৃষ্টিতে তাকায়। তিনি চান সবার চিত্ত জয় করতে। কিন্তু সে চেষ্টা সুদূরপরাহত বলে মনে হয়।

আজাদ এ বাসায় এলে তিনি চেষ্টা করেন তাকে পটানোর। বলেন, 'কী খাবে? কী লাগবে? কিছু কিনে দেব?'

আজাদ তাঁর কথার জবাব দেয় না। গোঁ ধরে থাকে। বেশি পীড়াপীড়ি করলে বাসা থেকে চলে যায়।

যেমন মা তেমনি ছেলের বাবা!

চৌধুরীর দ্বিতীয় বিয়ের পাঁচ মাসের মাথায় ফরাশগঞ্জের বাড়িতে একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটে। জায়েদের সে-সময়টা এখনও মনে আছে। সে খুবই ছোট তখন। বালক বয়স। শেরে বাংলা ফজলুল হক মারা গেছেন। সমস্ত প্রদেশে শোকের ছায়া। এদিকে ফুটো পয়সা উঠে যাচ্ছে। প্রবর্তিত হচ্ছে নয়া পয়সা। জায়েদ নয়া পয়সার হিসাব শিখছে কাগজ-কলম নিয়ে। কাগজে ফুটো পয়সা আর নয়া পয়সা গোল গোল করে এঁকে এঁকে তাকে শিখতে হচ্ছে ৬ পয়সায় এক আনা, ১২ পয়সায় দুই আনা, ৫০ পয়সায় আট আনা। ১০০ পয়সায় এক টাকা। এই হিসাবের ফেরে পড়ে একদিন সে মুশকিলেও পড়েছিল, তার মনে আছে। আট আনা হলে হয় ৫০ পয়সা। সে এক আনা এক আনা করে আট আনা জোগাড় করেছে। একটা ৫ পয়সা আরেকটা ১ পয়সা মানে এক আনা। এভাবে ৮ বার । তাহলে তো আট আনাই হলো। একটা সিনেমার টিকেটের দাম আট আনা। কিন্তু সিনেমা হলে গিয়ে দেখা গেল পয়সা কম পড়ে গেছে। কারণ একটা ১ পয়সা পকেটের কোন ফাঁক দিয়ে গেছে পড়ে। আর ৬ পয়সা করে আট আনায় হয় ৪৮ পয়সা। ১ পয়সা পড়ে যাওয়ায় তার কাছে আছে ৪৭ পয়সা। হলের কাউন্টার ছিল ফাঁকা। টিকেট বিক্রেতা বুড়োটা বলে, তিন পাইসা কম। টিকেট নেহি মিলেগা। ১ পয়সা কম কী করে তিন পাইসা কম হলো, জায়েদ বুঝতে পারে না।

ঠিক সেই সময় হঠাৎ বাসায় চিল্লাচিল্লি-জায়েদের মা মইরা যাইতেছে।

মা কেন মারা গেল, কীভাবে, জায়েদ সেই রহস্য আজো ভেদ করতে পারে না। তবে তার মৃত্যুটা স্বাভাবিক ছিল না, আজ তার মনে হয়। তার বাবা আর চৌধুরী ছিলেন ভাই আর বন্ধু। আর তার মা আর আজাদের মা ছিলেন বোন আর হরিহর আত্মা। আজাদের মাকে বশীভূত করার জন্যে হয়তো কেউ প্রয়োজন মনে করেছিল তাঁকে একলা করে ফেলার। হয়তো সে জন্যেই জায়েদের মাকে দুনিয়া থেকে চলে যেতে হয়েছে। এ সবই আজ জায়েদের সন্দেহ হয়। তখন সে ছিল অনেক ছোট। বালক মাত্র। কিছু বুঝতে পারেনি। শুধু মনে আছে সে গিয়ে দেখতে পায় মা শুয়ে আছে আর তার শরীরটা সম্পূর্ণ নীল। আর এরপর বহুদিন জায়েদ সবকিছুকে নীল দেখত। তার মনে আছে, আম্মা মানে আজাদ দাদার মা নিজহাতে গোসল করালেন মাকে, কাফনের কাপড় পরালেন। সেই কাফনের কাপড়টাকে পর্যন্ত নীল দেখাচ্ছে। আগরবাতি জ্বলছে। তা থেকে বেরুচ্ছে নীল রঙের ধোঁয়া। ভাইবোনেরা, আত্মীয়স্বজন মহিলারা কাঁদছে। কিন্তু আম্মা কাঁদছেন না। তিনি কাফন পরানো শেষে কোরআন শরিফ নিয়ে বসলেন। তাঁর এককোলে জায়েদের ১ মাস ৭ দিন বয়সের ছোট ভাই লিমন। তারপর এক সময় মাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে খাটিয়া তোলা হয় চারজনের কাঁধে। জায়েদকেও বলা হয়, 'বাবা, তোমার মা যাইতাছে, তুমিও একটু কাঁধ লাগাইবা নি?' সে তো তখন অন্য বাহকদের বুকসমান। সে কী করে কাঁধ দেবে, সে কিছুই বুঝতে পারে না। শুধু দেখতে পায় নীল রঙের খাটিয়ায় নীল কাফনে মোড়ানো তার মা যায়।

আজাদের মায়ের ঘাড়ে এসে পড়ে ছোট্ট লিমন আর জায়েদ, মহুয়া, চঞ্চল, কচি, টিসু-বোনের ছেলেমেয়েরা। আর এদের বড় ভাই আজাদ। জায়েদের বাবাও এই বাড়িতে

আসা আর খোঁজখবর করা ছেড়ে দেন। তিনিও অন্য কোথাও অন্য কোনো মধুকুঞ্জের সন্ধান পেয়ে গেছেন কিনা, জায়েদ ছিল ছোট, সে বুঝতে পারে না। আজাদের মা কথা বলেন না, কিন্তু ছেলেমেয়েদের বুক দিয়ে আগলে রাখেন।
জায়েদের মা মারা যাওয়ার পর আজাদের মা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন, নিরবলম্বও। কিন্তু তিনি ভেঙে পড়েন না। মচকানো তো দূরের কথা।
ইউনুস চৌধুরীর পক্ষ থেকে আবার মীমাংসার প্রস্তাব পাঠানো হয় সাফিয়া বেগমের কাছে। তাঁকে সসম্মানে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, এ গ্যারান্টি দেওয়া হয়। কিন্তু আজাদের মা রাজি হন না। তাঁর জবান, এক জবান। তিনি চৌধুরীকে তো আগেই বলে দিয়েছিলেন চৌধুরী যদি ওই বিয়ে করেন, তবে তাঁর মরা মুখটাও চৌধুরী দেখতে পাবেন না। এই কথার কোনো নড়চড় তাঁর জীবদ্দশায় তো হবেই না, মৃত্যুর পরেও হবে না। সাফিয়া বেগমের এ কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল।
চৌধুরী ক্ষিপ্ত হন। সমস্তটা ঢাকা শহর তাঁর হাতের মুঠোয়। তিনি ইচ্ছা করলে এই ঢাকা শহরটার যাকে ইচ্ছা তাকে কিনে ফেলতে পারেন। প্রদেশের গভর্নর তাঁর বন্ধু, সেক্রেটারিরা তাঁর গেলাস-বান্ধব। হজ হ-তে তাঁর নাম উঠেছে: আ জমিনডার ফ্রম বিক্রমপুর। আর কিনা একটা ছোটখাটো মহিলা তাঁর কথা শুনছে না। এত জেদ! এত জেদ! এখন তো সার্বক্ষণিক পরামর্শদাত্রী কুটনি বোনটাও নাই। তাহলে সে কেন আসে না? চৌধুরীর পানাসক্তি আরো বেড়ে যায়।
আজাদের মা সাধারণত কথা বলেন না। কিন্তু একদিন তিনি আজাদকে বলেন, 'বাবা, কথা আছে, আয়। বস।'
আজাদ মায়ের কাছে যায়। বিছানায় বসে।
'তুই নাকি স্কুল ছেড়ে দিয়েছিস?'
আজাদ উত্তর দেয় না।
'কাল থেকে আবার স্কুল যাবি।'
'এখন আর যাওয়া যাবে না। পরীক্ষা দেই নাই। টিউশন ফি দেই না কয় মাস। নাম কেটে দিয়েছে।'
'তাহলে তুই কী করবি? মূর্খ হয়ে থাকবি?'
আজাদ চুপ করে থাকে।
মা বলেন, 'তুই ছাড়া আমার আছে কে? আমি তো মরেই যেতাম। বেঁচে আছি কেন? তোকে মানুষ করার জন্যে। তুই যদি মানুষ না হবি, তাহলে আমি আর বাঁচি কেন?'
আজাদ কেঁদে ফেলে। আসলেই তার খুবই অনুশোচনা হচ্ছিল কদিন থেকে! কী করছে সে? তার মনে পড়ে সেন্ট গ্রেগরি স্কুলের অন্ধ পিয়ন পিটারকে। স্কুলে আজও ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছে অন্ধ পিটার, হাত দুটো সামনে মেলে ধরে হাতড়ে হাতড়ে পথ হাঁটে যে পিটার, সেও তার কাজ ঠিকভাবে করে চলেছে, ওই তো এখনও ঘণ্টাধ্বনি আসছে স্কুল থেকে, কত কষ্ট করেই না ঘণ্টাটা দড়ি টেনে টেনে রোজ তোলে পিটার, অথচ সে কিনা চোখ থাকতেও পথ খুঁজে পাচ্ছে না। পড়াশোনা বাদ দিয়ে কী করবে সে?
সে বলে, 'আমার ফ্রেন্ডদের সাথেই আমি মেট্রিক পাস করব।'
মা জিজ্ঞেস করেন, 'কেমন করে?'
'প্রাইভেটে এই বছরই ম্যাট্রিক দিব।'
মার মুখে মৃদু একটা হাসি ফুটে ওঠে।

আজাদ মাকে কথা দিয়েছে, বন্ধুদের সঙ্গেই সে এই বছরে মেট্রিক পাস করবে। এ-কথা তো তাকে এখন রাখতেই হবে। আরপি সাহার স্কুল থেকে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে নাম তালিকাভুক্ত করায় সে। তারপর ধুমসে পড়া শুরু করে। বই কেনে। টিউটর রাখে। মা তাঁর সোনার গয়নার সঞ্চয় ভেঙে টিউটরের টাকা যোগাড় করেন। বাবার মাসোহারা থেকেও তো টাকা ভালোই আসে। আজাদের বন্ধুরা অবাক হয়ে যায়। বড়লোকের বখে যাওয়া ছেলে পেয়ে যারা এতদিন তার কাছে ঘুরঘুর করত, তাদের সঙ্গ এখন আর ভালো লাগে না আজাদের। তারাও পরিস্থিতি বুঝে বিকল্পের সন্ধানে কেটে পড়ে। পরীক্ষার সময় নিকটবর্তী হয়। একদিন আজাদ এসে কদমবুসি করে মাকে। 'মা, দোয়া করো। টাঙ্গাইল যাচ্ছি। পরীক্ষা শেষ করে তারপর আসব।'
মা ছেলের মাথায় হাত রাখেন। তাঁর ছেলে ম্যাট্রিক দিচ্ছে। এই দুঃখের দিনে এটা কত বড় আনন্দের সংবাদ। তিনি ছেলেকে কাঁধে ধরে দাঁড় করিয়ে দেন। ছেলের মাথায় হাত রাখেন। বলেন, 'আমার দোয়া তো আছেই। ইনশালাহ তুই ভালোভাবে পাস করবি।'
ছেলের মুখের দিকে একবার অলক্ষ্যে তাকান মা। ছেলের নাকের নিচে গোঁফের রেখা। কণ্ঠস্বর ভাঙা ভাঙা। মুখে একটা দুটো ব্রণ। চুলে আবার একটুখানি টেড়ির লক্ষণ। ছেলে তাঁর বড় হয়ে যাচ্ছে। হোক! তাই-তো তিনি চান। এই ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে এই পৃথিবীর বুকে দাঁড় করাতে পারলেই তাঁর সব কষ্টের অবসান হবে। তিনি আলাহতায়ালার কাছে আর কিছু চান না।
'কী মা, কী ভাবো?'
ছেলের প্রশ্নে সংবিৎ ফিরে পান মা। 'আলাহ' বলে একটা গোপন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেন। বলেন, 'তোর কিছু লাগলে আমাকে বল।'
'আমার আবার কী লাগবে? যা লাগে সবই তো কিনেছি। প্রাকটিক্যাল খাতা কিনলাম, টেস্ট পেপার কিনলাম। বাদ তো রাখি নাকিছু।'

'তুই ভালো করে পাস কর। তোকে কমপ্লিট স্যুট বানিয়ে দেব।'
'আরে, আমি কমপ্লিট দিয়া কী করব?' আজাদ হাসে। মনে মনে খুশি হয়। মায়ের মনোভাবটা সেও বোঝে, তারা এখন বাবার সাহায্য ছাড়া বেশ অর্থকষ্টের মধ্যে আছে, এটা তিনি বাইরের কাউকে বুঝতে দিতে চান না। বাইরের লোকদের কাছে তারা মাথাটা উঁচু করেই রাখতে চায়।
আজাদ পাস করে সেকেন্ড ডিভিশনে। রেজাল্টের দিন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। রেজাল্ট দেখার জন্যে তারা যায় বোর্ড অফিসে। দেয়ালে রেজাল্ট শিট টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। লোকজন ছাতা মাথায় তাই দেখছে। তার সঙ্গে ফারুক নামের আরেকজন বন্ধু টাঙ্গাইল গিয়েছিল পরীক্ষা দিতে। দুজনে দুরুদুরু বক্ষে গিয়ে একদৌড়ে দেয়ালের পাশে সারি সারি কালো ছাতাগুলোর নিচে ঢুকে পড়ে। আজাদের খুবই ভয় লাগছিল। নিজের জন্যে নয়। মায়ের জন্যে। যদি সে ফেইল করে, মা বড় আঘাত পাবেন। এটা কেবল তার ম্যাট্রিক পাস করা বা ফেইল করার ব্যাপার নয়, মায়ের ব্যক্তিগত জেদের লড়াইয়ের প্রশ্ন। সে ফেইল করলে তার বাবা কী হাসিটাই না হাসবে! মায়ের বুকে সেই বিদ্রূপটা কী ভয়ঙ্কর শেল হয়েই না বিদ্ধ হবে! কোথায় রোল তার? থার্ড ডিভিশনের ঘর দেখে। পাওয়া যায় না। আজাদ খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ে! তার শ্বাস ঘন হয়ে ওঠে। সে বারবার জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে থাকে। এটা কি হতে পারে, সে ফেইল করবে? জিওগ্রাফি এক্সামটা তত ভালো হয়নি, তাই বলে ফেইল। শেষে মরিয়া হয়ে সে তাকায় সেকেন্ড ডিভিশনের ঘরে। বিড়বিড় করে পড়ছে ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন, কোনো কিছু হারিয়ে গেলে খুঁজে পাওয়ার দোয়া, ওই তো রোল নম্বর আরপি ৩৬৩৪। সেকেন্ড ডিভিশনের ঘরে। ওহ্! মা! সে ছুটতে থাকে। তার সঙ্গের বন্ধুটির রেজাল্ট কী তা না জেনেই। তাকে সঙ্গে না নিয়েই। বৃষ্টির মধ্যে ভিজতে ভিজতে।
তার বন্ধুটি, ফারুক, এই কথা আর কোনো দিন ভুলতে পারবে না।
'মা, মা, মা কোথায়, কয় তলায়, মা, কচি মা কোথায়, মহুয়া মা কোথায়, মা।' আজাদ দৌড়ে যায়, মায়ের ঘরে মা নাই। 'কোথায় গেছে, ওজু করতে, কই?' 'এই যে মা, আমার রেজাল্ট হয়েছে, আমি পাস করেছি, সেকেন্ড ডিভিশন', আজাদ মাকে কদমবুসি করতে যায়, মা তাকে টেনে তোলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ', তিনি খানিকক্ষণ চুপ করে থাকেন, না, তাঁর চোখে হাসি ঝিলিক দেয় না, না তাঁর চোখে অশ্রু ঝরে না, তিনি নিজেকে সামলে নেন। তিনি শান্তস্বরে বলেন, 'তুই তো পাস করবি, তোর ব্রেন ভালো না!'
আজাদ বোকার মতো হাসে। মা যে কী বলে! আরেকটু হলে তো গিয়েছিলই।
'শোন, তুই এক কাজ কর, ১০ সের মিষ্টি কিনে আন। মরণচাঁদ থেকে কিনিস, আজেবাজে মিষ্টি কিনবি না।' তিনি তাঁর ড্রয়ারের কাছে যান। টাকা বের করেন। 'মিষ্টি কিনে নিয়ে ইস্কাটন যাবি, তোর দাদির হাতে দিবি, দাদিকে সালাম করবি, দাদার হাতে দিবি, দাদাকে সালাম করবি। বুঝিয়ে বলবি, কিসের মিষ্টি।'
আজাদ অবাক হয়। সে ভাবতেও পারেনি, মা তাকে ইস্কাটন যেতে বলতে পারেন।
আজাদ মিষ্টির দোকানে যায়। সঙ্গে জায়েদ। মিষ্টির দোকানে বসেই জায়েদ কয়েক পদের মিষ্টি সাবাড় করে। কয়েক সের মিষ্টি কেনে তারা। মিষ্টির ঠোঙা নিয়ে তারা প্রথমে আসে ফরাশগঞ্জের বাসায়। মাকে প্রথমে মিষ্টিমুখ করানো দরকার। মা তো কোনো কিছু খেতেই চান না। আমিষ খাওয়া ছেড়েছেন সেই যে ইস্কাটন ছাড়ার পর থেকে, আর ধরেননি। 'মা, একটু খাও। এই বাসার জন্যে একটু মিষ্টি কিনলাম। বুঝলা না, ওই বাসার আগে তো এই বাসার লোকদের মিষ্টিমুখ করানো দরকার।'
মা মিষ্টি দেখে মুখ সরিয়ে নেন। 'না রে, খেতে ইচ্ছা করে না।'
'অল্প খাও। অল্প।' আজাদ নাছোড়।
মা একটুখানি মিষ্টি মুখে দেন। বলেন, 'এই দুটো ঠোঙা রেখে দে। পাড়াপড়শিদের দিতে হবে। ভালো খবর। সবাই জানুক। আর এখানে কত?'
'১০ সের'–হাতের মিষ্টির রস চাটতে চাটতে জায়েদ জবাব দেয়।
'এগুলো নিয়ে ইস্কাটনে যা। আজকে সবার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলবি। আজকে আমাদের হাসার দিন'–মা বলেন।
১০ সের মিষ্টি নিয়ে আজাদ ইস্কাটনের বাসার সামনে নামে। কত দিন পর এ বাড়িতে আসা হলো তার। এটা যে তাদের বাড়ি, অনভ্যাসে সেটা মনেও হয়নি এ কদিন। আশ্চর্য। না, সে হরিণগুলোর দিকে তাকাবে না, রাজহাঁসগুলোর দিকে না, তার স্প্যানিয়েল ডগ টমির দিকে না।
সে সোজা দাদা-দাদির ঘরে যায়। দাদির সামনে মিষ্টির প্যাকেটগুলো রাখে। দাদিকে সালাম করে। 'আমি ম্যাট্রিক পাস করেছি। তার মিষ্টি রেখে গেলাম।'
'এতগুলা মিষ্টি আনা লাগে। খালি টাকা খরচ'–দাদি বলেন।
'আর নাই তো। রেজাল্ট হয়েছে তো, সবাই মিষ্টির দোকানে ভিড় করছে। যা পেয়েছি এনে দিলাম। কম হলে বলো। কালকে আরো এনে দেব।'
'দুরো আভাগা। আমি কী কই, হে কী বুঝে।'
বাসার বাবুর্চি, কাজের লোক, পরিচারিকারা সবাই আড়ালে দাঁড়িয়ে বোঝার চেষ্টা করে ঘটনাটা। আজকে কেন ভাইয়া এতদিন পরে এ বাড়িতে এল। তাহলে কি বেগম সাহেবা ফিরে আসবেন আবার?
তারা উঁকিঝুঁকি দিয়ে ঘটনার তাৎপর্য বুঝে ফেলে। ছোট সাহেবে মেট্রিক পাস দিছে।

ছোটমায়ের কাছে খবর যায়। ছোট সাহেবে আসছে। মিষ্টি আনছে মেলা। উনি ম্যাট্রিক পাস দিছে।
বেরিয়ে যাওয়ার পথে ছোটমায়ের সাঙ্গে দেখা হয় আজাদের। তিনি হাসিমুখে বলেন, 'বাবা, তুমি পাস করেছ, আমি খুব খুশি হয়েছি। বসো। একটু মিষ্টি খেয়ে যাও।'
আজাদ তাঁকে আগে থেকেই চেনে। বড়মা বলে তাঁর কাছ থেকে আগে আদরও নিয়েছে। আজকে তার কেমন যেন লাগে। কিন্তু তার মনে হয়, মা যে আজকে এ বাড়িতে মিষ্টি দিয়ে পাঠিয়েছেন, এ তো তার বিজয় উদযাপন করবার জন্যেই। অসুবিধা কী ছোটমার কথা শুনতে!
আজাদ বসে। ছোটমা বলেন, 'তুমি কোনদিকে যাবা এখন?'
'এই তো গুলিস্তানের দিকে।'
'আমিও ওই দিকে যাচ্ছি। তুমি আমার সাথে চলো।'
'না, আমি একলাই যেতে পারব।'
'আরে না, চলো তো।'
ছোটমা গাড়ি বের করেন। নিজেই তিনি ড্রাইভ করছেন। আজাদকে পাশে বসান। মহিলার পাশে বসে তার নিজেকে সিনেমায় দেখা কোনো চরিত্র বলে মনে হয়। ঢাকার রাস্তায় মহিলারা সাধারণত গাড়ি চালায় না। ইনি চালাচ্ছেন। দুপাশের লোকেরা বেশ কৌতূহল নিয়েই তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। ছোটমা গুলিস্তানের আগে বিজয়নগরের ভোগ দোকানের সামনে গাড়ি থামান। বলেন, 'আসো। তুমি না লংপে-পছন্দ করো। তোমাকে লংপে কিনে দেই।'
'না, লাগবে না।'
'আরে আসো তো।'
আজাদ ভাবে, ছোটমাকে জব্দ করব। যত এলভিস প্রিসলি আছে, সব কিনব। দেখি কী করে।
দোকানে ঢুকে একটার পর একটা এলভিস প্রিসলি নামাতে থাকে আজাদ। দু হাত ভরে যায়। দোকানদাররা বিস্মিত। ছোট মা অবিচলিত। 'কত দাম এসেছে?'
দোকানি দাম হিসাব কষতে গিয়ে গলদঘর্ম। দেড় হাজার রুপিয়া বেগম সাব।
ছোটমা ব্যাগ থেকে চেক বের করে খসখস করে সিগনেচার করে দেন।
আজাদ মনে মনে খুশি হয়। এই রেকর্ডগুলো তার খুব প্রিয়। এগুলো সে অনেকবার জোগাড় করতে চেয়েছে। শুধু জায়েদকে দিয়ে ও বাসা থেকে তার নিজের রেকর্ড প্লেয়ারটা আনিয়ে নিতে হবে। তবে মাকে এ ব্যাপারে কিছু বলা যাবে না। ব্যাপারটা স্ট্রেইট চেপে যেতে হবে।

১০

ইউনুস চৌধুরী আজকে বাসাতেই বসেছেন সন্ধ্যাটা যাপন করতে। বসন্তের হাওয়া বইতে শুরু করেছে বাইরে। তিনি বাগানে বসেছেন গার্ডেন-চেয়ার নিয়ে। দখিনা বাতাস মসলার বাগান থেকে সুগন্ধ বয়ে আনছে। বেয়ারা তৎপর। বরফ আসছে। পানীয় ঢালা হচ্ছে। চৌধুরীকে আজ সঙ্গ দিচ্ছেন তাঁর বন্ধু খালাতো ভাই রতন চৌধুরী। আকাশের গায়ে একটা প্রায় পূর্ণ চাঁদ। চাঁদের পাশে ছুটন্ত মেঘগুলো দেখে মনে হচ্ছে, চাঁদটাই ছুটছে। আর মেঘগুলো যেন স্থির। ইউনুস চৌধুরী সেদিকে তাকিয়ে আছেন। ছাত্রাবস্থায় পড়া থিয়োরি অব রিলেটিভিটির কথা হঠাৎ মনে পড়ে যায়। চাঁদটা স্থির, নাকি মেঘগুলো? কে জানে রে বাবা? রাত দশটার পরে তাঁর নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তিনি নিজের চুল ধরে নিজেই টানতে থাকেন।
'রতন।'
'ভাইজান।'
'সাফিয়া কি আমার বাধ্য হবে না?'
'ভাইজান।'
'আমার ছেলেকে কি আমি আর ফিরে পাব না?'
'আপনার তো আরেকটা ছেলে হয়েছে ভাইজান। ছোট ভাবি তো মা হয়েছেন!'
'কিন্তু আমার আজাদকে কি আমি পাব না?'
'আজাদ তো আপনার আছেই ভাইজান। ও তো ম্যাট্রিক পাস করেই এসেছিল। বাপকে কি কোনো ছেলে ভুলতে পারে? রক্তের টান বংশের ধারা কোথায় যাবে?'
'কিন্তু সারেংয়ের মেয়েটা কি আমার কথা শুনবে না?'
'শুনবে। শুনবে।'
'কবে?'
'কোনো বাঘই তো প্রথমে বশ মানে না। সার্কাসের বাঘের কথা বলছি। বাঘকে ধরে ইলেকট্রিক পাওয়ারঅলা চাবুক দিয়ে ভয় দেখানো হয়। আঘাত খেয়ে খেয়ে তারপর বাঘ বশ মানে।'
'বাট হোয়েন উইল শি গিভ ইন?'
'টুডে অর টুমরো।'
'তোমার টুডে কবে আসবে?'
'টুমরো।'
'তোমার টুমরো কবে আসবে। দি ডে আফটার টুমরো?'
'ভাইজান। এক কাজ করেন। ফরাশগঞ্জের বাসা থেকে ওদের উৎখাত করে দেন।'

'বলো কি! আজাদ আমার ছেলে না?'
'আজাদকে বলেন এ বাসায় এসে থাকতে।'
'সাফিয়াও তো আমার ওয়াইফ।'
'তাকেও তো আমরা এ বাসায় এসে থাকতে বলছি।'
'তুমি বলছ বাসা থেকে তাড়িয়ে দিলে তারা নরম হবে?'
'অবশ্যই। তেজ কমে যাবে।'
'কীভাবে তাড়াব? আজাদ তো রিভলবার নিয়ে আমাকে মারতে আসবে। ছেলেটা একদম মা-নেওটা হয়েছে। আনলাইক মি।'
'আপনার বাবা-মাও তো আপনার সাথেই আছে। আপনি তাদের যথেষ্ট ভক্তি করেন।'
'করি। জন্মদাতা বাপ, জন্মদাত্রী মা। না করে পারব? কিন্তু সে তো বাপ মানে না।'
'মানে। তবে মাকে বেশি মানে।'
'শোনো। আই অ্যাম এ জমিনডার ফ্রম বিক্রমপুর। আমার টাকা আছে। আমার পাওয়ার আছে। আমার মেয়েমানুষ থাকবে। থাকবে না?'
'জি!'
'জমিদারদের মেয়েমানুষ থাকত কি না!'
'হক সাহেব তো জমিদারি রাখল না। কৃষক প্রজা পার্টি করল।'
'এখন হক সাহেব কোথায়? হয়্যার ইজ হি নাউ!'
'ভাইজান, আর খাবেন না। ওঠেন।'
'আরে নাইট ইজ স্টিল ইয়াং। বসো বসো।'
'ভাবি রাগ করবেন।'
'কেন করবে। সে জেনেশুনে আমার কাছে এসেছে। শোনো। আজাদকে বলে দাও সে জমিদারের ছেলে। তারও চালচলন হবে জমিদারের মতো।'
'সে তো জমিদারের ছেলে না। সে ইঞ্জিনিয়ারের ছেলে।'
'কিসের ইঞ্জিনিয়ার? আই অ্যাম নো মোর ইঞ্জিনিয়ার।'
'দেন ইউ আর আ বিজনেসম্যান। সদাগর। আপনার ফিউডাল নেচার তার রক্তে যাবে কেন?'
'বুর্জোয়ারাও ধোয়া তুলসিপাতা নয়। ক্যাপিটালিজম মানে হচ্ছে পাপ। তুমি পাপী। আমি পাপী।'
'আপনি পাপী। আমি না।'
'কী! চোপ শালা! আয়ুব খানের পাকিস্তানে কোনো পাপ নাই। নো ওয়াইন। নো ক্রাইম। চোপ শালা।'
'এই, শালা বলবি না শালা!'
গার্ডেন চেয়ার উল্টে পড়ে। গেলাস কাত হয়ে গড়িয়ে পড়ে মাটিতে। দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে চোপ শালা চোপ শালা বলে চলেন। বেয়ারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।
বাতাসের বেগ কমে আসছে। মেঘগুলো এখন স্থির। চাঁদটাকে এখন লাগছে ডিমপোচের কুসুমের মতো। মেঘগুলো যেন ডিমের শাদা অংশ। মসলার গন্ধের বদলে এখন নাকে এসে লাগছে নানা মৌসুমি ফুলের সুঘ্রাণ। পানীয়র গন্ধের সঙ্গে মিশে ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত হয়ে উঠছে। দুজন মধ্যবয়স্ক লোক গালাগালি ছেড়ে এখন গলাগলি করে দাঁড়িয়ে আছে।

১১

আজাদ আইএ পড়ার জন্যে ভর্তি হয় সিদ্ধেশ্বরী কলেজে। কলেজে পড়ে, নাজ কিংবা গুলিস্তান হলে ছবি দেখে, বন্ধুদের সাঙ্গে আড্ডা দেয়। সে খুবই ভক্ত এলভিস প্রিসলির। ছোটবেলা থেকেই খুব কমিকস পড়ে। বড় হতে হতে সাহিত্যের প্রতি তার আগ্রহ জন্মে। প্রচুর উপন্যাস পড়েছে, বাংলা উপন্যাস, ইংরেজি উপন্যাস। এর মধ্যে মিলস অ্যান্ড বুন থেকে শুরু করে পেঙ্গুইন ক্লাসিক্স। লরেন্স থেকে টলস্টয়-ডস্টয়ভস্কি পর্যন্ত। বঙ্কিম থেকে শরৎচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ।
সিনেমা দেখতে গেলে তার সঙ্গী হয় জায়েদ। অন্য বন্ধুরাও হয় কখনও কখনও। তবে তার আশ্চর্য লাগে বড়লোক বন্ধুদের। আজাদরা ফরাশগঞ্জের বাড়িতে চলে আসার পর তার অনেক বড়লোকের ছেলে বন্ধু তাকে এড়িয়ে চলে। যেন তার সঙ্গে মিশলে তাদের জাত চলে যাবে। আশ্চর্য তো।
জায়েদের মা নাই। তারা পাঁচ-পাঁচটা বাচ্চা এ বাড়িতেই থাকে। সাফিয়া বেগমকেই সব দেখাশোনা করতে হয়। তাদের খাওয়া-দাওয়া, পড়াশোনার খরচের ব্যাপার আছে। সাফিয়া বেগমকে একটু একটু করে গয়না ভাঙিয়ে টাকা-পয়সা জোগাড় করতে হয়।
এর মধ্যে আজাদ বাবার কাছ থেকে তার মাসোহারা পায়। মাসে মাসে টাকাটা ওঠাতে যায় জায়েদ। জায়েদও স্কুলে যায়। লেখাপড়া করে। তবে পড়াশোনার দিকে তার তেমন মনোযোগ নাই।
একদিনের ঘটনা। বাসায় চাল নাই। হঠাৎ রাতে চাল শেষ হয়ে গেছে। রাতের বেলা আজাদের আরেক খালা এসেছে, আরো অতিথি এসেছে। অতিরিক্ত রাঁধা হয়ে গেছে।

সকালবেলা চাল কিনতে হবে। রেশনের দোকানে যেতে হবে। আজাদের মায়ের কাছে নগদ টাকা নাই। রেশনটা না তুললে আবার দোকান থেকে বেশি দাম দিয়ে কিনতে হবে। নাহলে দুপুরে আজকে হাঁড়ি উঠবে না চুলায়।

আজাদের মা বলেন, 'জায়েদ, কী করি, বল তো!'

জায়েদ বলে, 'আমার কাছে কিছু টাকা জমানো আছে। আমি রেশন নিয়া আসি। আপনি পরে দিয়েন আম্মা।'

'তাহলে তাই কর।'

জায়েদের কিন্তু ভরসা আজাদ। আজাদের কাছে হাতখরচের টাকা থাকে। সেখান থেকে ধার নিতে হবে। তবে সেটা আম্মাকে জানানো যাবে না। চৌধুরীর টাকা শুনলে আম্মা সেই টাকায় কেনা অন্ন স্পর্শ করবেন না।

জায়েদ গিয়ে ধরে আজাদকে। 'দাদা, কিছু টাকা ধার দ্যাও তো।'

'কত?'

'দ্যাও না।'

'কী করবি? সিনেমা দেখবি?'

'না। বাজার সদাই করব।'

'আচ্ছা চল। এক জায়গায় টাকা পাই। তুলে আনি।'

আজাদ আর জায়েদ বের হয়। আলী নামে এক লোকের কাছে আজাদের মাসোহারার টাকা থাকে। সেখান থেকে কিস্তিতে কিস্তিতে টাকাটা তোলা হয়। তবে এ মাসের শেষ কিস্তির টাকাটা আলী ঠিকমতো দেয়নি। জায়েদকে অযথা ঘোরাচ্ছে।

আলী বসেছিল গদিতে। আজাদকে দেখে তটস্থ হয়-'এই, চেয়ার দে। আরে মুছে দে। ভাইয়া বসেন। কী খাবেন? চা আনাই। লেমনেড খাবেন?'

'টাকাটা দাও। যাইগা'-আজাদ দাঁড়িয়ে থেকে গম্ভীর গলায় বলে।

১০০ টাকা পাওয়া যায়। তাই নিয়ে আজাদ আর জায়েদ বের হয়। সদরঘাট থেকে বাংলাবাজার। বটগাছটার নিচে একটা বড় বইয়ের দোকান। হিউবার্ট নামে এক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান এটা চালান। আজাদকে দেখেই তিনি গুড মর্নিং বলে ওঠেন। আজাদও গুড মর্নিং বলে সম্ভাষণের জবাব দেয়।

'নয়া বই আসিয়াছে স্যার'-হিউবার্ট বলেন।

আজাদ বই দেখায় মগ্ন। কী সব ইংরেজি বই। জায়েদ বইগুলোতে কোনো মজা পায় না। সে খানিকক্ষণ হিউবার্টের দিকে তাকিয়ে থাকে। লোকটার গায়ের রঙ ফরসা, তবে চামড়ায় বুটি বুটি দাগ, ভুরুগুলো বড় বড় আর শাদা, চুলও শাদা, গায়ে কোট, পরনে প্যান্ট। লোকটা কথা বলছে হয় ইংরেজিতে, নয়তো বইয়ের বাংলায়। আর বটগাছ থেকে পাখির বর্জ্য পড়ছে টুপটাপ। জায়েদ লক্ষ্য করে, বটের ফল খেয়ে পাখিগুলো যা ত্যাগ করে, তাও আসলে ফল, তাই মাথায় পড়লেও কেউ ব্যাপারটা গায়ে মাখছে না, গায়ে লাগছেও না। জায়েদ এদিক-ওদিক তাকিয়ে ধৈর্য হারিয়ে ফেলে, দাদা, যাইবা না, চলো।

আজাদ বই থেকে মুখ না তুলে বলে, 'যা, তুই ওই হোটেলে মাটন কাটলেট ভাজছে, খেয়ে আয় যা। নে, টাকা নে।'

জায়েদ তো খুশিতে লাফাতে লাফাতে বাতাসের আগে আগে ছুটে যায়।

এদিকে আজাদ বইয়ের মধ্যে মজা পেয়ে গেছে। সে একটার পরে একটা বই নামাচ্ছে। একটা মোটা ছবিঅলা বই পেয়ে সে পাগলের মতো খুশি হয়। দেখেন তো এই কয়টার দাম কত হয়?

দাম একশ টাকা ছাড়িয়ে যায়।

'আচ্ছা তাহলে এটা বাদ দ্যান। এখন দেখেন'-আজাদ একটা বই বাদ দিয়ে বাকিগুলো এগিয়ে দেয়।

'ওয়ান হান্ড্রেড ফোর'-হিউবার্ট বলেন।

আজাদ পকেট হাতড়ে খুচরো বের করে দাম মিটিয়ে দেয়।

জায়েদ আসে।

আজাদ তার হাতে বইয়ের বোঝা ধরিয়ে দিয়ে বলে, 'নে। যাইগা। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

তারা বাসায় ফেরে রিকশায়। জায়েদ বইগুলো দাদার ঘরে নামিয়ে দেয়। তারপর বলে, 'টাকা দ্যাও।'

'কিসের টাকা?'

'রেশন আনুম না?'

'ও। রেশনের টাকা। কত লাগে?'

'৫০ টাকা দ্যাও।'

'অত টাকা তো এখন নাই।'

'আরি এখনই না পাইলা!'

'হাতে করে কী আনলি!'

'বই।'

'বই কিনতে টাকা লাগে না?'

'এত টাকার বই তুমি আনলা!'

'তুই-ই তো বেটা বয়ে আনলি। দেখলি না কত ভারী।'

'অহন। আইজকা রেশন না আনলে তো ল্যাপ্‌স হইয়া যাইব।'

'আরে কিসের ল্যাপস হইব। কালকে আনিস।'
'আজকা খাইবা কী! চাউল নাই।'
'দোকান থেকে দুই সের চাউল কিনে আন। টেবিল ক্লথটার নিচে দ্যাখ খুচরা পয়সা আছে। ঝাড় ঝাড়। দেখলি। নে। আজকার দিনটা পার কর। কালকের চিন্তা কাল।'
খুচরা পয়সা একসঙ্গে করে কম টাকা হয় না। জায়েদ বলে, 'চলব। কিন্তু তোমার মতন পাগল দেখি নাই। চাউল কেনার টাকা জোগাড় কইরা কেউ বই কিনে?'
আজাদ হাসে। 'আর তুই কী করেছিস। চাউল কেনার টাকা দিয়ে কাটলেট খেয়েছিস। ছি।'
জায়েদ লজ্জা পায়। সে দোকানের দিকে দৌড় ধরে। আজাদ হাসে। কিন্তু তার বুকের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম বেদনাও যেন সুচের মতো ফুটছে। আজকে মাকে চাউল কেনার টাকার কথাও ভাবতে হচ্ছে। অথচ মায়ের নামে এই ফরাশগঞ্জের বাড়িটা, ওই ইস্কাটনের বাড়িটা। পৃথিবীটা কি একটা নাগরদোলা? মানুষ আজ ওপরে তো কাল নিচে! নিয়তির হাতের পুতুল মাত্র! তাদের ম্যাট্রিকের বাংলা ব্যাকরণে একটা সমাস পড়তে হয়েছে। রাজভিখিরি। যিনি রাজা তিনিই ভিখিরি। বা রাজা হইয়াও যিনি ভিখিরি। তার মা কি তাই? যিনিই রানী তিনিই ভিখিরিনী!
এইসব হতাশা থেকেই বোধকরি আজাদ সিগারেটটা মজবুত-মতো ধরে ফেলে। তবে সে খায় সবচেয়ে দামি সিগারেট, বিদেশী ব্রান্ডের সিগারেট। চৌধুরী সাহেবের রক্তের ধারা আর যাবে কোথায়? আজাদ সিগারেট কেনার জন্যে স্টেডিয়ামে মোহামেডান ক্লাবেরউল্টো দিকে রহমত মিয়ার বিখ্যাত দোকানে যায়, বিদেশী সিগারেট কেবল ওই দোকানেই পাওয়া যায় ঢাকায়। আড়াই টাকা দামের এক প্যাকেট সিগারেট কেনার জন্যে আড়াই টাকার ট্যাক্সি ভাড়া দিতে তার কার্পণ্য নাই।
সিদ্ধেশ্বরী কলেজ থেকে আজাদ আইএ পরীক্ষা দেয়। সেকেন্ড ডিভিশনে পাসও করে। এবার সে পড়বে কোথায়?
ঢাকার পরিস্থিতি বেশি সুবিধার নয়। ছাত্ররা নানা রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে জড়িত। তারা এখন তৎপর সর্বজনীন ভোটাধিকারের দাবিতে আন্দোলন নিয়ে। সারা দেশে হরতাল পালিত হচ্ছে। শোভাযাত্রা-সমাবেশ এসব তো আছেই। তার ওপর বছরের শুরুতেই ঢাকায় সংঘটিত হয়ে গেছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এখন আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে ছাত্ররা আবার সংগঠিত হচ্ছে। তাদের স্মৃতি থেকে দু বছর আগে ১৭ সেপ্টেম্বরে শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে হরতাল, মিছিলেগু লি, টিয়ারগ্যাস, লাঠিচার্জ, একজনের শাহাদত বরণ-এসব মুছে যায়নি।

আজাদ একদিন আড্ডা দিতে গিয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। কাদের যেন কর্মসূচি ছিল সেদিন, ওরা জানত না। মিছিল হচ্ছে, হঠাৎই শুরু হয় দৌড়াদৌড়ি। ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। পালাতে গিয়ে একটা ড্রেনের মধ্যে পড়ে পা মচকে যায় আজাদের। সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ফিরে আসে বাসায়।
জায়েদ এসে বলে, 'দাদা, পা টিপা দিমু।'
'আরে না। মাথা খারাপ। তুলা দিয়ে নাড়লেও মরে যাব। উফ্, কী ব্যথা রে!'
'দাদা, এক কাম করি, কাইলকা যাই ইস্কাটনে, চৌধুরী সাবরে কই দাদার পাও ভাইঙা গেছে, ট্রিটমেন্ট করান লাগব, মালপানি ছাড়েন।'
'ভালো বুদ্ধি বের করেছিস তো। হ্যাঁ। কালকে যাবি।'
জায়েদ পরের দিন গিয়ে হাজির ইস্কাটনের বাসায়। দারোয়ান পথ আটকে দাঁড়ায়-'কই যাইবেন?'
'চৌধুরী সাবের লগে দেখা করুম'-জায়েদ বলে।
'ক্যান?'
'ছোট সাবে পাঠাইছে। হের পা ভাইঙা গেছে। হেই খবর দিতে হইব।'
দারোয়ান গেইট ছাড়ে। ভেতরে গিয়ে সে দাঁড়ায় চৌধুরী সাহেবের কাছে।
'সালামালেকুম খালু।'
'ওয়ালাইকুম। ক্যান আইছ?'
'আজাদ দাদা পাঠাইছে। হের পাও ভাঙছে।'
'পা ভেঙেছে। কী করে ভাঙল?'
'ইউনিভার্সিটিতে গেছল। গণ্ডগোল লাগছে। হে বেকায়দায় পইড়া পাও ভাইঙা ফেলাইছে।'
চৌধুরী সাহেবের ফরসা মুখটা সঙ্গে সঙ্গে লাল হয়ে যায়। কিছুক্ষণ ভেবে তিনি বলেন, 'আজাদরে বলো এই বাসায় এসে থাকতে!'
'কমুনে। আইব না। আপনেরে টাকা দিবার কইছে।'
চৌধুরী সাহেব ভেতরে যান। জায়েদ বৈঠকখানায় দাঁড়িয়েই থাকে। টমি এসে তার গা শোঁকে। পরিচিত গন্ধ পেয়ে লেজ নাড়ে। একটু পরে কদম আলী এসে হাত বাড়িয়ে দেয়। তার হাতে টাকা।
জায়েদ জিজ্ঞেস করে, 'কত?'
'এক হাজার। গইনা লও।'
জায়েদ টাকাটা গোনে। তারপর খুশি মনে বেরিয়ে যায়। আজাদ দাদার কাছ থেকে আজ মোটা অঙ্কের ভেট আদায় করা যাবে। অন্তত চার দিন সিনেমা দেখা যাবে ডিসিতে।

রাত্রিবেলা ঢাকা ক্লাবে আবার ইউনুস চৌধুরীর প্রথম পত্নীর জন্যে শোক উথলে ওঠে। তিনি গেলাসের পরে গেলাস উজাড় করতে করতে সামনে বসা এআই খানকে জিজ্ঞেস করেন, 'আচ্ছা বলেন তো, সাফিয়া বেগম কবে আমার পায়ের কাছে এসে পড়বে?'

এআই খানের অবস্থাও তখন খারাপ। তিনি বলেন, 'পায়ের কাছে কেন পড়বে? হোয়াই অ্যাট দি ফিট। নো। ইউ হ্যাভ গট হার হেভেন আন্ডার ইয়োর ফিট। ইউ শুড নট অ্যালাউ হার এনটারিং ইন টু দি হেভেন সো ইজিলি।'

'সে তো কিছুতেই আমার কাছে আসছে না। একটা মহিলার কেন এত তেজ? কেন? আমি কী দেইনি তাকে? বাড়ি তার। ছেলে তার!'

এআই খান বুদ্ধি দেন, 'শোনেন, তার ছেলেকে তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেন। সেন্ড হিম টু করাচি। মেক হার আইসোলেটেড। দেন শি উইল গিভ ইন। শি মাস্ট।'

এরই মধ্যে আজাদের মায়ের কোল থেকে দু বছর বয়সী জায়েদের ছোট্ট ভাই লিমনকে এক রকম প্রায় কেড়েই নিয়ে গেছেন জায়েদের বাবা। বাচ্চাটাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন গ্রামের বাড়িতে। সেই বাচ্চা মারা গেছে। সেই শোকে জায়েদ ও তার ভাইবোন আর আজাদের মা খুবই ভেঙে পড়েছে। একটা বাচ্চা যখন বাড়িতে থাকে, সে পুরোটা বাড়ি জুড়ে থাকে। এই বাড়িতেও লিমন ছিল সবার কোলজুড়ে। সে চলে যাওয়ার পরই সবার মন ছিল খারাপ। তার ওপর সে মারা গেছে, এই খবর শুনে সবাই স্তব্ধ হয়ে যায়। বাসার ঠিকে ঝিটা পর্যন্ত কেঁদে কেঁদে ওঠে, 'বাচ্চাটারে এইখান থাইকা নিয়া গিয়াই মাইরা ফেলল। কেমন পাষাণ বাবা রে।'

আজাদকে ঢাকা থেকে সরিয়ে দেওয়ার বুদ্ধিটা চৌধুরী সাহেবের মাথায় খেলে যায়।–'আজাদকে ঢাকায় রাখা যাবে না। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়ার পরিবেশ নাই। সক্ষম লোকের ছেলেমেয়ে কেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে? আজাদকে করাচি পাঠাতে হবে। তাতে এক ঢিলে দুই পাখি মারা হবে। ছেলেটার ভালো হবে। এই গণ্ডগোলের বাইরে থেকে সে ভালো করে লেখাপড়া করতে পারবে। তার জীবনের নিরাপত্তা থাকবে। আবার মায়ের কাছ থেকে ছেলেকে আলাদা করা যাবে। তখন দেখা যাবে, মা কী করে একা ঢাকায় থাকে। এখন আমি আজাদকে যে মাসোহারা দেই, সেটা নিশ্চয়ই আজাদ তার মা আর তার খালাতো ভাইবোন পঙ্গপালের পেছনে ব্যয় করে। এটাও বন্ধ হবে। ছেলেকে করাচিতে যে খরচ পাঠাব, সেটা নিশ্চয় সে আর মায়ের পেছনে ব্যয় করতে পারবে না।

চৌধুরী সাহেব আজাদের এক মামাকে ফোন করে আনান। তাঁকে আজাদ ডাকে পাতলা মামা বলে। বিক্রমপুরে যেহেতু বেশির ভাগ বিয়েই আত্মীয়দের মধ্যে হতো, কাজেই পাতলা মামা আবার পাতলা চাচাও হয়। চৌধুরী সাহেব আজাদের মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেন এই পাতলা মামাকে।

পাতলা মামা হাজির হন ফরাশগঞ্জের বাসায়। দেখা করেন সাফিয়া বেগমের সঙ্গে। তাঁকে বলেন, 'বুবু, ছেলে তো শুনছি আইএ পাস করছে। খুব খুশির খবর। আলহামদুলিল্লাহ। এবার ছেলেকে পড়াবা কই?'

সাফিয়া বেগম বলেন, 'আজাদ তো বলে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়বে। সে তো সারা দিন ওই দিকে ঘুরঘুর করে।'

পাতলা মামা বলেন, 'না না না না। এইখানে আজাদের থাকাটা ঠিক হবে না। বিশেষ করে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়া একদম অনুচিত হবে। দেশের পরিস্থিতি ভালো না। আরো খারাপ হবে। ভদ্রলোকের ছেলেরা তো ঢাকায় পড়ে না।'

'তাহলে তারা কই কই পড়ে?' আজাদের মার চোখেমুখে উদ্বেগ!

পাতলা মামা একটা পানের খিলি মুখে পুরে বুড়ো আঙুলে চুন লাগিয়ে সেটা নিজের জিভে লাগান। তারপর আঙুলে লেগে থাকা চুনের অবশিষ্টটা গোপনে টেবিলের নিচে মুছতে মুছতে বলেন, 'করাচি। ভদ্রলোকের ছেলেরা পড়ে করাচিতে।'

সাফিয়া বেগমের মুখটা সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার হয়ে পড়ে। এই কথা তাঁর প্রতি একটা চ্যালেঞ্জ। করাচিতে ছেলেকে পাঠিয়ে তিনি একা একা কী করে থাকবেন! আর খরচই বা আসবে কোথেকে?

পাতলা মামা বলে চলেন, 'করাচিতে পড়ার খরচ যা লাগে, তা তো আজাদের বাবার কাছ থাইকাই আদায় করা যাবে। আপনি আজাদের বাবার কাছ থাইকা দূরে সইরা আসছেন, তাই বইলা তো বাবার ওপর থাইকা আজাদের হক চইলা যায় না। আর মাসের হাতখরচ অর বাবা অরে যা দেয়, তা একটু বাড়ায়া দিলেই তো আজাদের করাচির খরচ হইয়া যায়।'

আজাদের মা তাঁর ভাইয়ের এ প্রস্তাবটা গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেন। আসলেই এখানে থাকলে আজাদের লেখাপড়া হবে না। এমনিতে তার বন্ধুবান্ধব বেশি। তাদের সবার স্বভাব-চরিত্র যে এক রকম তা নয়। তার ওপর আবার দেশের যা পরিস্থিতি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অগ্নিগর্ভ হয়ে আছে। ছেলেকে করাচি পাঠানোই ভালো। তিনি বলেন, 'পাঠাতে পারলে তো খারাপ হতো না। কিন্তু আমার পক্ষে কারো কাছে কোনো সাহায্য চাওয়া সম্ভব না।'

'তাইলে আমি অ্যারেঞ্জ করি'–পাতলা মামা বলেন, 'চৌধুরী এতে আপত্তি করবে বইলা মনে হয় না।'

পাতলা মামা আজাদের করাচি যাওয়ার সব ব্যবস্থাই পাকাপোক্ত করে ফেলেন।

রাত্রিবেলা। ফরাশগঞ্জের বাসার ডাইনিং টেবিলটা সেগুনকাঠের। অনেক বড়। তবে ওপরের রেক্সিনের টেবিল-ঢাকনিটা পুরনো হয়ে গেছে। একপাশটা সামান্য ছেঁড়া। আজাদের পাতে ভাত তুলে দিচ্ছেন মা। আজাদ ভাতের দলা ভাঙছে।
মা টেবিল-ঢাকনিটার ছেঁড়া অংশটায় নখ খুঁটতে খুঁটতে বলেন, 'দুপুরে খেয়েছিস কই?'
'খেয়েছি। পপুলার হোটেলে।'
'হোটেলে মোটেলে খেয়ে পেটে গ্যাস্ট্রিক বানাবি?' তিনি ছেলের পাতে শাক তুলে দিতে দিতে বলেন।
'না। রোজ খাই না তো!'
'লেবু দিয়ে শাক দিয়ে ভাতটা মেখে খা। শাকের মরিচটা একটু ডলে নে।'
'ঝাল খেতে পারি না।'
'তাহলে। হোটেলের লাল ঝোল খাস কেমন করে?'
ছেলে খায়। মা তাকিয়ে তাকিয়ে তার খাওয়া দেখেন। টমেটো দিয়ে ধনে পাতা দিয়ে রুই মাছের ঝোল করেছেন। ছেলের পাতে তুলে দিতে দিতে বলেন, 'শোন, তোর করাচি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির ব্যবস্থা আমি করে ফেলেছি। তোকে ১০/১৫ দিনের মধ্যে রওনা হতে হবে।'
'বলো কি তুমি! তোমাকে ছেড়ে আমি যেতে পারব না'-আজাদ বলে।
'কয় কী পাগলে! তোকে যেতেই হবে। তুই ওখানে বিএ-এমএ পড়বি, ডিগ্রি নিবি, দেশে ফিরে এসে চাকরি করবি, নাহলে ব্যবসা করবি, তখন আমার মনে শান্তি আসবে। আমি বেঁচে আছি তো তোকে মানুষ দেখে যাব বলে। আরেকটু ভাত দেই?'
'কেন, এইখানে আর লোকের ছেলেমেয়ে পড়ছে না?'
'পড়ুক। লোকের কথা আর আমার কথা এক না। লোকের কি আর আমার মতন একটা মাত্র ছেলে? আর কেউ নাই! জামাই নাই। ভাই নাই। বাপ নাই। মা নাই!'
'সেই জন্যেই তো আমি যেতে চাই না।'
'সেই জন্যেই তোকে তাড়াতাড়ি পাঠাতে চাই। এইখানে ইউনিভার্সিটি গিয়ে কেমন পা ভেঙে এসেছিস। আর না। ভাত খাওয়ার মধ্যে আবার পানি খাস কেন? খাওয়া শেষ করে খা।'
মায়ের জেদের কাছে পরাভব মানতে হয় আজাদকে।
পাকিস্তান এয়ারলাইন্সের টিকেট তার জন্যে কেনা হয়।

দাদা চলে যাচ্ছে। জায়েদের খুব মন খারাপ। সে আজ আর স্কুলে যাবে না। সে দাদার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। আম্মা সকালবেলা স্কুলে যাওয়ার সময় জায়েদের কোনো তৎপরতা না দেখে জিজ্ঞেস করেন, 'কিরে, তুই ঢিলা মেরে বসে আছিস কেন? স্কুল তো লেট হয়ে যাবি।'
'স্কুল যামু না।' জায়েদ বলে।
'কেন, যাবি না কেন?'
'দাদার লগে লগে থাকুম।'
'দাদা কি সকালে যাচ্ছে নাকি! তুই স্কুল থেকে এসেও তো দাদার সঙ্গে থাকতে পারবি! যা, স্কুল যা।'
'দাদা আমারে যাইতে নিষেধ করছে।'
করাচি যাওয়ার জন্যে দাদা ব্যাগ গোছাচ্ছে। জায়েদ তাকে জিনিসপত্র এগিয়ে দিতে থাকে। কাপড়-চোপড়। শেভিং ক্রিম, ব্রাশ, সেফটি রেজর। বইপত্র। এলভিস প্রিসলির রেকর্ডটা। জায়েদ বলে, 'রেকর্ড লইয়া কী করবা দাদা? পেয়ার পাইবা কই?'
'করাচি কি গ্রাম নাকি?' আজাদ জবাব দেয়।
'নাজে তো ভালো সিনেমা আসতেছে। দেখবার পারবা না।'
'করাচিতেও সিনেমা হল আছে।'
'থাকুক। বাংলা বই তো আর চলব না। সুচিত্রা-উত্তমের বই কই দেখবা?'
'ওইখানেও নিশ্চয় চলবে। নাইলে আর কী! তুই দেখিস।'
'ক্যামনে দেখুম। পয়সা দিব কে?'
'তোকে মাসে মাসে আমি সিনেমা দেখার টাকা পাঠিয়ে দেব। এই শোন, তোর কলম লাগবে? ধর।'
আজাদ তার ড্রয়ারে রাখা কতগুলো কলম মুঠো করে জায়েদকে দেয়। জায়েদ 'না লাগব না' বলে নেয়। ড্রয়ারে আরো কতগুলো মূল্যবান সম্পদ আছে। একটা চাকু, এটা দিয়ে আম কাটা যাবে, একটা ঘড়ি, দাদা এটা পরে না, চাবিও দেয় না বহদিন, আরো না জানি কত কিছু।
'কিরে, ড্যাবড্যাব করে কী দেখিস?' আজাদ বলে।
'ঘড়িটা নষ্ট নাকি! চাবি দ্যাও না কদ্দিন। আমার কাছে রাইখা যাও। ডেলি চাবি দিমুনে। ভালো থাকব।'
'তোকে দিলে বেচে দিয়ে সিনেমা দেখবি।'
'এত দামি ঘড়ি। মাথা খারাপ, নাকি পেট খারাপ?'
'তাইলে যা এটা তোকে দিয়ে দিলাম।'
'চাকুটা কী করবা? ধার দেওন লাগব না!'
'এটা দিলে তোর দশ আঙুল কেটে টুকরা টুকরা হয়ে যাবে। এইটা দেওয়া যাবে না।'

দুটো পেবয় আছে। এগুলো ড্রয়ারে চাবি দিয়ে লুকিয়ে রাখতে হবে। নাহলে জায়েদের হাতে পড়ে গেলে মুশকিল।
'জায়েদ যা, ঘর ছাড়।'
'ক্যান। তোমার লগে থাকুম বইলা স্কুল গেলাম না। আর আমারে তুমি বাইর কইরা দ্যাও।'
'আরে হতভাগা। বের করে দিচ্ছি নাকি। দুইটা মিনিট একটু ঘরের বাইরে যা না। দুইটা মিনিট।'
মা এক সময় রাঁধতে ভালোবাসতেন। এখনও বাসেন হয়তো। কিন্তু সামর্থ্য তো নাই। রান্না করতে হলে বাজার করতে হয়। কে বাজার করবে? টাকা আসবে কোত্থেকে? কিন্তু আজকে মা অনেক কিছু রাঁধতে বসে গেছেন। ছেলে তাঁর যা কিছু খেতে ভালোবাসে, তার সব। পোলাওয়ের চেয়ে তার শাদা ভাত পছন্দ বেশি। ইলিশ মাছ সর্ষে দিয়ে। পাবদা মাছের ঝোল। চিংড়ির মালাইকারি। গোরুর মাংস ভুনা। মুরগির দোপেঁয়াজা। একটু আলুভর্তা। দুটো বেগুন ভাজি। মসুরের ডাল। আহা, ছেলে আজ তাঁর দূরে চলে যাচ্ছে। এটা তো শুধু পড়তে কয়েক মাস কি কয়েক দিনের জন্যে চলে যাওয়া নয়, এ হলো জীবন থেকেই চলে যাওয়া। বিদেশে ছেলে যাবে পড়তেই বটে, কিন্তু বিএ এমএ পাস করে সে কি আর ফিরে আসবে, কার ছেলেই বা ফিরে আসে, ফিরে এলেও সে কি আর আগের ছেলে থাকে, অন্য রকম হয়ে ফেরে, তার মাথার মধ্যে তখন অন্য আকাশ, অন্য জগৎ, সে কি আর মায়ের বুকে ফিরে আসে? মাকে জড়িয়ে ধরে? জ্বর হলে মা মা বলে বিলাপ করে? মাথার চুলে মায়ের আঙুলের বিলির জন্যে কাতর হয়ে পড়ে? ছেলের সঙ্গে মায়ের তখন অপার ফারাক, দুজনের দুই জগৎ, ছেলে তখন অচেনা, তাকে ডাকে বাইরের জগৎ, সে তখন কাজের মানুষ, আর তার যেটুকু ভালোবাসা, যেটুকু স্নেহ, তা থাকে অন্যের জন্যে, অন্য নারী, অন্য কাজ, অন্য দরজা, অন্য আকাশের জন্যে। মায়ের চোখ ভিজে আসতে চায়, কারণ তিনি পেঁয়াজ কাটছেন, এ ছাড়া আর কিছু নয়। আর কোনো কারণ থাকতে পারে না।
'মা, আমি একটু বাইরে গেলাম'–আজাদ বলে।
'আবার কই যাস? দুপুরে বাসায় খাস বাবা।'
'আচ্ছা।'
'আচ্ছা না। তোর জন্যে আমি রাঁধতে বসেছি। অবশ্যই খাবি।'
'কী কী রাঁধছ?'
'খেতে বসলেই দেখতে পাবি।'
'আচ্ছা আসব'খন।'

দুপুর গড়িয়ে যায়। আজাদ ফেরে না। মায়ের মন খারাপ। জায়েদ মাতৃহারা গোবৎসের মতো বাড়ির এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়। তার বাঁ হাতে ঘড়ি। ঘড়িটা চলছে। কানের কাছে নিয়ে সে টিক টিক শব্দ শোনে।
আজাদ ফেরে বিকালে। 'মা, খিদা লেগেছে। খাবার দাও।'
'দেওয়াই আছে। আয়। বস। হাত ধুয়ে আয়'–মা বলেন।
'তুমি খেয়েছ?'
'আমার খাওয়া। আমি এইসব খাই?'
'না খেলে। ভাত তো খাও। এত বেলা না খেয়ে আছ। নাও। তুমিও নাও। জায়েদ খেয়েছে? ডালু খেয়েছে?'
'হ্যাঁ। ওদের খাইয়ে দিয়েছি।'
'ভালো করেছ। জায়েদ, এই জায়েদ, আয় বস।' আজাদ উচ্চৈঃস্বরে বলে।
জায়েদ আসে। 'আমি খাইছি। প্যাট ফুইলা আছে।'
'আরে আবার বস। নে। বস। যা হাত ধুয়ে আয়। জলদি। জলদি।' জায়েদ 'না' করতে পারে না। সত্যি তার পেটে কোনো জায়গা নাই। তবু দাদার পাশে বসার এ সুযোগ। আরেকটু কাছে থাকার সুযোগ! সে কি ছাড়তে পারে? সে বসে পড়ে।
মা আজাদের পাতে ভাত তুলে দেন। আজাদ অন্যমনস্ক। সে থালার ভাত এক কোণে পালা করে। মা পাতে লেবু তুলে দিলে সে লেবু চিপতে থাকে। রস বেরিয়ে তার চোখে যায়। সে বাঁ হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ ডলে। মা পেটে আলুভর্তা তুলে দেন। সে ভালো করে না মেখেই গাপুসগুপুস করে ভাত মুখে তোলে।
মা বলেন, 'আস্তে আস্তে খাও বাবা। ভালো করে মেখে খাও। কোথায় থাকবে না থাকবে, কী খাবে না খাবে, ভাত তো পাবেই না, রুটি পাবে।'
আজাদ মুখ তুলে মায়ের মুখের দিকে তাকায়। 'আরে না। ভাত পাওয়া যাবে।'
জায়েদ বলে, 'করাচিতে নাকি খুব ভালো কাবাব হয়। আস্ত খাসি আগুনে পুড়ায়া কাবাব বানায়। দাদা আরাম কইরা খাইতে পারব।'
আজাদ হাসে। 'খাসির ভুঁড়ি কি বের করে নেয়, না পেটের ভিতরেই থাকে!'
মা বলেন, 'আজাদ। শোনো। মনে রেখো, তুমি করাচি যাচ্ছ পড়তে। পড়াশোনাটা ঠিকমতো করবে। কষ্ট হলেও পড়াশোনাটা শেষ করবে। বিদেশে নানা কষ্ট হয়। কিন্তু পড়তে গেলে কষ্ট করতেই হবে। মনটা উতলা করবে না। ধ্যান ধরে পড়বে। আমাদের জন্যে চিন্তা করবে না। আমরা আল্লাহর ইচ্ছায় ভালো থাকব। চিঠি লিখবে।'
আজাদ বলে, 'মা শোনো। তোমাকে একটা কথা বলি। আমি করাচি যেতে রাজি হয়েছি কেন জানো? রেজাল্ট ভালো করার জন্য। এখানে তো বন্ধুবান্ধব বেশি হয়ে গেছে। ওখানে

তো আর কেউ থাকবে না। খেলা নাই, আড্ডা নাই। খালি পড়া। দেখো, আমি যদি ফার্স্ট ক্লাস না পেয়েছি...'
'খাও বাবা। খাও।' মা একটা মুরগির রান তুলে দেন ছেলের পাতে।
সন্ধ্যার পরে রুমী আসে। সৈয়দ আশরাফুল হক আসে। ফারুক আসে। ইব্রাহিম সাবের আসে। তারা তিনতলায় আজাদের ঘরে বসে গল্পগুজব করে। হাসিঠাট্টা আমোদে মেতে ওঠে। ফারুক বলে, 'দোস্তো, পাকিস্তানি মেয়ে পাইলে প্রথমে গায়ে পানি ছিটাইবা। যদি দেখো ঝাইড়া দৌড় দিতাছে, তাইলে যাইতে দিও। পিছনে পিছনে দৌড়াইও না। আর যদি দেখো পানি সহ্য করতে পারে, তাইলে কাছে যাইও। নাইলে বুঝলা না, এক মাস গোসল করে না, গায়ে গন্ধ করব।'
বন্ধুরা সবাই রাতে এখানে ভাত খায়। আজাদের মা অনেকদিন পরে তাঁর বাসায় বাইরের লোকদের আপ্যায়ন করেন। অথচ আগে প্রায় প্রতিদিনই কাউকে না কাউকে দাওয়াত করে খাওয়াতেন। রাতের বেলা আবার তিনি ইলিশ-পোলাও রেঁধেছেন। এই পদ রান্নার জন্যে তাঁর খ্যাতি বিশেষজ্ঞ-পর্যায়ের। ইস্কাটনের বাসা থেকে বেরিয়ে আসার পরে সেটা আর করা হয় না।
জায়েদ কিন্তু এত লোকের উপস্থিতি পছন্দ করছে না। একটু পরে দাদা চলে যাবে এয়ারপোর্টের উদ্দেশে, এখন কি সে দাদাকে একটু একা পেতে পারত না!
খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে মা বলে, 'বাবা, রাত কোরো না, দিনকাল ভালো না, বিসমিলাহ করে বের হয়ে যাও। তাড়াতাড়ি এয়ারপোর্টে গিয়ে বসে থাকতে তো অসুবিধা নাই।'
মা সব সময় আজাদকে 'তুই' করে বলেন। কিন্তু এখন বলছেন তুমি তুমি করে। মা বাইরে যতই শক্ত ভাব দেখানোর চেষ্টা করুন না কেন, ভেতরে ভেতরে তিনি বিদায়-ব্যথায় কাতর হয়ে পড়েছেন।
আজাদ বেরিয়ে পড়ে। সঙ্গে বন্ধুরা। মা, জায়েদ, চঞ্চল, টিসুকে কোলে নিয়ে মহুয়া-এরাও আসে রাস্তায়। আরেক খালাতো ভাই ডালু আসে। তার হাতে আজাদের সুটকেস। একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে। আজাদেরবন্ধু ফারুকের গাড়ি।
মা বলেন, 'ঠিক আছে বাবা, আসো। দেখেশুনে যাও। টিকেট ঠিকমতো রেখেছ তো?'
'জি রেখেছি'-আজাদ বলে।
'আলাহর নাম নিয়ে রওনা দাও।'
আজাদ মাকে কদমবুসি করে। মায়ের বুকের ভেতর থেকে কান্না উগরে আসতে চাইছে। চোখের পানি বাঁধ মানতে চাইছে না। কিন্তু তিনি বাইরে থেকে তার কিছুই বুঝতে দেন না। মুখটা হাসি হাসি করে রাখেন। তাঁকে দেখলে বোঝার উপায় নাই যে ভেতরে তাঁর ঝড় বয়ে যাচ্ছে। আজাদ মায়ের 'তুমি' বলা শুনেই সব বুঝেছে।
আজাদ গাড়িতে ওঠে। তার বন্ধুদেরও কেউ কেউ। গাড়ির হেডলাইট জ্বলে ওঠে। শব্দ করে স্টার্ট নেয় গাড়িটা। একটু একটু করে এগোতে থাকে। তারপর পেছনের লাল লাইট দেখিয়ে এক সময় সেটা অদৃশ্য হয়ে যায়। তখন ঝপ করে এই জায়গাটায় একটা নিস্তব্ধতা এসে ভর করে। ডালু কোনো কথা বলে না, জায়েদ কোনো কথা বলে না, চঞ্চল কোনো কথা বলে না, টিসু না, বোনেরা না, মা না। তারা ঘরের ভেতরেও যায় না। আবার রাস্তার দিকে তাকিয়েও থাকে না। কয়েকটা মুহূর্ত শুধু, কিন্তু সে মুহূর্ত কয়েকটাই অনন্তকালের মতো সরণিজুড়ে দাঁড়িয়ে থাকে।
'আলাহ মাবুদ'-আজাদের মায়ের বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে যাওয়ার পরে সবাই ঘরে ফিরে আসে।
গাড়িটা বেশ খানিকটা পথ এগিয়ে যাওয়ার পর, একটা রুমাল বের করে আজাদ চোখ মোছে।

১২

আজাদ নাই। সে করাচির উদ্দেশে ঢাকা ছেড়েছে। উড়োজাহাজ তাকে নিয়ে চলে গেছে ওই আকাশের ওপর দিয়ে। এ তো যে-সে কথা নয়। এ তো মাওয়া বা বিক্রমপুর যাওয়া নয় যে বেলাবেলি চলে আসা যাবে। ইচ্ছা করলেই তো হুট করে চলে আসা যাবে না। পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তান, মধ্যখানে অন্য দেশ, হাজার মাইলের ব্যবধান। ওখানকার ভাষা আলাদা, খাবার আলাদা, চালচলন আলাদা। পাসপোর্ট লাগে না সত্য, কিন্তু আলাদাই তো দেশ। একা ছেলে তাঁর কোথায় থাকবে, কী খাবে? অসুখ-বিসুখ হলে তাকে কে দেখবে?
মা সারা দিন ডাকপিয়নের জন্যে পথ চেয়ে থাকেন। ছেলের কোনো কুশল যদি পাওয়া যায়! নফল রোজা রেখেছেন তিনি। বাসার সবাই, তাঁর ভাগ্নে-ভাগ্নিরা, তাঁর বড় বোনের ছেলে ডালু, সবাই তাঁকে দেখলেই গম্ভীর হয়ে যায়। এ হয়েছে আরেক মুশকিল।
তিনি প্রথমে কল্পনা করতেন আজাদ কোথায় কী করছে, সারাক্ষণ বিড়বিড় করতেন-'এই তো, এখন আজাদ প্লেনে। এই তো এখন আজাদ করাচি পৌঁছেছে ইনশালাহ।'
তারপর তো তিনি আর বলতে পারেন না, আজাদ কোথায় কার কাছে গিয়ে উঠেছে। তখন তিনি গুনতে আরম্ভ করেন ঘণ্টা, ১২ ঘণ্টা হলো আজাদ গেছে। ১৮ ঘণ্টা হলো

আজাদ ঢাকা ছেড়েছে। তারপর এল দিন গণনার পালা। আজ দুদিন হলো আজাদ করাচিতে। তাহলে চিঠি আসে না কেন? ও যদি পৌঁছেই একটা চিঠি লেখে, তাহলে কালকের প্লেনে চিঠিটা কি ঢাকায় আসতে পারে না? তাহলে পিয়ন কেন আজও চিঠি দিল না? এক দিন, দু দিন, তিন দিন, চার দিন।

সাফিয়া বেগমের বুকের ওপরে যেন পাথর চেপে বসে। আজাদ ঠিকভাবে পৌঁছেছে তো? বিমান ঠিকভাবে নেমেছে তো? কোনো দুর্ঘটনা? আল্লাহ না করুন। কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে তো রেডিওতে পত্রপত্রিকায় খবর পাওয়া যেত। তিনি জায়নামাজে বসেন। নামাজ শেষে দোয়া-দরুদ পড়েন। তারপর করেন দীর্ঘ মোনাজাত। 'হে আল্লাহ, আমার ছেলেটাকে ঠিকভাবে রেখো আল্লাহ।'
চার দিন পরে চিঠি আসে। একটা চিঠি।
পিয়ন এসে দরজায় কড়া নাড়তেই ছুটে যান সাফিয়া বেগম। এর আগেও অনেকবার পিয়ন এসেছে ভেবে তিনি ছুটে ছুটে গেছেন। কিন্তু এ -ও এসেছে। পিয়ন আসেনি। এবার সত্যি পিয়ন। সাফিয়া বেগমের বুক ধড়পড় করে। তিনি চিঠি হাতে নিয়ে খামটাই উল্টেপাল্টে দেখেন। বাই এয়ার মেইল।
তাঁর আজাদের হাতের লেখা।

TO
Mrs. Safia Begam
61 B. K Das Road
Farashganj
Dacca-1
East Pakistan

LvgUv wZwb wQo‡eb Kx K‡i? †fZ‡i AvRv‡`i †jLv wPwVUv hw` wQ‡o hvq| LwbK¶Y Zvi wb‡R‡K nZewׂ j‡M| Zvici wZwb Av‡jvi wecix‡Z a‡ib LvgUv| †fZ‡ii wPwVUvi Ae¯'vbUv †evSv hvq| wZwb GKcvk w`‡q LvgUv hZ K‡i †Q‡ob| Zvi mg¯Uv kixi Kvc‡Q|

11.8.64
Karachi

gv,
Avgvi fv‡jvevmv MnY Kwil| Avkv Kwi fv‡jvB AvQ| Awg m¯fv‡eB KiwP †cŠ‡QwQ| Gqvi‡cv‡U Wj`v`v Ges Zvi `B eÜ wQj| GLb Awg ôc¨v‡jm †nv‡U‡jô AwQ| MZKvj BDwbfwmwU‡Z wM‡qwQjvg| BDwbfwmwU KiwP kni †_‡K 15-20 gvBj `‡i| †nv‡÷j †`Ljvg fv‡jvB wKš Le Kov| †nv‡÷‡ji †MU †jvnvi ˆZwi Ges Le DPv| cv‡k Le †QvU| †`Iqvj¸wj Le DPv Ges †`Iqv‡ji Dc‡i fvsMv KvP emvb| GLb mKvj 8Uv ev‡R, 9Uvi mgq Wj Avm‡e Ges c‡i BDwbfwmwU‡Z hve fwZi e¨vcv‡i| hv †nvK, Avgvi R‡b¨ Zwg wPšv †Kv‡iv bv| Zwg wbR ¯v‡¯¨i cwZ hZ wbI| GLb Avi mgq †bB, c‡i Av‡iv wPwV wj‡L me Rvbve| Avkxev` †Kv‡iv, †hb Avgvi AvKv•¶v cY nq|

BwZ †Zvgvi
AvRv`

GB wVKvbvq wPwV w`I

Azad.
C/O Q. B. Islam
19-F Block 6
P E C H S
KARACHI- 19

মা ঘুরেফিরে কয়েকবার চিঠিটা পড়েন। তারপর বড় বোনের ছেলে ডালুকে ডেকে পড়তে দেন। জায়েদ এসে তীর্থের কাকের মতো দাঁড়িয়ে থাকে, আজাদ দাদার চিঠি সেও পড়বে।
জুরাইন গোরস্তানে আম্মাকে শুইয়ে রেখে এসে জায়েদের দিনগুলো এলোমেলো হয়ে যায়। সে হিসাব করে কূল পায় না, কী কঠিন মহিলা ছিলেন তিনি, আজাদের মা। তাঁর সমস্ত ব্যথা, সমস্ত দুঃখ তিনি একাই পুরোটা জীবন বহন করে গেছেন। সুখের সংসার ছাড়ার দুঃখ, মুক্তিযুদ্ধে নিজের ছেলেকে হারানোর দুঃখ। কিন্তু তিনি কোনো দিনও চাননি, এসব কথা মানুষ জানুক, এসব নিয়ে লেখালেখি হোক। জাহানারা ইমাম

এসেছিলেন অনেকবার, ‘আপা, আপনার জীবনের কথা বলেন, এসব লিখে রাখা দরকার।’ তিনি রাজি হননি। জায়েদকে বলে গেছেন, ‘খবরদার, আমার ছবি কাউকে দেবে না।’ জায়েদ আম্মার ছবি কাউকে দেবে না। এ সত্যি। কিন্তু আরো কিছু জিনিস তো আছে তার কাছে। যেমন আছে করাচি থেকে মাকে লেখা আজাদ দাদার চিঠি।

জায়েদ তার বাক্সে হাত দেয়। চিঠিগুলো বের করে। আপন মনে পড়ে। পড়ে কাঁদে। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। কী করবে এখন এসব নিয়ে সে।

করাচি থেকে লেখা আজাদ দাদার প্রথম চিঠিটা এত দিন পর পড়ে নানা কথাই মনে হয়ে জায়েদের। আজাদ কথাটার অর্থই তো স্বাধীন। আর দ্যাখো, তার আজাদ দাদা করাচিতে তার হোস্টেল দেখে প্রথমেই যেটা লক্ষ করল, তা হলো, চারদিকের দেয়াল উঁচু, দেয়ালের ওপরে কাচ বসানো, গেট লোহার, আর পাশে ছোট। আশ্চর্য না? তার স্বাধীনতা যে এ হোস্টেলে থাকলে চলে যাবে, এটাই ছিল তার প্রথম চিন্তা।

এই চিঠি যে-তারিখে লেখা, ঠিক তার দুদিন পরের তারিখের আরেকটা চিঠি বের হয়। এ চিঠিতে আজাদ মাকে জানায়, ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির ব্যাপার প্রায় পাকা, ইউনিভার্সিটিতে বেশ কিছু বাঙালি ছেলে আছে, আর মায়ের প্রতি অনুরোধ জানায় চিন্তা না করার জন্যে, শরীরের প্রতি যত্ন নেওয়ার জন্যে, তার জন্যে দোয়া করার জন্যে আর একটা চাকর রাখার জন্যে।

এ চিঠিতে আর পরের চিঠিগুলোতে আজাদ বারবার বলেছে, এবার সে ফার্স্ট ক্লাস পেতে চায়, যাতে সে পড়াশোনা করে মানুষের মতো মানুষ হয়ে মার মুখে হাসি ফোটাতে পারে।

এদিকে মা ছেলের জন্যে পাঠিয়েছেন সন্দেশ। আজাদ সেটা নিজে খেয়েছে, খাইয়েছে আশপাশের অনেক ছাত্রকে। তারা সবাই সন্দেশের প্রশংসা করেছে। চিঠিতে আজাদ সে-কথা লিখতে ভোলেনি।

আজাদ ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে। তার নিজের নামে বরাদ্দ করা হোস্টেলের সিটে উঠেছে।

একদিন গভীর রাতে তার ঘুম ভেঙে যায়। তার রুমমেট আরো দুজন। তারা ঘুমাচ্ছে। এদের একজন সিন্ধি, আরেকজন করাচির। এদের প্রত্যেকের বাবা দ্বিতীয়বার সংকার্য করেছেন। তিনজন একই রকম ভাগ্যঅলা মানুষ যে কীভাবে একত্র হলো, আল্লাহ জানে।

‘আমি এখন এই করাচির হোস্টেলে’, আজাদ ভাবে। ‘আর জানি না, ঢাকায় মা কী করছে’-সে বিড়বিড় করে। তার ইচ্ছা করছে বিছানা ছেড়ে উঠে বসে আলো জ্বালিয়ে চিঠি লিখতে বসে। কিন্তু তা উচিত হবে না। এত রাতে আলো জ্বালালে রুমমেটদের অসুবিধা হবে। কালকে ভোরে উঠে সে লিখতে বসবে চিঠি। অনেক বড় চিঠি লিখবে মাকে। কী লিখবে সে?

‘মা, এখানে আমি ভালোই আছি। কোনো গণ্ডগোল নাই। ভালো ইউনিভার্সিটি আর সুশৃঙ্খল পরিবেশ।

তবে দূরে থাকি বলে, একা থাকি বলে, খুব ছোটখাটো বিষয়ের জন্যে মনটা মাঝে মধ্যে কেমন করে ওঠে। যেমন ধরো ভাত। এমন তো না যে ঢাকায় থাকতে রোজই ভাত খেতাম। রুটি-তন্দুরি-মোগলাই দিয়ে দু-তিন দিন পার যে কখনও করিনি, তেমন তো নয়। কিন্তু করাচিতে এসে ভাত জিনিসটা হোস্টেলের ডাইনিংয়ে খেতে পাচ্ছি না, ভাত খাওয়ার জন্যে তিন মাইল দূরে ইস্ট পাকিস্তান হোটেলে যেতে হবে, এটা যেন সহ্য হয় না। এখন মনে হয়, তুমি যে ভাত রাঁধতে, তাতে বলক উঠত, সুন্দর মাড়ের গন্ধ বেরুত, সেই গন্ধটাও কত সুন্দর ছিল। শুধু একটু ভাতের গন্ধের জন্যেও মনটা খারাপ করে মা। একই রকম মনটা আকুল হয়ে ওঠে একটু বাংলায় কথা বলার জন্যে, বাংলায় কথা শোনার জন্যে। আমাদের হোস্টেলে যে কজন বাঙালি ছেলে আমরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছি, তারা এখন একসাথে হওয়ার জন্যে, একসাথে চলার জন্যে, একটু বাংলায় কথা বলার জন্যে, একটু বাংলা কথা শোনার জন্যে আঁকুপাঁকু করি। রাস্তায় যদি কোনো পূর্ব পাকিস্তানের ট্যাক্সিঅলার সঙ্গে দেখা হয়, যদি তার সঙ্গে উর্দুতে কথা বলে খানিকক্ষণ পথ চলার পরে জানতে পারি সে বাঙালি, কী আনন্দটাই না হয়। তার সাথে বেমালুম তখন বাংলা কথা বলা শুরু করে দিই। মনে হয় সাত জনমের আপন একজনকে পেলাম। এখন মনে হচ্ছে, বাঙালি আমরা আরেক জাতি। ওরা, পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দুঅলারা আরেক জাতি। মুসলমান হলেই জাতি এক হয় না।

এক যে হয় না, সেটা ওদের আচার-আচরণেও টের পাওয়া যায়। ইতিমধ্যে আমার এক বন্ধু পেয়ে গেছি, রাওয়ালপিন্ডি বাড়ি, হিজাজি খান। সে খুব ভালো ছেলে। আমাকে খুবই পছন্দ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি বলব, পুরো পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানের লোকদের ধারণা হয় খুব খারাপ, নয় তো ধারণাই নাই। ওরা আমাদের মুসলমানও ভালোমতো মনে করে না, মানুষও ঠিক মনে করে কি না, সন্দেহ। পূর্ব পাকিস্তান থেকে এসেছি শুনলেই নানা রকমের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে।

আর আছে নানা রকমের বৈষম্য। পশ্চিম পাকিস্তানে না এলে বোঝা যাবে না, বাঙালিদের ওরা কতভাবে বঞ্চিত করে রেখেছে। অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে বাঙালি নাই বললেই চলে, সেনাবাহিনীতেও বাঙালি কম নেওয়া হয়। বার্ষিক বাজেটে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে বরাদ্দ অনেক বেশি। আমাদের ঢাকার সঙ্গে ওদের করাচির তুলনা করলে আকাশ-পাতাল পার্থক্য আর বৈষম্য চোখে পড়ে।

আমার সাথে একটা মেয়ের বন্ধুত্ব হয়েছিল। পাঞ্জাবি মেয়ে। তবে মোহাজের। ইন্ডিয়ান পাঞ্জাব থেকে এসেছে '৪৭-এর পরে। একদিন কতগুলো পাঞ্জাবি এসে বলল, খবরদার, বাঙালি হয়ে পাঞ্জাবি মেয়ের সাথে মিশবি না। তারা সব গুণ্ডা ধরনের ছেলে।
আমার ইচ্ছা হলো কষে মার লাগাই। ঢাকা হলে আমার সাথে কেউ এ রকম বাজে ব্যবহার করলে আমি কী করতাম তুমি কল্পনা করতে পারো! মেরে সব কটার চামড়া খুলে ফেলতাম। কিন্তু বিদেশ বলে কিছুই করতে পারলাম না। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করছি। মাঝে মধ্যে মনে হয়, কিসের পড়াশোনা, দেশে ফিরে যাই।
করাচি আর যাই হোক, দেশ নয়, বিদেশ।
আমি শুধু তোমার মুখের দিকে চেয়ে এই বিদেশে থাকা আর অপমান সহ্য করার কষ্ট করছি। দোয়া করো, যেন তাড়াতাড়ি পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফিরে তোমার কষ্ট দূর করতে পারি।'
এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে ভোর হয়ে আসে। আজানের ধ্বনি শোনা যায়। আজাদ ঘুমিয়ে পড়ে।
সকালবেলা ক্লাস। ক্লাস থেকে ফিরে এসে সে মাকে চিঠি লিখতে বসে যায়। চিঠি লেখার জন্য নীল রঙের প্যাড কিনে রেখেছে সে। নীল রঙের কালিতে লেখে :
মা,
চিঠি লিখতে দেরি হয়ে গেল বলে কিছু মনে কোরো না। কারণ একদম সময় পাই নাই। এখানে সবাই সব সময় ব্যস্ত থাকে। আমি এখন হোস্টেলে ভালোই আছি। আমাদের ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। আমি এখনও রীতিমতো পড়া শুরু করি নাই। আমরা তিনজন এক রুমে থাকি। এখানকার খাবার জিনিস মোটেই ভালো না। এখানে অনেক পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি ছেলে আছে এবং আমাদের আলাদা বাংলা সমিতি আর ক্লাব আছে। এখানকার মাস্টাররা খুব ভালো। এখানে নিয়ম করেছে যে ক্লাসে মাস্টাররা উর্দুতে পড়াবে। কিন্তু আমাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হবে আশা করি। উর্দুর জন্য খুব অসুবিধা হচ্ছে। দোয়া কোরো যেন অসুবিধা না হয়। আর তোমার শরীর কেমন আছে। নতুন কোনো খবর থাকলে বোলো। চিঠির উত্তর দিও। এখন আসি। আমার জন্য চিন্তা কোরো না।
ঠিকানা
Magferuddin Ahmed Chowdhury
BLOCK 2 Room No 28
KARACHI UNIVERSITY HOSTEL
KARACHI 32

রাতের বেলা মনে মনে লেখা চিঠিতে সে কত কথাই না লিখেছিল। আর এখন দিনের আলোয় যখন সত্যি সত্যি মাকে সে চিঠি লিখতে বসেছে, তখন কিন্তু আর অত কথা লেখা হয় না। সংক্ষেপে গুছিয়ে, মা যেন আহত না হন, এমন কায়দা করে চিঠিটা লিখতে হয়। মানুষের মনের কথা আর মুখের কথাই এক হয় না, মনের কথা আর চিঠির কথা এক হওয়া তো আরো অসম্ভব।
চিঠি পেয়ে মা চিন্তিত হন। আজাদ লিখেছে, ওখানকার খাবার খুব খারাপ। কত খারাপ? হায়! আমার ছেলে ভাত পছন্দ করে। করাচিতে এখন সে ভাত পাবে কোথায়? মাছ পাবে কোথায়? আর দ্যাখো, তিনি নিজে কত রাঁধতে পছন্দ করেন। কতজনকে রেঁধে রেঁধে এই জীবনে খাইয়েছেন। আর তাঁর নিজের ছেলে ভাতের জন্যে আনচান করছে। তাঁর দুঃখের যেন সীমা-পরিসীমা থাকে না। আবার তিনি শাসন করেন নিজের মনকে। আজাদ করাচি গেছে পড়তে, ভালো রেজাল্ট করতে, ভাত-মাছ খেতে নয়। বিদেশে গেলে কষ্ট তো হবেই। মহানবী (সাঃ) বলেছেন, জ্ঞানার্জনের জন্যে সুদূর চীন দেশে হলেও যাও। আরব দেশ থেকে চীন দেশে কেউ গেলে চায়নিজ খাবার দেখলে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তবু তাকে যেতে হবে। কষ্ট স্বীকার করতে হবে। কারণ সে গেছে এল্‌ম তালিম করতে।
আর দ্যাখো তো কাণ্ড। ওরা নাকি উর্দুতে পড়াবে। উর্দু তো ছেলে আমার একদমই জানে না। কেন বাবা ইংরেজিতে পড়াতে পারো না? আজাদ খুব ভালো ইংরেজি জানে।
এইসব সাত-পাঁচ ভাবেন আর তিনি লেগে যান চাল কুরে আটা বানাতে। তাঁর সঙ্গে যোগ দেয় বাসার আর মেয়েরা। উরুনগাইনে ভেজা চাল গুঁড়ো করা চলে। বেরিয়ে পড়ে শাদা আটা। তারপর সেই আটা নিয়ে সাফিয়া বেগম বসে যান পিঠা বানাতে। বাঙালি পিঠা। মা এখন তক্কে তক্কে থাকেন, কে কখন করাচি যাবে। তার হাত দিয়ে তিনি পিঠাটা, মিষ্টিটা পাঠিয়ে দেন। পিঠা খেয়ে আর বন্ধুদের খাইয়ে ছেলে চিঠি লেখে, 'মা তোমার পিঠা খেয়ে আমার বন্ধুরা কত প্রশংসাই না করেছে।' সেই চিঠি পড়ে মায়ের মন প্রশান্তিতে ভরে যায়। যাক, ছেলে তাঁর পিঠা খেয়েছে, আর শুধু খায়নি, বন্ধুবান্ধবদেরও খাইয়েছে। আর ওরা, মাউড়ারা তাঁর বাঙালি পিঠার প্রশংসা করেছে।

১৩

প্রবাসে গেলে বাঙালি মাত্রেরই যা হয়, ভাষা আর ভাতের জন্যে হা-পিত্যেশ করা, তা তো আজাদের বেলায়ও ঘটে। অন্য লক্ষণটাও বাদ থাকে না। সমিতি করা। বাঙালি সমিতি করা।

আর এইসব সাংগঠনিক কাজে যুক্ত থাকায় আজাদের আরেকটা লাভ হয়। করাচিতেই এক বাঙালি মেয়েকে তার ভালো লেগে যায়। একই ইউনিভার্সিটিতে পড়ে মেয়েটা।

বাঙালি সমিতির অনুষ্ঠানে মেয়েটা গান গেয়েছিল। আধুনিক গান। সাতটি রঙের মাঝে আমি মিল খুঁজে না পাই, জানি না তো কেমন করে নিজেকে সাজাই। শাদা রঙের জামা, সে তো ভালো নয়, হলুদ না হয় নীলে কেমন জানি হয়!

মেয়েটা পরে এসেছিল শাড়ি। কপালে দিয়েছিল টিপ। আজাদের চোখে লেগে গিয়েছিল সে। আজাদ সুযোগ খুঁজছিল মেয়েটার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করার। সুযোগ সহজেই মিলে যায়। অনুষ্ঠানশেষে ছিল চা-পর্ব। হলঘরের পেছন দিকে বড় টেবিলে চায়ের কাপ আর কেতলি সাজানো। পিরিচে পিরিচে বিস্কিট আর সামুচা। অনুষ্ঠান শেষ হলে সবাই একসঙ্গে উঠে পড়ে চায়ের টেবিলের দিকে যাত্রা শুরু করলে খানিকটা মানবজট লেগে যায়। আজাদ কিন্তু প্রথমেই ঝাঁপিয়ে পড়ে না চায়ের কাপের দিকে। তার নজর শাড়ি পরা গায়িকাটির ওপরে। সে যখন যাবে, আজাদও তখন যাবে টেবিলের দিকে। ভিড় এড়াতে মেয়েটা দর্শক-চেয়ারেই বসে থাকে। তার মাথার ওপরে একটা সিলিং ফ্যান ঘুরছে। মেয়েটার চুল সেই বাতাসে উড়ছে। আজাদ এগিয়ে যায় তার কাছে, গলার স্বর ঠিকমতো বেরুতে চাইছে না, একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে যথাসম্ভব স্মার্টভাবে সে বলে, 'আপনি গাইলেন, আপনি জানেন না কেমন করে কী দিয়ে সাজবেন, কিন্তু খুব সুন্দর করে সেজেছেন।'

মেয়েটা সপ্রতিভ। হাত দিয়ে উড়ন্ত কেশদাম শাসন করতে করতে সে বলে, 'ওমা। গাইলাম গান, প্রশংসা করলেন সাজের। ব্যাপার কী? গান বুঝি ভালো হয়নি?'

'আরে না। গনও ভালো হয়েছে। বোঝেনই তো, কত দিন পরে নিজের দেশের গান শুনলাম। আপনি কি ফার্স্ট ইয়ারে?'

'হ্যাঁ। আপনি?'

'সেকেন্ড ইয়ার চলছে। কেমন লাগছে?' আজাদ বলে।

'উর্দু বুঝতে কষ্ট হচ্ছে।'

'আমারও খুব হয়। স্যাররা ভালো পড়ায়, কিন্তু কেন যে উর্দুতে পড়ায়, বুঝি না। ইংলিশে পড়ালে কিন্তু বুঝতাম। চা নেবেন না?'

'নেব। ভিড়টা একটু কমুক।'

'চলেন। এখন নেওয়া যাবে।'

মেয়েটা ওঠে। হাতব্যাগটা কাঁধে ঝোলায়।

'ঢাকায় কোথায় বাসা আপনার?' আজাদ জিজ্ঞেস করে।

'পুরানা পল্টন।'

'পুরানা পল্টন কোন বাসাটা বলেন তো!'

'ওই যে পানির ট্যাঙ্কটা আছে না, ওখানে।'

'ও।'

'আপনাদের বাসা কোথায়?'

আজাদ বিপদে পড়ে। কোন বাসার কথা বলবে। শেষে বলে, 'ফরাশগঞ্জ।' আজাদ কেতলি থেকে চা ঢালে পেয়ালায়। মেয়েটিকে এগিয়ে দেয়। নিজে নেয় এক কাপ। তারপর দুজনে এক কোণে দাঁড়িয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিতে থাকে।

আর বেশি গল্প করা যায় না। অন্য ছাত্ররা এসে পড়ছে। চা নিয়ে সামুচা নিয়ে আশপাশে দাঁড়িয়ে পড়ছে। মেয়েটাও তার পরিচিতজন, ক্লাসমেটদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করছে। আজাদ চায়ের কাপ হাতে তার বন্ধুদের দিকে এগিয়ে যায়।

বাশার, রানা, কায়েসরা সব একসঙ্গে। তাদের সঙ্গে গল্পগুজবে নিজেকে নিয়োজিত করে সে।

বাশার বলে, 'আজাদ, তোমার সাথে আগে থেকেই আলাপ ছিল নাকি মিলির?'

আজাদ বলে, 'হ্যাঁ। ওই তো পুরানা পল্টনে বাসা। আপনি চিনবেন।'

বাশার বলে, 'আমি চিনব কী করে! টাঙ্গাইলে বাড়ি হলে না চিনতাম।'

আজাদ বলে, 'আমি ওদের বাসায় আগেও গেছি। ওর মাকে খালাম্মা বলে ডাকি!'

মেয়েটা কাছে আসে। আজাদ বলে, 'শোনেন, আপনার সাথে পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি হলেন আবুল বাশার, আর ইনি হলেন রানা। আর ইনি মিলি। খুব ভালো গান করেন। ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছেন।'

মিলি বলে, 'তা তো হলো। কিন্তু আপনি তো আপনার নামটাই বললেন না। নিজের পরিচয়টা আগে দেন।

'আমার নাম আজাদ।'

'ঠিক আছে। আপনার নামটা জানার জন্যেই আমি আবার এদিকটায় এলাম।'

মিলি চলে যায়। রানা আজাদের গায়ে চাপড় মেরে বলে, 'তুমি তো দেখি এক নম্বরের গুলবাজ, উনি তোমার নামই জানেন না, আর বলছ বাসায় অনেকবার গেছ।'

'গেছি। কিন্তু ও আমার নাম ভুলে গেছে।'

মিলির সঙ্গে দেখা হওয়ার পর, কথা হওয়ার পর, আজাদের নিজেকে কেমন যেন তুচ্ছ লাগতে শুরু করে। মনে হয়, এ জীবনের কোনো মানে নাই। মনে হয়, ইস্ আবার যদি তার দেখা পাওয়া যেত! আবার কবে বাঙালি সমিতির অনুষ্ঠান হবে? সে মনে মনে মিলির সঙ্গে কথা বলে। রাতের বেলা বই নিয়ে পড়ছে, খানিকক্ষণ পর হুঁশ হয়, আসলে সে পড়ছে না, মিলির কথা ভাবছে। সে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে নিজের অজান্তেই খুঁজতে থাকে মিলিকে। যদি আরেকবার মিলির দেখা পাওয়া যায়!

দেখা না পাওয়ার কোনো কারণ নাই। ওদের ক্লাস যেখানে হয় সেখানে দু-একবার ঘুরঘুর করতেই মিলিকে করিডরে দেখতে পাওয়া যায়। কী আশ্চর্য, মেয়েটা তার চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আজাদের বুক কাঁপতে থাকে।

'কেমন আছেন?' আজাদ গলায় যথাসম্ভব জোর এনে বলে।

মিলি চোখ তুলে তাকায়। বাংলায় তার সঙ্গে কথা বলে কে রে? আরে, এ তো সেদিনের ছেলেটা। বাহ্। আজকে তো আরো চমৎকার পোশাক পরে এসেছে! মিলি মনে মনে তারিফ করে।

'ভালো। আপনি ভালো?' মিলি বলে।

'আছি। আপনার আরো ক্লাস আছে?'

'না। ক্লাস শেষ। বাসায় চলে যাব।'

'বাসাটা কোন দিকে যেন?'

'পিইসিএইচ। আমার খালার বাসা। ওদের সঙ্গে থাকি আমি।'

'আরে, ওদিকে তো আমিও যাব! ওখানে আমার এক বোনের দেবর থাকেন।'

'চলেন তাহলে। আমি একটা বাস ধরব।'

'আমিও।'

বাসস্টপেজে দুজন গিয়ে দাঁড়ায়। আজ রোদটা ভীষণ চড়া। মিলি বলে, 'আমি যদি ছাতা বের করি, আপনি মাইন্ড করবেন না তো?'

'না। মাইন্ড করব কেন! রোদ লেগে আপনার রঙ ময়লা হলে তো জাতীয় ক্ষতি!'

'মানে?'

'মানে বাঙালি মেয়ে তো এখানে বেশি নাই। আপনি আছেন। আপনাকে দেখতে সুন্দর লাগলে আমরা সব বাঙালি ছেলেরাই সেটা নিয়ে গর্ব করতে পারি। আপনার রঙ যদি একটু রোদে পুড়ে যায়, তাহলে সেটা আমাদের ন্যাশনাল লস না!'

'আপনি তো বেশ সুন্দর করে কথা বলেন। মেয়ে-পটানো কথা। কার কাছ থেকে শিখেছেন?'

'মনে হয় জন্মগত প্রতিভা।' আজাদ হাসতে হাসতে বলে বটে, তবে তার এই প্রতিভাটার জন্যে সে তার জন্মদাতা পিতাকেই কৃতিত্ব দিতে প্রস্তুত আছে।

দুজনে এক বাসে ওঠে। গল্প করতে করতে যায়। একই স্টপেজে নামে তারা। মিলি বলে, 'আপনি কোন দিকে যাবেন?'

আজাদ বলে, 'এই তো এই রাস্তা। সামনের দুটো লেন পরেই বাসাটা।' আজাদ তাড়াতাড়ি করে যা হোক একটা কিছু বলে।

মিলি বলে, 'আমি তো যাব উল্টো পথে। আসবেন আজকে আমাদের বাসায়?'

মনে মনে আজাদ বলে, 'যাব, একশবার যাব'; মুখে বলে, 'না, আজ না। আরেক দিন। আসি!'

তারপর সামনে গিয়ে একটা বাড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে, চুপিসারে তাকিয়ে থাকে মিলির চলে যাওয়ার দিকে, তার মনে হয়, প্রতিটা পদক্ষেপে মেয়েটা সমস্তটা পথকে ধন্য করে দিয়ে চলে যাচ্ছে, তার মনে হয়, ওই পথের ধুলোগুলোও কতটা ধন্য হয়ে যাচ্ছে তার পদস্পর্শ পেয়ে। মিলি অদৃশ্য হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে সে উল্টো পথে হেঁটে আবার ফিরে যায় বাসস্টপেজে। কিসের বোন, আর কিসের দেবর?

আবার বাঙালি সমিতির অনুষ্ঠান করার জন্যে আজাদ মরিয়া হয়ে উঠেছে। আসলে এই সুযোগে সে যেতে চায় মিলিদের বাসায়। তাকে অনুষ্ঠানে গান গাইতে বলতে। তা ছাড়া একটা কোরাসও রাখা উচিত। 'ধনধান্যপুষ্পভরা' গানটা হতে পারে। তা কোরাস গাইতে হলে তো রিহার্সাল লাগবে, নাকি!

এইসব ছুঁতোয় আজাদকে যেতে হয় মিলির বাসায়। মিলির খালার সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। খালা জানতে চান আজাদের সম্পর্কে। তার বাবার নাম। আজাদ জানায়। সঙ্গে সঙ্গে মিলির খালা ঝলমলিয়ে ওঠেন : 'ইউনুস চৌধুরীর ছেলে তুমি? বাপরে!'

আজাদ চলে গেলে খালা শতমুখে বলতে থাকেন, 'উরে বাবা। মিলি তুই জানিস না ওরা কত বড়লোক।'

মিলি রোজ ক্লাস শেষে বাঙালি সমিতির রিহার্সালে আসে। আজাদ মিলিদের ক্লাসের সামনে থেকে তাকে নিয়ে আসে। মিলির রিহার্সাল শেষ হলে তাকে বাসস্টপেজ পর্যন্ত এগিয়ে দেয়।

বাশার, রানা, কায়েস-আজাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা আজাদকে ধরে। 'আজাদ, তুমি তো কিলা-ফতে করে দিয়েছ, আমাদের খাওয়াও।'

'খেতে চাইলে খাবে। এর সাথে অন্য কোনো কিছুকে মিলিও না।' আজাদ জবাব দেয়।

'মিলিও না মানে কী'? রানা বলে, 'মিলিও না নয়, কথাটা হবে মিলি ও হ্যাঁ।'

খাওয়ানোর বেলায় মায়ের মতোই দিলদরিয়া আজাদ। সোৎসাহে বন্ধুদের নিয়ে যায় গ্রান্ড জাহাঙ্গীর হোটেলে। কাবাব-তন্দুর খাইয়ে দেয় ভরপেট।

মাকে চিঠি লিখে মিলির কথা জানায় আজাদ। মা ছাড়া এ পৃথিবীতে কে আছে আর তার! তাঁকে তো অবশ্যই তার জীবনের সব কথাই বলতে হবে।

মা মনে মনে খুশিই হন। ছেলের বউয়ের জন্যে তিনি অনেক ভরি গয়না আলাদা করে রেখে দিয়েছেন। এগুলো বউয়ের হাতে দিতে পারলে না তাঁর শান্তি!

কিন্তু একদিন হঠাৎ করেই ক্লাসে আসা বন্ধ করে দেয় মিলি। কী ব্যাপার? মিলির কী হলো? অসুখ-বিসুখ? আজাদের বুক কাঁপে। দুদিন মিলিকে না দেখে ভেতরে ভেতরে দারুণ অস্থির বোধ করে সে। তারপর সে যায় মিলির খালার বাসায়। দরজায় নক করে। মিলির খালা তাকে বৈঠকখানায় বসতে দেন। তারপর দরজায় দাঁড়িয়ে দু হাতের আঙুল কচলাতে কচলাতে বলেন, 'বাবা, এসেছ। খুব ভালো করেছ। তোমাকে তো একটা কথা বলাই হয়নি। মিলির তো বিয়ে হয়ে গেছে। হঠাৎই ভালো সম্বন্ধ এসেছে। বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। ছেলে বাঙালি। লাহোরে পোস্টিং।'

আজাদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলে, 'আশ্চর্য তো। মিলি আমাকে কিছুই বলল না।'

'বলবে কী করে? ও জানে নাকি! আমরাই জানি না। মেয়ে দেখার কথা বলে ওরা এসেছিল। পছন্দ হয়ে গেছে। বিয়ে করে বউ নিয়ে চলে গেছে। নাও মিষ্টি খাও। ওর বিয়ের মিষ্টি।'

ব্যাপার আজাদ এটুকুনই শুধু জানতে পারে। বেশি কিছু নয়। কিন্তু এর-ওর মাধ্যমে আজাদের বন্ধুরা জেনে যায়, আজাদের বাবা যে দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন, এই খবর, আর তার বাবার সঙ্গে আরো আরো মেয়ের সম্পর্ক আছে-এ ধরনের গুজব মিলিদের বাসায় গিয়ে পৌঁছেছিল। মিলির বাবা-মা তাই চাননি আজাদের সঙ্গে মিলির কোনো সম্পর্ক হোক। সে কারণেই তড়িঘড়ি করে মিলিকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আজাদকে জানতেও দেওয়া হয়নি।

১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ বেধে যায়। করাচিতে ব্লাক আউট হয় মাঝে মধ্যেই। আজাদের এই অন্ধকার সহ্য হয় না। অন্ধকার হলেই তার মনে পড়ে যায় মিলির কথা। মেয়েটা তার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলত। তার দু চোখে সে দেখতে পেয়েছিল মুগ্ধতা। এমনকি আজাদের মধ্যে কী কী দেখে সে পটে গেছে, এসব নিয়েও সে কথা বলেছিল। তা বলে সে হঠাৎ এভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে পারল! মেয়ে মাত্রই কি অভিনেত্রী! শুধু মিলি প্রসঙ্গ নয়, তার খারাপ লাগে যখন মনে পড়ে পরীক্ষার রেজাল্ট। পরীক্ষা সে তত খারাপ দেয়নি, কিন্তু তার রেজাল্ট তেমন ভালো হয়নি। এটা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। স্যাররা কি বাঙালি বলে তাকে কম নম্বর দিয়েছেন? এটা কি হতে পারে! তাও কি হয়! তার খারাপ লাগে। চারদিকে অন্ধকার। ইন্ডিয়ান বিমান আসবে, এই ভয়ে। মরার বিমান আসে না কেন? কেন মাথায় বোমা মেরে সবকিছু ধ্বংস করে দেয় না! একটা মোমবাতি জ্বালাবে নাকি সে? না। জ্বালাবে না। এই অন্ধকারই তার ভালো লাগে।

আজাদ নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে আরো বেশি করে বাঙালি সমিতি আর বাংলা ক্লাবের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে ফেলে।

পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের পর ভারত-বিরোধিতার ধুয়া তুলে রেডিওতে রবীন্দ্রসঙ্গীত থেকে শুরু করে হিন্দু লেখকদের গান প্রচার করা, দেশে ভারতীয় বই আমদানি করা ইত্যাদি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হতে থাকে। সিনেমা হলে আর আসবে না উত্তম-সুচিত্রার ছবি। এরই প্রেক্ষাপটে আসে ২১শে ফেব্রুয়ারি। পূর্ব পাকিস্তানে ২১শে ফেব্রুয়ারি মহাসমারোহে পালিত হচ্ছে শুনতে পেয়ে করাচিতেও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালি ছেলেরা বাঙালি সমিতির মাধ্যমে জোরেশোরে ২১শে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠান পালন করে। দুদিন অনুষ্ঠান হয়। এক দিন ছিল আলোচনা অনুষ্ঠান। আরেক দিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দুদিনই অনুষ্ঠান শুরু হয় আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি গান দিয়ে।

আজাদ এ অনুষ্ঠান নিয়ে একটু বেশিই মাতামাতি করে। ক্লাস করার সময় তো সে পায়ই না, মাকে চিঠি লেখার সময়ও সে করে উঠতে পারে না। পরে, ২৬শে ফেব্রুয়ারিতে সময় করে নিয়ে মাকে সে লেখে :

মা,

চিঠির উত্তর দিতে অনেক দেরি হয়ে গেল। মাফ কেরো। একে ত পরীক্ষা কাছে অর্থাৎ ১২ জুন শুরু হবে। এদিকে ২১ এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি সমিতির দুইটা ফাংকশন করতে হয়েছে। তাই চিঠি লেখার এমনকি ক্লাস করার সময় পাই নাই। যা হোক, আমি এখন ভালোই আছি। পড়াশুনা শুরু করি নাই। করব। দোয়া কোরো। তুমি কেমন আছ, চিঠির উত্তরে জানাইও। খাওয়া-দাওয়া ঠিকমত কোরো। এবং বসন্তের টিকা মনে করে নিও।

আর সেই যে একটি মেয়ের কথা লিখেছিলাম, ওর বিয়ে হয়ে গেছে। জীবনের একটা বিরাট দিক আমি হারালাম, আর পাব না। আমি বুঝতে পারছি না আমার সব ব্যাপারে কপাল খারাপ! জীবনে শান্তি বোধহয় মৃত্যু পর্যন্ত পাব না। দোয়া কোরো যেন কিছু মনে শান্তি পাই। চারদিক থেকে অশান্তি আমাকে ঘিরে রেখেছে। যা হোক, এখন আসি।

ইতি তোমার আজাদ

এ চিঠির জবাবে মা লেখেন, 'ফাংশন নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার দরকার নাই।' আজাদকে তিনি মনে করিয়ে দেন, করাচিতে তাকে পাঠানো হয়েছে লেখাপড়া করার জন্যে। ভালো রেজাল্ট করার জন্যে। অন্য কোনো কিছু করে সে যেন সময় নষ্ট না করে। মা আরো লেখেন, 'পড়াশোনা করে মানুষ হয়ে তুমি মাকে খাওয়াবে, পরাবে ভালো রাখবে, এ আশায় আমি তোমাকে পড়তে বলছি না। তোমার নিজের জন্যেই তুমি পড়াশোনা করবে। ভালো রেজাল্ট করবে। মানুষের মতো মানুষ হবে। মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।'

১৪

চৌধুরী সাহেব আজাদকে করাচি পাঠিয়েছিলেন আসলে দুটো উদ্দেশ্যে। এক. ছেলের ভালো লেখাপড়া হোক। দুই. আজাদের মা দুর্বল হোক। প্রথমটা হয়তো ভালোই চলছে, কিন্তু দ্বিতীয়টা? সাফিয়া বেগম কি তাঁর বশ্যতা স্বীকার করবে না! তাঁর পায়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করবে না! ফরাশগঞ্জের বাসা থেকে এসে এই ইস্কাটনের বাসায় উঠবে না! তাহলে কীভাবে তাকে বশ্যতা স্বীকার করানো যায়? তাঁর কুবুদ্ধিদাতারা পরামর্শ দিল, 'এই সুযোগ, আজাদের মাকে ফরাশগঞ্জের বাসা থেকে উচ্ছেদ করে দিন। বাসা ভাড়া নিয়ে থাকুক ঢাকায়, সব তেজ গলে পানি হয়ে যাবে। বাপ বাপ করে চলে আসবে আপনার পা ধরে ভিক্ষা মাগতে। ও ভেবেছে কী! সম্পত্তিগুলো সব ওর নামে বলে ওগুলোর মালিক ও হয়ে গেল! ও যা খুশি তা করতে পারবে! ওকে একটু বোঝানো দরকার যে ঢাকা শহরটা এখনও চৌধুরীর কথায় চলে। চৌধুরী যা চাইবে, তা-ই হবে।'

চৌধুরী এক রাতে আসেন ফরাশগঞ্জের বাসায়। নিচের ঘরে বসেন। আজাদের মা তখন এশার নামাজ পড়া শেষে তেলাওয়াত পড়ছিলেন। তাঁর কাছে দৌড়ে যায় জায়েদ। 'আম্মা আম্মা, আজাদ দাদার আব্বা আইছে।'

'কে?'

'চৌধুরী সাবে।'

'কেন এসেছে? তাকে যেতে বল। তুই বের হ ঘর থেকে। আমি দরজা আটকে দেব। তুই গিয়ে বল আমি দেখা করব না।'

জায়েদ নিচে নামে। চৌধুরী সাহেবকে জানায় সাফিয়া বেগমের বক্তব্য : 'এক্ষুন আপনেরে চইলা যাইতে কইছে, ঘরে খিল দিছে, আর কইছে, জীবনেও আপনের মুখ দেখব না।'

চৌধুরী বলেন, 'জায়েদ, শোনো, আজাদের মাকে বলো, সাত দিন সময় দিলাম, সাত দিনের মধ্যে আমার সাথে দেখা করে আমার পায়ে ধরে মাফ না চাইলে আমি এই বাড়ি থেকে সবাইকে তাড়িয়ে দেব। বুঝলে?'

জায়েদ চুপ করে থাকে।

'বোঝো নাই। তোমার আম্মাকে বলবা আমার সাথে দেখা করে মাফ চাইতে। না হলে এ বাসা থেকে বের করে দেব।' চৌধুরী সাহেব গটগট করে চলে যান।

আজাদের মা সব শুনতে পান জায়েদের কাছ থেকে। কিন্তু তিনি অনন্যোপায়। কী করবেন? চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করার প্রশ্নই আসে না। মাফ চাওয়া? জীবন থাকতে নয়। আর এ বাড়ি ছেড়ে যাওয়া? যেতে হলে যাবেন।

আজাদকে খবর পাঠানো যায়। সেটাও উচিত হবে না। কারণ তার পরীক্ষা চলছে।

একদিন সত্যি সত্যি গুণ্ডাপাণ্ডা চলে আসে ফরাশগঞ্জের বাসায়। এ বাসা ছাড়তে হবে। আজই। এখনই।

আজাদের মা রুখে দাঁড়ান, 'ফাজলামো পেয়েছ তোমরা, এটা আমার বাসা, কেন আমি বাসা ছাড়ব, ছেড়ে পাঁচ-পাঁচটা ছেলেমেয়ে নিয়ে কোথায় যাব?'

গুণ্ডারা বলে, 'এটা যে আপনার বাড়ি, কোনো প্রমাণ আছে?'

প্রমাণ তো সাফিয়া বেগম সঙ্গে রাখেননি। ইস্কাটনের বাড়ি, এ বাড়ি, গেন্ডারিয়ার আরো আরো সম্পত্তি সব তাঁর নামে। এটা তিনি জানেন। কিন্তু দলিল তো একটাও তাঁর কাছে নাই। আর এদিকে গুণ্ডারাও কোনো কথা শুনছে না। তারা জিনিসপত্র ধরে একটা একটা করে নিচে রাস্তায় নামিয়ে দিচ্ছে। আজাদের মায়ের মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। কিন্তু মাথা গরম করলে তো চলবে না। উপায় একটা বের করতে হবে। তিনি বের হন। পাশের একটা বাসায় গিয়ে ফোন করেন পুলিশের ডিআইজি আলম সাহেবকে। আলম সাহেব লোক ভালো, তাঁর পূর্বপরিচিত, আর তাঁর গত ক বছরের দুর্দিনে তিনি মাঝে মধ্যে এসে খোঁজখবর নিয়ে গেছেন। আলম সাহেবকে পাওয়া যায়। তিনি ঘটনা শোনেন। এক্ষুনি কী করা যায় তার উপায় করবেন বলে আশ্বাস দেন। কিন্তু তাঁর পক্ষেও বেশি দূর তৎপরতা করা সম্ভব হয় না। ইউনুস চৌধুরীর সখ্য গভর্নর মোনায়েম খাঁ পর্যন্ত, তিনি দাবি করেছেন এই বাড়ি তাঁর, আর সাফিয়া বেগম এটায় অন্যায়ভাবে জোর করে বসবাস করছে। তাদের হটিয়ে দেওয়াটাই হলো ন্যায়। ডিআইজি আলম সাহেব ফরাশগঞ্জের বাসায় চলে আসেন। তিনি উচ্ছেদ করতে আসা গুণ্ডাপাণ্ডাদের বলেন

কোনো রকমের জুলুম জবরদস্তি না করতে। গু ণ্ডারা বলে, 'এটা আপনাকে কইয়া দিতে হইব না, আমগো ওপর হুকুম আছে, আমরা কাউরে অপমান করুম না।' আলম সাহেব সাফিয়া বেগমকে জানান তাঁর ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কথা, ক্ষমা চান তাঁর কাছে। সাফিয়া বেগম বলেন, 'এখন এই ছোট ছোট বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে আমি কই যাব। একটা বিহিত করে দেন ভাই।'

আলম সাহেব বলেন, 'ঠিক আছে, আমি দেখছি কোনো বাসা ভাড়া পাওয়া যায় কি না।' জুরাইনের মাজারের সামনে একটা ছোট্ট বাসা খালি পাওয়া যায়। রাস্তার ওপর সব জিনিসপাতি ছড়ানো, উপায়ান্তর না পেয়ে সাফিয়া বেগম জুরাইনের বাসায় এসে ওঠেন। টিনের ঘর। মেঝেটা অবশ্য পাকা। সেটাই কিছুটা সান্ত্বনা। দুটোমাত্র ঘর। তার মধ্যে এতগুলো মানুষ। কোনো আসবাবপত্র নাই। থালা-বাসন হাঁড়ি-পাতিল কিছু আনা গেছে। তাতে রান্না চড়াতে হয়। আবার গয়নার বাক্সে হাত দেন সাফিয়া বেগম। আলম সাহেব অবশ্য কিছু টাকা ধার দিয়ে গেছেন। তাঁরই লোক দিয়ে দুটো সস্তা খাট আর এটা-সেটা জিনিসপাতি কেনানো হয়।

জায়েদের বড় কান্না পায়। সে হঠাৎ করে আবার, যেমন তার হয়েছিল মায়ের মৃত্যুর পরে, সবকিছুকে নীল দেখতে থাকে। জুরাইনের এই উপশহর ধরনের পরিবেশ, চিকন রাস্তা, ঘিঞ্জি হয়ে উঠতে থাকা ঘরবাড়ি, আর তাদের ভাড়া করা এই ছোট্ট বাসা সব যেন নীল। নিজেকে তার মনে হয় বড় অভাগা। তার মা নাই। বাবা থেকেও নাই। খালার কাছে আছে তারা, আর খালার ওপর একে একে কত গজব নেমে আসছে। এই এতটুকুন ফকিরের বাড়ির মতো বাড়িতে তারা থাকবে কেমন করে!

দিন যায়। তারা জুরাইনের বাসা ছেড়ে আরেকটু ভালো দেখে একটা বাড়িতে ওঠে মালিবাগ মসজিদের সামনে। এখানে তবু আজাদকে রাখার একটা পরিসর মিলবে।

সাফিয়া বেগম কিন্তু আজাদকে তাঁর এইসব বিপর্যয়ের কথা কিছুই জানতে দেন না। কারণ ছেলের পরীক্ষা। শুধু আজাদকে চিঠি লিখে জানান, পরীক্ষা শেষে সে যেন প্রথমে তার বাবার কাছে যায়, দাদা-দাদির কাছে যায়, তাঁদের সালাম করে। কারণ এটাই হলো সাফিয়া বেগমের জীবনের বড় বিজয় যে তাঁর ছেলেকে তিনি লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতে পেরেছেন।

পরীক্ষা শেষ করেই আজাদ ছুটে আসে ঢাকায়। উফ্। কী দম বন্ধ করা সময়ই তার গেছে এই করাচির দিনগুলোতে। মধ্যখানে সে অবশ্য ছুটিছাটায় এসেছে দুবার। প্লেনের টিকেটের দাম বেশি হওয়ায় ঘন ঘন আসা সম্ভব হয় নি। এসে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করা, আড্ডা দেওয়া ইত্যাদি করতে না করতেই আবার এসে গেছে ফিরে যাওয়ার তারিখ। এবার সে ছুটি পাবে বেশ কিছু দিনের জন্যে। গ্রাজুয়েশনের জন্য পরীক্ষা হয়ে গেল। এরপর মাস্টার্স। বিমান যখন ঢাকা এয়ারপোর্টের রানওয়ে স্পর্শ করে, সঙ্গে সঙ্গে এক অনাবিল আনন্দে আজাদের হৃদয় ওঠে ভরে। সে নিজে নিজেই হেসে ওঠে।

মাকে সে চিঠি লিখেছিল ফেরার দিনক্ষণ জানিয়ে। সেটা সে লিখেছিল ফরাশগঞ্জের ঠিকানায়। জায়েদ পোস্টম্যানকে বলে রেখেছিল, সাফিয়া বেগমের নামে কোনো চিঠি এলে যেন মালিবাগের বাসায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আজাদ তো আর সেটা জানে না। সে এয়ারপোর্টে দেখতে পায় জায়েদ দাঁড়িয়ে। জায়েদ 'দাদা দাদা' বলে জড়িয়ে ধরে আজাদকে। আর আজাদকে দেখা যাচ্ছে কত সুন্দর। ফিটফাট পোশাক, গলায় টাই ঝুলছে, জায়েদের কিছুটা অস্বস্তি লাগে, ভেতর থেকে শ্রেণীভেদটা একটুখানি উঁকি দেয়। কিন্তু সেও সাময়িক। আজাদ দাদা তার আগের মতোই আছে।

'চল চল, একটা ট্যাক্সি নিয়ে চল বাসায় যাই। মা নিশ্চয় অস্থির হয়ে আছে। ফ্লাইটটা একটু ডিলে হয়েছে তো'-আজাদ তাড়া লাগায়।

তারা এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে আসে। ট্যাক্সি ভাড়া করতে হবে।

প্রত্যেকবার এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এই জায়গাটায় দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে কী এক ভালো লাগায় আজাদের অন্তরটা ভরে ওঠে। এই নীল আকাশ, ওই সবুজ গাছ, এই বেবিট্যাক্সি আর ট্যাক্সিঅলাকে তার কতই না আপন বলে মনে হচ্ছে।

জায়েদ ট্যাক্সিওয়ালাকে বলে, 'যাইব, ইস্কাটন?'

'ক্যান রে, ইস্কাটন ক্যান। ফরাশগঞ্জ যাব'-আজাদ বলে।

'আম্মা আপনেরে ইস্কাটনে উইঠা রেস্ট-টেস্ট লইয়া তারপরে যাইতে কইছে আমগো বাড়ি'-জায়েদ বলে।

'আমাকে রেস্ট নিতে হবে ইস্কাটনে? কী যে বলিস না তুই। চল চল ফরাশগঞ্জ।'

জায়েদ কী বলবে আজাদকে? তারা যে ফরশগঞ্জের বাসা থেকে বিতাড়িত, এটা তো আজাদ জানে না। তাকে জানানোর কাজটা কে করবে?

ট্যাক্সি চলছে।

আজাদ দু চোখ ভরে দেখে ঢাকা শহর। আহ্, সেই পরিচিত রাস্তাঘাট। ফার্মগেট, কাওরানবাজার। সেই রিকশা, সেই ইপিআরটিসির বাস। সেই গরিব গরিব ট্রাফিক পুলিশের মুখ।

'দাদা, আম্মায় কইছে আগে ইস্কাটনে গিয়া আপনে দাদা-দাদিরে সালাম করবেন। তারপর বিকালবেলা আমি আইসা আপনারে আমগো বাড়িতে নিয়া যামু।'

'আরে, কথা বেশি বলিস কেন। এই চলো সোজা ফরাশগঞ্জ।'

জায়েদ তো আজাদের সঙ্গে তর্ক করতে পারে না। খানিক পরে সে বলেই দেয়, 'দাদা, আমরা তো আর ফরাশগঞ্জ থাকি না, মালিবাগ থাকি।'

'কেন?'
'আমগো তাড়ায়া দিছে।'
'কে?'
'গুণ্ডাপাণ্ডা আইসা।'
'কী বলিস?'
'জুরাইনে একটা টিনের ঘর ভাড়া লইছিলাম। সেইখানে থাকনের মতো অবস্থা ছিল না। সেইখান থাইকা অহন আইয়া পড়ছি মালিবাগ। মসজিদের সামনে।'
আজাদ গম্ভীর হয়ে যায়। তার মুখ দিয়ে আর কোনো রা সরে না।
মালিবাগের বাসার কাছে গলির মুখে ট্যাক্সি এসে থামে। এর পরে আর ট্যাক্সি যাবে না। জায়েদ তার সুটকেস নিয়ে আগে আগে হাঁটে। এত ছোট বাসা, আসবাবপত্র নাই বললেই চলে, গলির ভেতরে ঢুকতে হয়, এসব দেখে সে ভড়কে যায়। মা কিন্তু হাসিমুখে তাকে বরণ করেন।
আজাদ গম্ভীর স্বরে বলে, 'তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে, আমাকে বলো নাই কেন?'
মা হাসেন। বলেন, 'তোর পরীক্ষা ছিল না বাবা! এটা এমন কি! এই বাসা তো খারাপ না। চৌধুরী চেয়েছিল আমাদের হার মানাতে। ভেবেছিল বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার কথা বললে আমি তার পায়ে গিয়ে পড়ব। আমি তো সেই পদের না। আমি যাইনি। আমারই জিত হয়েছে।'
'কিন্তু তোমাদের গুণ্ডা দিয়ে তাড়িয়ে দিল, তার এত বড় সাহস। আমার রিভলবারটা এনেছ না? কই সেটা।'
মা আরো শান্তভাবে হাসেন। বলেন, 'রিভলবার দিয়ে কী করবি?'
'আমি যাই তার কাছে। গিয়ে জিজ্ঞেস করি, তার স্ত্রীকে অপমান করার আগে সে ভেবেছে কি ভাবে নাই যে তুমি আমার মা। আমার মাকে অপমান করে, তার এত বড় সাহস।' আজাদ উঠে পড়ে-'ডালু কই, জায়েদ আমার রিভলবার কই।'
মা তার হাত ধরেন। বলেন, 'খবরদার আজাদ, মাথা গরম কোরো না, সে আমার কিছু না হতে পারে, সে তোমার বাবা। স্বামী-স্ত্রী ছাড়াছাড়ি হতে পারে, কিন্তু বাপ-ছেলেতে কখনও ছাড়াছাড়ি হয় না। সে তোমার বাবাই। নিজের বাবাকে অপমান করতে হয় না।'
'না, আমি আজকা হেরে মাইরাই ফেলামু।' রাগে আজাদের মুখ দিয়ে ঢাকাইয়া বাক্য বেরুতে থাকে।
'এদিকে আসো। এই আমার মাথার কিরা লাগে। বাপের সাথে গণ্ডগোল কোরো না। এটা তার আর আমার ব্যাপার। এর মধ্যে তোমার আসার দরকারই নাই।'
আজাদ রাগে ফোঁসে। কিন্তু কিছুই আর করার নাই। মা তাকে মাথার কিরা দিয়েছেন। সে সবকিছু করতে পারে, মায়ের মাথার কিরার অবাধ্য তো হতে পারে না। মা যে কথাটা খুবই গুরুত্বের সঙ্গে বলছেন, এটা বোঝা যায় তার তুই থেকে তুমিতে নেমে আসা সম্বোধনে।
মা বলেন, 'এত দিন পরে এসেছ, যাও, হাত-পা ধোও, জিরিয়ে নাও। তোমার জন্যে ভাত-তরকারি রেঁধে রেখেছি। খেতে বসো।'

১৫

কিছুদিন ছুটি কাটিয়ে আজাদ আবার চলে আসে করাচিতে। এমএ-তে ভর্তি হয়। একটা ব্যবসাও সে শুরু করে সেখানে। ব্যবসায় সে ভালো করবে, এই রকম আশা তার ছিল। এ সময় সে মাকে মাঝে মধ্যে টাকা পাঠাত। মাকে সে চিঠি লিখত নিয়মিত, আর সেসব চিঠিতে মাকে বারবার করে অনুরোধ করত মা যেন তাঁর শরীর ও স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেন। লিখত, মা যেন টাকার জন্যে চিন্তা না করেন। দরকার হলেই যেন ব্যাঙ্ক থেকে সোনা তুলে মা বিক্রি করে দেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যয়নির্বাহ করেন। সে লিখেছিল : 'টাকার দরকার হলে যদি তুমি বিক্রি না করো, তবে আমি দুঃখিত হব। এইসব গয়না কারু জন্যে রাখতে হবে না। এই আমার অনুরোধ।' কিন্তু মা সোনায় হাত দিতে চাইতেন না। এই সোনা তো আসলে আজাদের বউয়ের হক। ছেলের বিয়ের সময় কনেকে সোনা দিয়ে সাজাতে হবে না!
করাচিতে হোস্টেল ছেড়ে দিয়ে একটা ছাট বাসা ভাড়া নিয়েছিল আজাদ। মাকে লিখেছিল,

মা,
আমি ভালোই আছি। আমার জন্য কোন চিন্তা করিও না। চিঠি লিখতে অবশ্য দেরি হয়ে গেল।
দোয়া কোরো, এখনো কোনো অসুবিধা হয় নাই। ব্যবসা ইনশাল্লাহ ভালোই চলবে মনে হয়। আমি ছোট্ট একটা বাড়ি নিয়েছি। কয়েক মাস পরে বড় বাড়ি নেব, তখন তোমাকে নিয়ে আসব। আর এই মাসের শেষের দিকে তোমাকে আমি কিছু টাকা পাঠাব। আগেও

পাঠাতে পারি, ঠিক নেই। তবে দেরি হবে না। তুমি কোথায় থাকবে তখন চিঠি দিয়ে জানাইও। এমএতে ভর্তি হয়ে গেছি।
আর বিশেষ কিছু লেখার নেই। দোয়া কোরো যেন ইনশালাহ ব্যবসাতে উন্নতি করতে পারি।
ইতি
আজাদ
ঠিকানা
AZAD
646, C, CENTRAL COMMERCIAL AREA
PECHS
KARACHI 29

এই চিঠি লিখিত হওয়ার ২০ বছর পর জায়েদ আজাদের এইসব চিঠি পড়ে, আর তার মনে নানা প্রতিক্রিয়া হয়। কোনো চিঠিতে আছে, 'মা, টাকার অভাবে তোমাকে চিঠি লিখতে পারি নাই।' কী রকম অর্থকষ্টটাই সহ্য করতে হয়েছিল আজাদকে যে একটা চিঠি পোস্ট করার মতো টাকা তার ছিল না। জায়েদ একটা এরোগ্রাম মেলে ধরে। এটায় খাম আর চিঠি একই কাগজে লিখতে হতো। তাতে বোধ করি ডাকখরচ কম পড়ত।

BY AIR MAIL
INLAND
AEROGRAM
If anything is enclosed
this letter will be sent by ordinary m ail

ইংরেজি, উর্দু আর বাংলায় লেখা পাকিস্তান। পোস্টেজ ১৩ পয়সা। আর তাতে টিকেটের ঘরের মতো চৌকোয় যে ছবিটা আঁকা, সেটা পূর্ব বাংলার-নারকেলগাছ, ধান বা পাটক্ষেত আর নদীতে পালতোলা নৌকা।
মাত্র ১৩ পয়সা জোগাড় করতেও কষ্ট হয়েছিল আজাদ দাদার!

করাচি বিশ্ববিদ্যালয়েই আজাদের পরিচয় ঘটে আবুল বাশারের সঙ্গে। টাঙ্গাইলের সম্পন্ন ঘরের ছেলে বাশার। পড়তে গেছে করাচিতে। বাঙালি সমিতি করে। সমিতির অনুষ্ঠানের জন্যে খায়খাটুনি করে। আর তার আছে বই পড়ার অভ্যাস। আজাদের রুমে এসে দেখে প্রচুর বই, নানা রকমের ইংরেজি উপন্যাস, বাশার ধার নেয় সেসব বই। আবার সময়মতো ফিরিয়েও দেয়। এভাবেই আজাদের সঙ্গে বাশারের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়।
বাঙালিরা যখন একত্র হয়, তখন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হয়। শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা দাবি ঘোষণা করেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তাদের সমাবর্তন উৎসবে মোনায়েম খানের হাত থেকে সনদ নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আন্দোলন করেছে, ছাত্রদের ওপর হামলা হয়েছে, গ্রেপ্তার হয়েছে বহু ছাত্র, ৬ দফার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে, শেখ মুজিব প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় জনসভা করে ৬ দফার পক্ষে প্রচার চালাচ্ছেন, আইয়ুব খান দমননীতির আশ্রয় নিচ্ছেন, শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সঙ্গে আরো আরো নেতা আর কর্মীকে, তাঁর মুক্তি ও ৬ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল পালিত হয়েছে, হরতালে গুলি চলেছে, ঢাকা নারায়ণগঞ্জে বহু শ্রমিক হতাহত -ঘটনা ঘটতে থাকে দ্রুত। এইসব নিয়ে বাঙালি ছাত্ররা তর্ক-বিতর্ক করে, বাম-ঘেঁষা ছাত্ররা মনে করে, আওয়ামী লীগ বুর্জোয়াদের দল, তাদের দিয়ে জাতীয় মুক্তি অসম্ভব।
ইউনুস আহমেদ চৌধুরী জার্মানি যান। সেখান থেকে তিনি চিঠি লেখেন সাফিয়া বেগমকে। বড়ই আবেগপূর্ণ চিঠি। সাফিয়া বেগমকে তিনি সম্বোধন করেন প্রাণের পুতুল বলে। তিনি তাঁর জন্যে হা-হুতাশ করেন, নিজের ভুলের কথা স্বীকার করেন, তাঁকে ছাড়া যে তার চলছে না, তিনি তিষ্ঠাতে পারছেন না, এটা তিনি বলেন বড়ই আকুল স্বরে। তিনি সবকিছু ভুলে আবার সাফিয়াকে তাঁর কাছে আসতে বলেন। মিনতি করেন আবার সবকিছু নতুন করে শুরু করতে।
চিঠি পেয়ে সাফিয়া বেগম আরো কঠিন হয়ে পড়েন। না, মিষ্টি কথায় ভোলা যাবে না। কত কষ্ট করে ছেলেকে নিয়ে তিনি একা দিনগুজরান করছেন। ছেলেকে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন। ছেলেকে তিনি ম্যাট্রিক পাস করিয়েছেন, আইএ পাস করিয়েছেন, বিএ পাস করিয়েছেন, এখন ছেলে এমএ পড়ছে। কত কষ্টই না তাঁর হয়েছে এই কটা বছর। গয়না বিক্রি করে পুঁজি জোগাড় করে ব্যবসা করতে দিয়েছেন একে-ওকে। কিন্তু টাকা লগ্নিই সার হয়েছে, লাভ তো দূরের কথা, তিনি আসলই ফিরে পাননি। তাঁর ছেলেও কত কষ্ট করেছে। টাকার অভাবে চিঠি পর্যন্ত লিখতে পারেনি। শেষতক তাকে ব্যবসায় নামতে হয়েছে। এত কষ্ট সহ্য করে এতটা কাঁটা-বিছানো পথ পাড়ি দিয়ে অনেক রক্ত ঝরিয়ে যখন প্রায় মসৃণ পথে তাঁরা এসে পড়েছেন, তখন কিনা তিনি নতি স্বীকার করবেন!
আমেরিকা গিয়েছিলেন ইউনুস চৌধুরী। সেখান থেকেও তিনি সাফিয়াকে চিঠি লিখেছেন ভয়ানক কাকুতি-মিনতি করে। লিখেছেন, 'হাজার হাজার মাইল দূরে এক অচেনা

জায়গায় বসে আর কাউকে নয়, শুধু তোমাকে মনে পড়ছে বলে তোমাকেই চিঠি লিখতে বসেছি। মানুষ মাত্রই ভুল করে। আমিও একটা ভুল করেছি। তুমি কি আমাকে ক্ষমা করে দিতে পার না? আমাদের আগেকার সুখের জীবনে আবার কি আমরা ফিরে যেতে পারি না? আমি যেখানেই যাচ্ছি, প্রাণে তো সুখ পাচ্ছি না। তোমাকে ছাড়া এ জীবনে আর সুখ পাব না, এটা নিশ্চিত। শুধু মৃত্যুর পরে যেন হাশরের ময়দানে তোমার মুখটা আমি দেখতে পাই। যেন তোমার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারি।'

চিঠি পেয়ে সাফিয়া বেগমের সমস্তশরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে যায়। তিনি খানিকক্ষণ ঝিম ধরে বসে থাকেন। লোকটা এখন মৃত্যুর পরে হাশরের ময়দানে তাঁর দেখা পাবে বলে অপেক্ষা করছে। নতুন বিয়ে, নতুন সম্পর্ক-এসব কিছুতে তাঁর আত্মা সুখ পেল না! পাওয়ার তো কথা না। নিজের ছেলে, নিজের স্ত্রীকে ফেলে যারা অন্যের কাছে যায়, জীবনে সুখ কিংবা স্থিতি তারা কে কবে কোথায় পেয়েছে! মরীচিকার দিকে ছুটলে তো তৃষ্ণা মেটে না। বরং বিভ্রান্তি আর পণ্ডশ্রমে জীবন লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় মাত্র।

কী করবেন সাফিয়া বেগম? ফিরে যাবেন চৌধুরীর কাছে? ফিরে যাবেন ইস্কাটনের বাড়িতে? কর্তৃত্ব তুলে নেবেন ওই বাড়ির! যে চিত্রা হরিণটা তাঁর হাতে সবুজ গাছের পাতা খাওয়ার জন্যে রোজ ভোরবেলা কাতর নয়নে তাকিয়ে থাকত, সে যে তাঁকে তার নীরব চোখের ভাষায় ডাকছে। পোষা কুকুর টমি যে রোজ দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে তাঁর ঘ্রাণ শুঁকবে বলে! গৃহপরিচারিকা জয়নব নাকি এখনও রোজ রাতে মিহি সুরে কাঁদে! আত্মীয়স্বজন আশ্রিতেরা নাকি তাঁর অনুপস্থিতির কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

সাফিয়া বেগমের মনটা দুর্বল হয়ে পড়ে। সারা দিন তিনি ঘোরের মধ্যে থাকেন। রাত্রিবেলা ভালো করে ঘুম হয় না তাঁর। ভোরবেলা ফজরের নামাজ পড়ে আবার তিনি চিঠিটা মেলে ধরেন। আগাগোড়া পড়েন। পড়তে পড়তেই সেই নাট্যদৃশ্য আবার তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে : ষোলশ গোপিনী টানাটানি করছে কৃষ্ণরূপী চৌধুরীকে; মুহূর্তে তাঁর সমস্ত সত্তাজুড়ে নাছোড় প্রত্যাখ্যানের শক্তি জেগে ওঠে, সমস্ত আকাশ-বাতাস যেন বলে ওঠে : না। তিনি ফিরে যেতে পারেন না। চৌধুরীর এই হলো কৌশল। এভাবেই সে একের পরে এক নারীকে মোহজালে আটকে ফেলে। তাঁর এই ছল সাফিয়া বেগমের ভালো করেই জানা আছে।

আর তা ছাড়া তাঁর প্রতিজ্ঞার একটা দাম আছে না? তিনি চৌধুরীকে বলেছিলেন ওই অনৈতিক সম্পর্কটাতে না যেতে, স্পষ্ট ভাষাতেই তো জানিয়েছিলেন, ওই মহিলাকে বিয়ে করার একটাই মানে, মৃত্যুর পরেও সাফিয়ার মুখ আর চৌধুরী দেখতে পাবে না।

সাফিয়া বেগম তাঁর স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের পরে আরো ২৪ বছর বেঁচে ছিলেন, তিনি তাঁর কথাটা আশ্চর্য রকমভাবে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। একই শহরে তাঁরা ছিলেন ২৪টা বছর, কখনও কখনও একই পাড়াতেই, একই মাহফিলে, একই মাজারে, একই মিলাদে দুজনই গিয়েছেন, এ রকম একাধিকবার হয়েছে, কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্য যে, কেউ কারো মুখ দেখতে পাননি।

জায়েদ এ কথা স্মরণ করে। তার মনে পড়ে, আম্মা বলতেন, পাবে না রে, পাবে না, আমার মুখ সে বেঁচে থাকতে দেখতে পাবে না।

১৬

সাফিয়া বেগমের শরীরটা খারাপ। শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। রাত্রিবেলা কাশির গমকে ঘুম আসতে চায় না। একটুক্ষণ চোখ জোড়া লাগতে না লাগতেই আবার কাশির চোটে তিনি জেগে ওঠেন। বুকের মধ্যে টান পড়ে। তাঁর পাঁজর হাপরের মতো ওঠানামা করে। হা করে তিনি শ্বাস নেন, শ্বাস ছাড়েন গোঁয়ারের মতো। চোখ পানিতে ভরে ওঠে। বিছানায় বসে থাকেন। তাঁর অসুখটা যে বেড়েছে, এই খবর তিনি আজাদকে জানাননি। খবর পেলে ছেলে উতলা হয়ে পড়বে, পড়াশোনা বাদ দিয়ে ছুটে আসবে মাকে দেখতে। শরীর তো যন্ত্রেরই মতো, মাঝে মধ্যে একটু বিগড়াবেই। তাই নিয়ে একেবারে ডাক্তার ডাকো রে, হাসপাতালে চলো রে, আত্মীয়স্বজনদের খবর দাও রে করে জগৎটাকে আছড়ে-পিছড়ে মারার তো দরকার নাই। নীরবে সহ্য করতে পারলে আর কিছুই লাগে না।

কিন্তু এবার ব্যারামটা তাঁকে সাঁড়াশির মতো করে চেপে ধরেছে। মনে হচ্ছে, এতটুকুন শরীর এতটা ধকল এ যাত্রা আর সইতে পারবে না। ডালু ডাক্তার ডেকে এনেছিল। ডাক্তার ওষুধ দিয়েছেন। ভালো ভালো খেতে বলেছেন। অসুখ বেশি হলে, বলেছেন, হাসপাতালে নেওয়ার জন্যে। কিন্তু সাফিয়া বেগম টাকা খরচ করতে চান না। ব্যাঙ্কের ফোল্ডে তাঁর গয়না জমা আছে, এখন তাঁর চিকিৎসার জন্যে সেই গয়নার কিছুটা তুলে বেচতে তাঁর মন থেকে সাড়া আসে না। ছেলের পড়ালেখার খরচের জন্যে টাকা খরচ করা যায়, গয়নাও বিক্রি করা যায়, কিন্তু নিজের চিকিৎসার জন্যে কি তা করা যায়? গয়না কি তাঁর, নাকি তাঁর ছেলের বউয়ের?

আজকের রাতটা মনে হয় আর পার হবে না-এতটাই কষ্ট হচ্ছে সাফিয়া বেগমের। বাইরে ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে, বাতাসে জলকণা উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে, তাতেই তাঁর শ্বাসকষ্টটা গেছে বেড়ে। একটা ওষুধ আছে, তার ভাপ মুখে টেনে নাকে নিতে হয়, দাম বেশি বলে তিনি সেটা সাধারণত ব্যবহার করেন না, সেটা এখন হাতের কাছে থাকলে ভালো হতো।

বিছানায় বসে থেকে অতিকষ্টে তিনি শ্বাস টানেন। আজকের রাতটা কি আর পার হবে না?
তখন তাঁর খুব আজাদকে দেখতে ইচ্ছা হয়। শরীরটা তাঁর আর চলছে না, কী জানি যদি না টেকে, যদি আজ রাতেই তাঁর মৃত্যু লেখা থাকে, তাহলে তো আর আজাদের মুখটা তিনি মরার আগে দেখতে পাবেন না। ছেলেকে খবর না দেওয়াটা মনে হয় ভুলই হলো!
শেষরাতে সাফিয়া বেগমের কাশির গমক খুব বেড়ে গেলে তার ভাগ্নি মহুয়ার ঘুম ভেঙে যায়। সে উঠে দেখে, আম্মার প্রাণ বুঝি যায়। সে ডালুকে খবর দিলে ডালু এসে সাফিয়া বেগমকে ঘুমের ওষুধ ডাবল ডোজ খাইয়ে দেয়। কাশি তাতেও কমে না, শরীর নিস্তেজ হয়ে পড়ে, এক সময় সাফিয়া বেগম ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুমের আগে তিনি লা ইলাহা ইলাল্লাহু পড়ে নেন, তাঁর মনে হয়, এই ঘুমই তাঁর শেষ ঘুম, তিনি আর কোনো দিন জাগবেন না, ঘুমের আগে তিনি আজাদের মুখটা মনে করবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তার বড়বেলার চেহারাটা কিছুতেই তাঁর মনে আসে না, কেবল ছোটবেলায় যখন সে কেবল স্কুল যেতে শুরু করেছে, সেই সময়ের চেহারাটা মনে আসে, স্কুলের ব্যাগ কাঁধে, পায়ে কেডস, আজাদ ফিরছে...আজাদকে না দেখেই কি তাঁকে চলে যেতে হবে দুনিয়া ছেড়ে। তাঁর দু চোখ গরম জলে ভেসে যেতে চায়।
ঘুম ভেঙে গেলে তিনি দেখতে পান, তাঁর শিয়রের কাছে বসে আজাদ, তাঁর ধন্দ লাগে। তিনি কি জেগে আছেন, নাকি স্বপ্ন দেখছেন। নাকি এটা ঠিক মরজগৎ নয়, তিনি অন্য কোথাও। শরীর খুবই দুর্বল, জোর পাওয়া যাচ্ছে না একটুও, কিন্তু ধীর গলায় কে যেন ডাকছে, এ যে ঠিক আজাদেরই গলা। তিনি চোখ খোলেন। দেখেন তাঁর মুখের ওপরে আজাদের মুখ। তিনি বলেন, 'আজাদ? কখন এলে বাবা?'
'এই তো এখনই। তুমি ঘুমাও।'
মার মনটা প্রশান্তিতে ভরে ওঠে। ঘুমটা চোখ থেকে পুরোপুরি উবে যায়, তিনি উঠে বসার চেষ্টা করেন। স্বপ্নের মতোই মিষ্টি একটা ব্যাপার ঘটে গেল, তাঁর আজাদ এসে বসে আছে তাঁরই শিয়রের কাছে। মায়ের মনের ডাক সে নিশ্চয় শুনতে পেয়েছে তার মনের গ্রাহকযন্ত্রে। তিনি ওঠার জন্যে মাথাটা তোলেন, হাত দিয়ে বিছানা ধরেন।
আজাদ বলে, 'না, তুমি শুয়ে থাকো। তোমার শরীর এতটা খারাপ, তুমি আমাকে খবর দাওনি কেন। কেন আমাকে লোকমুখে তোমার অসুখের খবর পেতে হলো?
'কী এমন অসুখ। এমনি ভালো হয়ে যাব!'
'এমনি এমনি অসুখ ভালো হয়? তোমাকে হসপিটালে নিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে।'
'তুই এসেছিস। আমি এখন এমনি ভালো হয়ে যাব।'

মা উঠে পড়েন। বলেন, আজাদ এসেছে, আর আমি শুয়ে থাকব নাকি! সবাই তাঁকে নিষেধ করে রান্নাঘরে হেঁশেলের ধারে যেতে, চুলার গরমে তাঁর শরীর খারাপ করবে, কিন্তু কে শোনে কার কথা! তিনি সন্ধ্যার মধ্যেই রান্নাঘরে ঢুকে পড়েন, ছেলের কিছু প্রিয় খাবার আছে, তিনি লেগে পড়েন তারই একটা দুটো পদ রান্নায় মহুয়াকে সাহায্য করতে। ছেলের আকস্মিক আগমনের উৎসাহে শরীরটা তাঁর দাঁড়িয়ে যায়, রান্নাঘরের কাজটা ভালোই এগোয়; কিন্তু রাতের বেলা শরীর তার খাজনা আদায় করে নিতে থাকে, তিনি ভয়াবহ রকম অসুস্থ হয়ে পড়েন।
মহুয়া, কচি কাঁদতে থাকে। আজাদ ছুটে যায় রাস্তায়। একটা ফোন করা দরকার। দরকার একটা অ্যাম্বুলেন্স। মাকে হাসপাতালে নিতে হবে। এক্ষুনি।
অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যায় না। কিন্তু ফোন করে সে তার বন্ধু ফারুকের গাড়িটা পেয়ে যায় ড্রাইভার-সমেত। মাকে নিয়ে সে সোজা চলে যায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সারাটা রাস্তা সে শুধু আল্লাহর নাম জপতে থাকে।
কেবিন খালি পাওয়া যায়। মাকে সে ভর্তি করিয়ে দেয় কেবিনে। সারা রাত সে বসে থাকে মার শয্যাপাশে। রাত বাড়ে। চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে আসে। ঘড়ির কাঁটার টিক টিক আর মায়ের শ্বাস নেওয়ার শব্দ শোনা যায়।
আজাদ আল্লাহকে বলে, 'হে আল্লাহ, আমার মাকে তুমি বাঁচিয়ে রাখো। আমার মা বড় দুঃখী। তিনি আমার জন্যে অনেক দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন। আমাকে কষ্ট করে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। তাঁর কষ্টের পালা তিনি অতিবাহিত করেছেন। এখন আমার পালা। আমি করাচিতে ব্যবসা শুরু করেছি। কিছু কিছু লাভও হচ্ছে। ভবিষ্যতে এমএ শেষ করে পুরোপুরি আয় করতে লেগে যাব। ভালো বাসা নেব। মাকে সেই বাসায় তুলব। মাকে আর কষ্ট করতে হবে না। এই সময়টায় মাকে তুমি নিও না। মাকে বাঁচিয়ে রাখো। তাঁকে সুস্থ রাখো। তাঁকে নীরোগ রাখো। তাঁকে সুখে রাখো। তাঁকে শান্তিতে রাখো।'
আজাদ বিড়বিড় করে এই প্রার্থনা করে আর তার দু চোখের কোল বেয়ে অশ্রু গড়াতে থাকে। নাক দিয়েও জল ঝরতে থাকে টপ টপ করে।
দুদিন পর মা কিছুটা সুস্থ হলে সে মায়ের সামনে হাজির করে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা সোনার গয়না তোলার কাগজ, বলে, 'সাইন করো।'
'কেন, সাইন করব কেন?'
'গয়না তুলতে হবে।'
'না। আমি সাইন করব না।'
'কেন, করবা না কেন?'
'এই গয়না আমার না। আমি এটা আমার চিকিৎসার জন্যে খরচ করতে পারব না।'

'এই গয়না তোমার না? এগুলো না তুমি তোমার বিয়ের সময় পেয়েছিলে, তোমার বাপের বাড়ি থেকে?

'পেয়েছিলাম। কিন্তু এগুলো আমার জন্য খরচের কোনো অধিকার আমার নাই।'

'মানে?'

'এগুলো তোর বউয়ের হক। আমি এগুলো তার জন্যে জমা করে রেখেছি। এগুলো আমি তোর বউয়ের হাতে তুলে দিতে চাই।'

আজাদ কাঁদবে না হাসবে বুঝতে পারে না। এই মহিলা তো আচ্ছা বাতিকঅলা। কবে আজাদ বিয়ে করবে, কবে তার বউ হবে, তার জন্যে সে গয়না জমিয়ে রেখেছে, আর নিজে বিনা চিকিৎসায় মরতে বসেছে।

'দ্যাখো মা। তুমি যদি এখন সাইন করলা তো করলা। না করলে আমিও তোমারই ছেলে। আমার কিন্তু তোমার মতোই জেদ। সোজা দুই চোখ যেদিকে চায় চলে যাব। আর কোনো দিন আসব না। করো সাইন। তোমার এত গয়না দিয়ে কী হবে। দুই ভরি এখন বেচি। বাকিগুলো তো থাকলই।'

মা কাগজে স্বাক্ষর করে দিলে ব্যাঙ্ক থেকে গয়না তুলে দুই ভরি সোনার জিনিস বিক্রি করে দিয়ে বেশ কিছু টাকা জোগাড় করা যায়। তা থেকে চিকিৎসার ব্যয়নির্বাহ করে যা বাঁচে, তা আজাদ তুলে দেয় মহুয়ার হাতে। মায়ের যখন যা লাগে, তা যেন এই টাকা দিয়ে সে কিনে দেয়।

আজাদ ঢাকায় ফিরে এসে যখন হাসপাতাল, ডাক্তার, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত, তখন পূর্ব পাকিস্তান ধীরে ধীরে ফুঁসে উঠছে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়েছে, গ্রেপ্তারপর্ব শুরু হয়ে গেছে। ৬ দফা দাবিও পূর্ববাংলায় জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। রেডিও-টেলিভিশনে রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ করে জারি করা আদেশের প্রতিবাদে এ অঞ্চলের শিল্পী-সাহিত্যিকেরা নানা রকম প্রতিবাদী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এমনকি ঢাকায় বসবাসকারী উর্দুভাষীদের পক্ষ থেকে নয়জন লেখক ও দুটি প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্রপক্ষ সমর্থন করে বিবৃতি দিয়েছেন। যদিও অচিরেই সরকার তাদের রবীন্দ্রবিরোধী আদেশ প্রত্যাহার করে নেয়, তবু সারা প্রদেশে সভা-সমাবেশ-মিছিল চলতেই থাকে।

এইসব ঘটনা নিয়ে আজাদের কোনো কোনো বন্ধু ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মেনন গ্রুপ, মতিয়া গ্রুপ ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গেও সংশিষ্ট কেউ কেউ। আজাদ ব্যস্ত তার মাকে নিয়ে। বন্ধুদের কেউ কেউ ব্যস্ত দেশমাতার জন্যে।

আজাদের আর করাচি ফিরে যাওয়া হয় না। সে সিদ্ধান্ত নেয় যে সে ঢাকাতেই থেকে যাবে। ঢাকাতেই ব্যবসা-বাণিজ্য করবে। পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে এমএটা সম্পন্ন করবে।

মাকে সে জানায় তার সিদ্ধান্তের কথা।

মা বলেন, 'না, কেন তুই যাবি না। আমার জন্যে? না, তা হবে না? আমার জন্যে তোর লেখাপড়ায় ছেদ পড়বে, এটা আমি হতে দেব না। তুই অবশ্যই করাচি যাবি।'

আজাদ বলে, 'না তো, তোমার জন্যে না তো। আমি যাচ্ছি না আমার নিজের জন্য। করাচি আমার ভালো লাগে না। পশ্চিম পাকিস্তান আমার ভালো লাগে না। উর্দু বলতে আমার ভালো লাগে না। রুটি-ছাতু খেতে আমার ভালো লাগে না।'

মা বলেন, 'করাচিতে তোর বুঝি খুব কষ্ট হয়?'

আজাদ বলে, 'হয়। কেমন কষ্ট, এটা ঠিক বোঝানো যাবে না। ধরো আমাকে না দেখলে তোমার কষ্ট হয় না? এই রকম কষ্ট। নিজের দেশ হলো আমার নিজের দেশ।'

'পশ্চিম পাকিস্তান আমাদের নিজের দেশ না?'

'না। তুমি ওদেরকে আপন ভাবতে পারো, ওরা ভাবে না।'

'তাহলে তুই কী করবি? যাবি না আর?'

'না। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে যাব 'খন।'

মা মনে মনে খুশি হন। আজাদকে চোখের আড়াল করতে কি তাঁর ভালো লাগে? তবে সেটা তো তাঁর নিজের স্বার্থ। তাঁর নিজের স্বার্থে তিনি ছেলের পড়াশোনার পথে অন্তরায় হতে চান না।

১৭

আজাদ টমাস মানের লেখা দি ম্যাজিক মাউন্টেইন পড়ছিল। সম্প্রতি সে পেঙ্গুইনের মডার্ন ক্লাসিক সিরিজের এ বইটা কিনেছে ৩১১ সরকারি নিউমার্কেটের গ্রীন বুক সেন্টার থেকে। কদিন হলো মায়ের শরীর অনেকটা ভালো। মা আগের মতোই হাঁটাচলা করছেন। ছেলের জন্যে নিজ হাতে ভালোমন্দ কোনো কিছু রাঁধা হয়নি ভেবে তিনি অস্থির। বারবার করে বলছেন, 'ডালু, ও ডালু, একটু বাজার সওদা কর না বাবা। আমি একটু রাঁধি।' আজাদ বলে দিয়েছে, 'খবরদার মা, শ্বাসকষ্ট নিয়ে চুলার ধারে যাওয়া একদম মানা। ডাক্তার শুনলে মেরে ফেলবে।'

মাকে আজকে আর আটকে রাখা যাচ্ছে না। তিনি রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছেন। ভালো ভালো রান্না হচ্ছে।

ডাকপিয়ন চিঠি দিয়ে যায়। আজাদের নামে আসা চিঠি। জায়েদ চিঠিটা গ্রহণ করে। দৌড়ে দিয়ে যায় আজাদকে।

হাতের লেখা দেখেই আজাদ বুঝতে পারে বাশার লিখেছে। চিঠিটা দেখে তার ভালো লাগে। আবার সে খানিক লজ্জিতও বোধ করে। বাশার বেশ কটা চিঠি তাকে লিখল। কিন্তু সে তার উত্তর দিতে পারেনি। কারণ মায়ের অসুখ। তার ব্যস্ততা। আর চিঠি লেখার ব্যাপারে তার আলস্য। করাচি থেকে মাকে সে বহু চিঠি লিখেছে বটে, কিন্তু ঢাকায় এসে বন্ধুকে চিঠি লেখাটার সঙ্গে তার তুলনা চলে না। প্রথমত মানুষ বিদেশে গেলে মারাত্মকভাবে ভুগতে থাকে আত্মপরিচয়ের সংকটে। তার মনে হতে থাকে, সে যেন নাই হয়ে যাচ্ছে। ডুবন্ত মানুষ যেমন খড়কুটো পেলেও আঁকড়ে ধরে, প্রথম প্রথম প্রবাসজীবনে প্রবেশ করা মানুষ তেমনি দু হাতে খুঁজে ফেরে তার যত শেকড়-বাকড় ডালপালা। আমি আছি। আমি আছি। তোমরা আমাকে ভুলো না। আর তা ছাড়া মায়ের সঙ্গে তার যে সম্পর্ক, এটা আর কারো সঙ্গে তার সম্পর্কের পাশে তুল্য হতে পারে না। করাচি থেকে হরতালের দিনগুলোতে মাকে সে একবার লিখেছিল :

মা,

কেমন আছ? আমি ভালোভাবেই পৌঁছেছি। এবং এখন ভালোই আছি। হরতাল বন্ধ হয়ে গেছে। রীতিমতো ক্লাস হচ্ছে। পরীক্ষা শীঘ্রই শুরু হবে। দোয়া কোরো। তোমার দোয়া ছাড়া কোন উপায় নাই। আমি নিজে কী ধরনের মানুষ আমি নিজেই বুঝতে পারি না। আচ্ছা, তুমি বল ত, সব দিক দিয়ে আমি কী ধরনের মানুষ। আমি তোমাকে আঘাত না দেওয়ার অনেক চেষ্টা করি। তুমি আমার মা দেখে বলছি না; তোমার মতো মা পাওয়া দুর্লভ। এই বিংশ শতাব্দীতে তোমার মতো মা যে আছে কেউই বিশ্বাস করবে না। আমি এগুলি নিজ হৃদয় থেকে বলছি, তোমার কাছে ভালো ছেলে সাজবার জন্য নয়। যদি আমি পৃথিবীতে তোমার দোয়ায় বড় বা নামকরা হতে পারি, তবে পৃথিবীর সবাইকে জানাব তোমার জীবনী, তোমার কথা।
আমি ভালো পড়াশুনা করার চেষ্টা করছি।
এবং অনেক দোয়া দিয়ে চিঠির উত্তর দিও।

ইতি তোমার
অবাধ্য ছেলে আজাদ

আজাদ সত্য সত্য বিশ্বাস করে তার মার মতো মা আর হয় না। বিশ্বাস করে এই মায়ের জীবনী লিখিত হওয়া উচিত। সে যদি কোনো দিন নামকরা হয়, তাহলেই কেবল এই মায়ের জীবনী লিখিত হওয়া সম্ভব। সে-ই লিখবে। লোকে পড়বে, দ্যাখো অমন যে বিখ্যাত লোক আজাদ, তার মায়ের আছে সংগ্রামের এক আশ্চর্য কাহিনী। সেই মাকে সে চিঠি না লিখে কি পারে? বাশারকেও সে খুব পছন্দ করে। তার চিঠির উত্তরও সে দিতে চায়। দেওয়া হয়ে ওঠে না আর-কি!
সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে আজাদ বাশারের চিঠি খোলে।
বাশার লিখেছে :

আজাদ,
প্রীতি আর শুভেচ্ছা রইল। একাধিক পত্র লিখেও কোন উত্তর পেলাম না আমরা। রানাও দুঃখ করে কখনও। আশা করি আলাহ্‌তায়ালার কৃপায় ভালো আছ। তোমার ভর্তির কী হলো? বর্তমানে কোথায় আছ আর কীইবা করছ? কিছুদিন পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকোনমিকস ডিপার্টমেন্টের শিক্ষক-ছাত্ররা করাচি এসেছিল ইকোনমিক সেমিনারে। আমরাও তোমাকে আশা করেছিলাম। তাই সেই রাত্রে এয়ারপোর্টেও গিয়েছিলাম রানা আর আমি।
আনোয়ারও তোমাকে স্মরণ করে মাঝে মাঝে। আমরা এক প্রকার। তোমরা কেমন? সামনের জুনের ১০ তাং থেকে আমার এক্সাম শুরু। দোআ কোরো।
যাক্‌। হোস্টেলে তোমার বেশ কিছু টাকা জমা আছে। তুমি একটা অথরাইজড লেটার আমার নামে পাঠিয়ে দিও-লেটারটাতে প্রভোস্টকে এড্রেস করো।
তোমার মা-বাবাকে আমার সালাম দিও। তোমার বন্ধুবান্ধবকে আমার শুভেচ্ছা জানিও। ফরিদের খবর কী? ওকে আমার কথা বোলো।
নববর্ষের শুভেচ্ছা নিয়ে

ইতি
বাশার
পত্রের উত্তর দিও; রানাকে লিখো কিন্তু।

চিঠি পড়ে আজাদের করাচির দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। রানা, আনোয়ার-এরা সবাই তাকে অনেক ভালোবেসে ফেলেছিল। আসলে বাঙালি সমিতি করতে গিয়ে এদের সবার সঙ্গে সে বেশ প্রীতির বন্ধনেই জড়িয়ে গেছে। ওরা এবার পহেলা বৈশাখ নববর্ষে নিশ্চয় বড় অনুষ্ঠান করেছে। ঢাকাতেও ছায়ানট এবার রমনায় বড় করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসর বসিয়েছিল। কেন যে সরকার এসবে বাধা দেয়। বাধা যত বড়

হবে, বাঁধভাঙা স্রোত তত প্রবল হবে। তার সামনে কিছুই টিকবে না। আইয়ুব খান একটা গাধা, মোনায়েম খান আরেকটা বড় গাধা।
মা ডাকে, 'বাবা, গোসল করে তারপর খাবি?'
'তাই খাই।'
'যা, তাহলে গোসল করে আয়। তোর বন্ধুদের কেউ আজকে যে এল না।'
'কী জানি! গন্ধ পায় নাই বুঝি। পেলেই আসবে।'
আজাদ গোসল করতে যায়। বড় গরম পড়েছে। বৈশাখ মাস। গুমোট গরম। মনে হয় ঝড় আসবে। মা যে কেন গেল এই গরমের মধ্যে রান্নাবাড়া করতে! আবার না তার হাঁপানির টান ওঠে।
গোসল করতে বেশ আরাম লাগে। গায়ে অনেকক্ষণ ধরে পানি ঢালার ইচ্ছা হয়। কিন্তু এটা করা উচিত হবে না। এই বাসায় আবার পানির সমস্যা। হিসাব করে পানি খরচ করতে হয়।
গোসল করে বেরিয়ে বাইরে এসে দেখে আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। এক্ষুনি ঝড় আসবে। কালবৈশাখীর ঝড়। বাতাস বইতে শুরু করেছে। ঠান্ডা বাতাস। মেঘের ছোঁয়া লাগা ভেজা বাতাস। কিন্তু সঙ্গে ধুলাবালিও প্রচুর। মা বলছেন, 'এই, জানলা বন্ধ কর। ঘরে গিয়ে বস, ধুলা ঢুকে পড়ল।'

১৮

আজাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। মালিবাগের বাসা থেকে তারা চলে এসেছে তেজকুনিপাড়ায় আরেকটু ভালো বাসায়। মালিবাগের বাসাটা একেবারেই যা-তা ছিল। পড়াশোনার পাশাপাশি আজাদ চেষ্টা করছে একটা ব্যবসা দাঁড় করাতে।
ক্লাস করতে বিশ্ববিদ্যালয়ে যায় সে। ক্লাস করে, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেয়। ব্যবসা থেকে অল্প-বিস্তর টাকা আসছে। ফলে তার বন্ধুদের অনেকের চেয়েই সে সচ্ছল। স্টেডিয়ামে প্রভিন্সিয়াল হোটেলে গিয়ে বিরিয়ানি খাওয়ানোর বেলায় তার নামটাই আগে আসে। এ কারণে বন্ধুদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তাও আছে।
ফারুক বলে, 'চল দোস্তো, বিকালে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে যাই।'
'ক্যান? ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে কী?'
'ফাংশান আছে। লেখক সংঘের অনুষ্ঠান।'
ফারুকের আবার লেখালেখির বাতিক আছে। সে লেখক সংঘের অনুষ্ঠান থেকে বঞ্চিত হতে চায় না।
আজাদ বলে, 'লেখকদের ফাংশানে গিয়ে আমি কী করব? আমি তো লেখক না। আমি বড়জোর দলিল লেখক সমিতির মেম্বার হতে পারি।'
'আরে মেয়ে আসবে অনেক। চল যাইগা।'
মেয়ে দেখার লোভেই আজাদ, ফারুক, ওমর-সবাই মিলে বিকালে গিয়ে হাজির হয় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে। পাকিস্তান লেখক সংঘের আয়োজনে এই অনুষ্ঠান হচ্ছে। পাঁচ দিন ধরে হবে। অনুষ্ঠানের নাম মহাকবি স্মরণ উৎসব। রবীন্দ্রনাথ, ইকবাল, গালিব, মাইকেল মধুসূদন আর নজরুলকে নিয়ে একেক দিন অনুষ্ঠান হবে। আজকে পালিত হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ দিবস, আগামীকাল ইকবাল দিবস, পরশু ৭ই জুলাই ১৯৬৮ গালিব দিবস, ৮ই জুলাই মাইকেল দিবস আর ৯ই জুলাই নজরুল দিবস পালিত হবে পরপর। বর্ষাকাল। আজকে সারা দিন বৃষ্টি হয়নি, তবে আকাশে মেঘ থাকায় গরমটা বেশি লাগছে।
আজাদরা যখন ঢোকে তখন আনিসুজ্জামান প্রবন্ধ পড়ছেন। ফারুক মন দিয়ে বক্তৃতা শোনে। আনিসুজ্জামান চমৎকার শাদা খদ্দরের পাঞ্জাবি পরে এসেছেন। তাঁকে দেখতেও লাগছে নায়কের মতো। ফারুক আনিসুজ্জামানের বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ। যেমন সুলিখিত, তেমনি সুপঠিত। আনিসুজ্জামানের গলার স্বরও মাশালাহ লা-জবাব। রবীন্দ্রনাথ যে বাংলা ভাষাটাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, এ ব্যাপারে তাঁর কোনোই সন্দেহ নাই। তবে প্রবন্ধের দিকে তেমন মন নাই আজাদের। সে উসখুস করে। ওমর বলে, 'দোস্তো, বাম দিক থাইকা তিন নম্বর মাইয়াটারে দেখ।'
বক্তৃতা শেষ। এবার ঘোষকের আগমন। উপস্থাপনার দায়িত্ব পালন করছেন আতিকুল ইসলাম। তিনি বলেন, 'এবার আবৃত্তি করবেন গোলাম মুস্তাফা।' করতালিমুখর হয়ে ওঠে মিলনায়তন। গোলাম মুস্তাফা সিনেমার নায়ক। টিভিতেও নাটক করেন। তাঁকে অনেকে চেনে।
গোলাম মুস্তাফা না দেখেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা মুখস্থ আবৃত্তি করতে থাকেন।
প্রথমে তিনি আবৃত্তি করেন প্রশ্ন। 'ভগবান তুমি দূত পাঠায়েছ বারে বারে দয়াহীন সংসারে...' এই কবিতাটা তেমন বড় নয়। তারপর তিনি শুরু করেন পৃথিবী। 'আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো, পৃথিবী, শেষ নমস্কারে অবনত দিনাবসানের বেদিতলে...' এত বড় কবিতা তাঁর মুখস্থ! এ যে দেখছি শ্রুতিধর। ভদ্রলোক আবৃত্তি করেনও ভালো। আজাদের মনটা ভালো হয়ে যায়। ওমর উঠে একবার সামনে গিয়ে আবার ফিরে আসে।

তার চোখে যে মেয়েটা পড়েছে, তাকে সামনে থেকে দেখাটাই বোধ করি তার উদ্দেশ্য। গোলাম মুস্তাফার আবৃত্তি শেষ হলে আজাদ বলে, 'চল যাই। গরম।'

ফারুক বলে, 'মনিরুজ্জামান আর সিকান্দার আবু জাফরের আবৃত্তিটা শুনে গেলে হয় না।'

'হয়।' ওমর ফিরে এসে বলে। সে মেয়েটাকে কেমন দেখল তার রিপোর্ট পেশ করার জন্যে জিভ গোল করে তালুতে একটা শব্দ করে। মানে, দোস্তো, জিনিসটা জব্বর।

অনুষ্ঠান শেষ করে বাইরে বেরিয়ে এসে তারা দেখে বৃষ্টি পড়ছে। 'মুশকিল হলো তো'-আজাদ বলে।

বর্ষাকাল, বৃষ্টি তো হবেই। ফারুক অবলীলায় বৃষ্টির মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায়, 'চলে আয়, ভিজতে ভিজতে যাই।'

ওমর বলে, 'না আরেকটু থাকি।' হলের বাইরে ছাদের নিচে গাদাগাদি ভিড়। সেখানে সে দাঁড়িয়ে থাকে। বোধহয় ওই মেয়েটাও ওখানেই দাঁড়িয়ে।

বৃষ্টি দেখে আজাদের মনটা একটু খারাপ হয়। কেন খারাপ হয় সে জানে না। বোধহয় জানে। তার মিলির কথা মনে পড়ছে। মেয়েটা পাকিস্তানে কোথায় পড়ে আছে, কে জানে! কেনই বা সে তার জীবনে এল, কেনই বা এভাবে হারিয়ে গেল। আজাদ ফারুকের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়-'চল বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে যাই।'

'চল। আরে আমি তো তা-ই বলছি। ভিজে গিয়ে সর্দি বাধাই যদি, তুই ব্রান্ডি খাওয়াবি। ব্যস'-ফারুক বলে।

'এই ওমর চলে আয়'-আজাদ ডাকে। বন্ধু দুজন তাকে ফেলেই চলে যাওয়ার উদ্যোগ করেছে দেখে ওমরও তাদের পিছু নেয়।

'কী ব্যাপার, তুই আমাদের সাথে আসলি যে'-আজাদ বলে।

'তোরা বেটা ভিজতে ভিজতে রওনা দিলি কেন? একটা রিকশা তো অন্তত পাওয়া যাইত'-ওমর বলে।

'তিনজনে এক রিকশায় উঠলে ভিজতেই হতো'-আজাদ বলে।

'তুই আসলি ক্যান। ওই মেয়েকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে তারপরে আসতি'-ফারুক বলে।

'মেয়ে? কোন মেয়ে?' ওমর বিস্মিত হওয়ার ভাব দেখায়।

'ওই যে তোর হেভি জিনিস'-আজাদ মনে করিয়ে দেয়।

'আরে না। আমি একটা বুকলেট পাইছি। সেইটার জন্যে দেরি করতেছিলাম। ওইটা ভিজাইতে চাই না'-ওমর বলে।

'কী বুকলেট?' ফারুক জানতে চায়।

'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আদালতে দেওয়া শেখ মুজিবের জবানবন্দি'-ওমর বলে।

'আরেব্বাস। এটা এত তাড়াতাড়ি বই হইয়া বার হইয়া গেছে। দেখি'-ফারুক বলে।

'না। বৃষ্টিতে ভিজাতে চাই না। পরে দেখিস'-ওমর নির্বিকার ভঙ্গিতে জবাব দেয়।

বৃষ্টি থেমে যায়। তারা দৌড়ে একটা বারে ঢোকে। বেয়ারা তোয়ালে এনে দেয়। আজাদ ব্রান্ডির অর্ডার দেয়। প্রথম প্রথম ঘরটা বেশ অন্ধকার লাগছিল। ধীরে ধীরে তারা ধাতস্থ হলে চারপাশ পরিষ্কার দেখা যায়। বেয়ারা পানীয় পরিবেশন করে। তারা চিয়ার্স বলে গেলাস উঁচিয়ে আরম্ভ করে। ব্রান্ডির গেলাসে চুমুক দিতে দিতে ওমর বলে, 'এই, মাথার ওপরের লাইটটা জ্বালাও।' আলো খানিকটা বেড়ে গেলে সে পেটের কাছে কাপড়ের নিচে গচ্ছিত রাখা বুকলেটটা বের করে শেখ মুজিবের জবানবন্দি পড়তে থাকে। একটু পরে তরলের মাত্রা একটু বেশি হলে সে জোরে জোরে পড়া শুরু করে দেয়। বলে, 'দোস্তো, শেখ সাহেবরে অ্যারেস্ট করার ডিসক্রিপশনগুলা খুবই ইন্টারেস্টিং। '৫৮ সালের পর থাইকা আইয়ুব আমলে শেখ সাহেব তো দুই দিনও জেলের ভাত না খাইয়া থাকে নাই।'

'এই দ্যাখ : ১৯৫৮ সালের ১২ই অক্টোবর তাহারা পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সে আমাকে গ্রেফতার করে এবং দেড় বৎসরকাল বিনা বিচারে আটক রাখে। আমাকে এইভাবে আটক রাখাকালে তাহারা আমার বিরুদ্ধে ছয়টি ফৌজদারি মামলা দায়ের করে, কিন্তু আমি ঐসব অভিযোগ হইতে সসম্মানে অব্যাহতি লাভ করি... ১৯৬২ সালে বর্তমান শাসনতন্ত্র জারির প্রাক্কালে যখন আমার নেতা মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয়, তখন আমাকেও জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স বলে কারান্তরালে নিক্ষেপ করা হয় এবং প্রায় ছয় মাস বিনা বিচারে আটক রাখা হয়...

'আমার প্রতিষ্ঠান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ছয় দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং দেশের উভয় অংশের মধ্যকার অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বৈষম্য দূরীকরণের অনুকূলে জনমত যাচাই ও গঠনের জন্য ছয় দফার পক্ষে জনসভা অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়।

'ইহাতে প্রেসিডেন্টসহ অন্যান্য সরকারী নেতৃবৃন্দ ও সরকারী প্রশাসনযন্ত্র আমাকে 'অস্ত্রের ভাষা'য় 'গৃহযুদ্ধ' ইত্যাদি হুমকি প্রদান করে এবং একযোগে এক ডজনেরও অধিক মামলা দায়ের করিয়া আমাকে হয়রানি করিতে শুরু করে।'

ফারুক বলে, 'এই বেটা, তুই কি এখন পুরা বইটা পড়বি নাকি! শালা মাতালের কাণ্ড দ্যাখো।'

ওমর বলে, 'ডোন্ট ডিস্টার্ব। এই জায়গাটা মোস্ট ইন্টারেস্টিং। খালি গ্রেপ্তার আর জামিন আর গ্রেপ্তার। হয়রানি কাকে বলে। আরে বেটা শোন না, ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে আমি যখন খুলনায় একটি জনসভা করিয়া যশোর হইয়া ঢাকা ফিরিতেছিলাম তখন তাহারা যশোরে আমার পথরোধ করে এবং আপত্তিকর বক্তৃতা প্রদানের অভিযোগে ঢাকা হইতে প্রেরিত এক গ্রেফতারি পরোয়ানাবলে এইবারের মতো প্রথম গ্রেফতার করে।'

আজাদ মনে হয় একটু বেশি খেয়ে ফেলেছে। তার মাথা ঝিমঝিম করছে। শেখ মুজিব তো সারা প্রদেশ ঘুরে দুই পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্য ভালোই তুলে ধরছেন, আর তাঁর বক্তৃতা শুনলে গায়ের রোম খাড়া হয়ে যায়, মনে হয় এক্ষুনি দেশ স্বাধীন করতে না পারলে আর মুক্তি নাই, কিন্তু তাতে কি? আজাদ কি তার মিলিকে ফিরে পাবে? মিলি কেন পাকিস্তানেই রয়ে গেল? মিলিকে কিন্তু সে কোনো দিন মুখফুটে বলেনি যে তাকে তার ভালো লাগে। বরং মিলিই বলেছিল। বলেছিল, খালাকে বলেছি আপনার কথা। তার মানে মাকেও বলা হয়ে গেল... কী বলা হলো... আপনার কথা? আপনার কথাটা কী? এই যে আপনার আমার সম্পর্ক... মিলি, আমাকে তোমার কেমন লাগে? কেমন লাগত আসলে? তাহলে একবার 'বিদায়' বলে যাবে না? এভাবে... 'বেয়ারা... আরেক পেগ...'

ওমর পড়েই চলেছে শেখ সাহেবের জবানবন্দি... 'আমাকে যশোরের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে তিনি আমাকে অন্তবর্তীকালীন জামিন প্রদান করেন। আমি ঢাকার সদর দক্ষিণ মহকুমা প্রশাসকের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি আমার জামিনে অসম্মত হন, কিন্তু মাননীয় দায়রা জজ প্রদত্ত জামিনবলে আমি সেইদিনই মুক্তি পাই এবং নিজগৃহে গমন করি। সেই সন্ধ্যায়ই আটটায় পুলিশ পুনরায় আপত্তিকর বলিয়া কথিত এক বক্তৃতার উপর সিলেট হইতে প্রেরিত এক গ্রেফতারি পরোয়ানাবলে আমার বাসগৃহ হইতে আমাকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সেই রাত্রেই আমাকে সিলেট লইয়া যায়। পরদিন প্রাতে আমাকে আদালতে উপস্থিত করা হইলে সিলেটের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট আমার জামিনের আবেদন বাতিল করিয়া আমাকে কারাগারে প্রেরণ করেন। পরদিন সিলেটের মাননীয় দায়রা জজ আমাকে জামিন প্রদান করেন।'

আজাদ বলে, 'আরে এ তো খালি গ্রেফতার করে আর ম্যাজিস্ট্রেট জামিন দেয় না, আবার দায়রা জজ জামিন দেয়, আবার পরদিন গ্রেফতার করে... এই একই কথা তুই আর কত পড়বি...'

'পড়েন স্যার পড়েন।' আশপাশে সব বেয়ারা ভিড় করে শুনছে। বারের খদ্দেররাও আশপাশের টেবিলে বসে কান খাড়া করে আছে শেখ মুজিবের জবানবন্দি শোনার জন্যে। আরে এ তো মুশকিল হলো।

ওমর পড়ে চলে, 'কিন্তু মুক্ত হইবার পূর্বেই পুলিশ পুনরায় আপত্তিকর বলিয়া কথিত এক বক্তৃতা প্রদানের অভিযোগে আমাকে কারা দরজায়ই গ্রেফতার করে। এবারের গ্রেফতারি পরোয়ানা মোমেনশাহী হইতে প্রেরণ করা হইয়াছিল। সেই রাত্রে পুলিশ পাহারাধীনে আমাকে মোমেনশাহী লইয়া যাওয়া হয় এবং একইভাবে মোমেনশাহীর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট আমার জামিন প্রদানে অস্বীকৃত হন...'

'এবং পরের দিন জেলা দায়রা জজ আমাকে জামিন প্রদান করেন। ঠিক?' ফারুক বলে।

'ঠিক'-ওমর সায় দিয়ে গেলাস হাতে নিয়ে চুমুক দেয়।

'তারপর স্যার?' বেয়ারা বলে।

'১৯৬৬ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে-সম্ভবত ৮ই মে, আমি নারায়ণগঞ্জে এক জনসভায় বক্তৃতা করি এবং রাত্রে ঢাকায় নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করি। রাত একটায় পুলিশ ডিফেন্স অফ রুল-এর ৩২ ধারায় আমাকে গ্রেফতার করে। একই সঙ্গে আমার প্রতিষ্ঠানের বহুসংখ্যক নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়... ইহাদের মধ্যে ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহাম্মদ... বড় তালিকা পইড়া শেষ করন যাইব না ভাইসব...' ওমরের মুখ দিয়ে থুতু ছিটে বের হয়ে ফারুকের গায়ে পড়লে সে একটা চাপড় মারে ওমরের পিঠে, ওমর দুই পৃষ্ঠা গ্রেফতারের তালিকা পার হয়ে পড়ে : অধিকন্তু পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বাংলা দৈনিক ইত্তেফাককেও বর্তমান শাসকগোষ্ঠী নিষিদ্ধ ঘোষণা করে.... তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে দীর্ঘকালের জন্য কারারুদ্ধ রাখিয়া তাহার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করে... প্রায় ২১ মাস আটক রাখিবার পর ১৯৬৮ সালের জানুয়ারীর ১৭/১৮ তারিখে রাত একটার সময় আমাকে তথাকথিত মুক্তি দেওয়া হয় এবং কারাগারের ফটক হইতে কতিপয় সামরিক ব্যক্তি দৈহিক বল প্রয়োগ করিয়া আমাকে ঢাকা সেনানিবাসে লইয়া আসে এবং একটি রুদ্ধ কক্ষে আটক রাখে...

হঠাৎ একজন বেয়ারা এসে ওমরের কানের কাছে মুখ নামায়, ফিসফিস করে বলে, 'স্যার, টিকটিকি স্যার, বইটা লুকায়া ফেলেন...।' সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতারা সব নিজ নিজ গেলাস নিয়ে স্বাভাবিক হওয়ার অভিনয় শুরু করে।

ফারুক বলে, 'চল দোস্তো কাইটা পড়ি।'

তারা বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে, আজ বোধহয় ঢাকা ভেসেই যাবে।

১৯

শীতকাল। ১৯৬৯ সালের প্রথম দিকটায় এসে শীতটা বোধহয় একটু বেশিই পড়েছে। আজাদের ঘুম থেকে ওঠার কথা ছিল সকাল ৮টায়। সকাল ৯টার মধ্যে সে হাজির হবে নয়াপল্টনে। মিন্টু সাহেবের বাসায়। তাঁর সঙ্গে যাওয়ার কথা মতিঝিলে, একটা বীমা

অফিসে। ওই অফিসের স্টেশনারি সরবরাহের কাজটা পাওয়ার জন্যে দরবার করতে। কিন্তু সকাল ৮টায় লেপের নিচ থেকে বের হওয়ার ঝক্কিটা কে সামলাবে? মা এসে দুবার ডেকে গেছেন, 'আজাদ, আজাদ, ওঠ। ৮টা তো কখন বেজে গেছে!'

আজাদ নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে বলে, 'বাজুক। আমাকে ৯টায় ডেকো।' সে মাথার ওপরে লেপ মুড়ে দিয়ে আবার চোখ বন্ধ করে।

ও-ঘর থেকে জায়েদের পড়ার আওয়াজ আসছে। জায়েদ জোরে জোরে সুর করে পড়ে। খানিকক্ষণ লেপের ওমের ভেতরে শুয়ে জেগেই ছিল আজাদ। তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের মধ্যে একটা মিষ্টি স্বপ্ন দেখছিল। এমন সময় আবার মায়ের ডাক। 'আজাদ, তোর ৯টাও তো পার হয়ে যায়। উঠবি না!'

আজাদ ধড়পড় করে ওঠে। লেপটা গায়ে জড়িয়ে ধরে বিছানা থেকে নামে। ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে লেপটা ছুড়ে মেরে কলতলার দিকে যায়। এক মিনিটে প্রাতঃক্রিয়াদি সেরে প্যান্ট পরে সে রেডি।

'মা, যাইগা।'

মা বলেন, 'নাশতা খেয়ে তারপরে যা। না খেয়ে কই যাবি?'

আজাদ জানে, মা নাশতা না খেয়ে বাইরে বের হতে দেবেন না। আবার এখন নাশতা খেতে গিয়ে দেরি হয়ে গেলে তার বড় ক্ষতি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। মিন্টু ভাই বেরিয়ে যাবেন। কাজেই একটা মিথ্যা কথা তাকে বলতে হবে। 'মা, নাশতার দাওয়াত আছে এক বাড়িতে। তোমার নাশতা তো এখন খাওয়া যাবে না।'

'একটা টোস্ট বিস্কুট খেয়ে এক কাপ চা খেয়ে যা অন্তত।'

'সময় নাই। ৯টার মধ্যে পৌঁছানোর কথা। এইখানেই ৯টা বেজে গেছে।'

'দ্যাখো তো ছেলের কাণ্ড'-মা হাসেন, 'তোকে তো আমি ৮টাতেই ডেকে দিয়েছিলাম।'

আজাদ একটা সোয়েটার গায়ে চড়াতে চড়াতে দৌড়ে ঘরের বাইরে যায়। তেজকুনিপাড়া থেকে নয়াপল্টন। অনেক দূর। একটা রিকশা নেওয়া দরকার। কিন্তু রাস্তায় আশপাশে সে কোনো রিকশা দেখে না। দোকানপাটও এখনও খোলেনি। ঢাকার দোকানদাররা সব সাহেব, ১০টা-১১টার আগে সাধারণত দোকানের ঝাঁপ খোলে না, কিন্তু রিকশাঅলাদের কী হলো? আরেকটু এগিয়ে গেলে আজাদের মনে হয়, এত লোক হেঁটে যাচ্ছে, ব্যাপার কী? আজকে স্ট্রাইক নাকি? তাই তো! আজ তো হরতাল হতেই পারে। দুরো শালা, হরতালের দিনে বীমা অফিসের কর্মসূচি রাখাই ঠিক হয়নি। এখন সে এতটা পথ খালি পেটে হেঁটে হেঁটে যাবে নাকি? পেট খালি, শৌচাগারেও যাওয়া হয়নি, অথচ সামনে দুস্তর পারাবার। আগে মোড়ের চায়ের দোকানে গিয়ে পরোটা আর ডালভাজি খেয়ে নেবে নাকি! কিন্তু চায়ের দোকানটা ঠিক তার মতো ভদ্রলোকের বসার জন্যে উপযুক্ত নয়। রিকশাঅলা শ্রেণীর লোকেরা এটাতে বসে। মাটিতে পুঁতে রাখা গাছের ডালের ওপরে পাতা তক্তা, এই হলো এর আসন, আর তাতে পা তুলে বসে থেকে রিকশাঅলারা ছোট ছোট চায়ের কানা ভাঙা কাপ থেকে চা পিরিচে ঢেলে সুড়ুৎ সুড়ুৎ করে খাচ্ছে, এ দৃশ্য কল্পনা করার সঙ্গে সঙ্গে আজাদ ওখানে যাওয়ার চিন্তা বাদ দেয়। শীতটা তার শরীর থেকে এখনও যাচ্ছে না। সে তার বিদেশী সিগারেটের প্যাকেটে হাত দেয়, একটা সিগারেট বের করে, লাইটার বের করে অগ্নিসংযোগ করে তাতে। খালি পেটে সিগারেট, মা শুনলে কতই না রাগ করবেন, তার মনে হয়!

জ্বালো জ্বালো, আগুন জ্বালো-স্লোগান শোনা যায়। আজাদ দেখে, অল্প কয়েকজন লোকের একটা মিছিল। মিছিলের মধ্যে আবার বস্তির কয়েকটা ছেলে-ছোকরা। মিছিল তার আগে আগে যাচ্ছে। সে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে মনে মনে বলে, আগুন জ্বালিয়েই তো বাবা সিগারেট ধরালাম, আমার কাজ আমি করেছি, এবার তোরা তোদের কাজ কর।

সে এগিয়ে যায়। রোদ উঠছে। কুয়াশা কেটে যাচ্ছে। তার এখন একটু একটু করে গরম লাগছে। সে সোয়েটারটা খুলে কোমরে বাঁধে।

মিছিলটা ধীরে ধীরে ফার্মগেটের দিকে এগিয়ে যায়। এবং আশ্চর্য, মিছিলের আকার বড় হতে থাকে। আইয়ুব শাহির গদিতে, আগুন জ্বালো একসাথে; আইয়ুব মোনেম দুই ভাই, এক দড়িতে ফাঁসি চাই। এই স্লোগান শুনে আজাদ একটু চিন্তিত হয়। একটা দড়িতে দুজনকে ফাঁসি দেওয়া বাস্তবে সম্ভব হবে কি না। শুধু দড়ির খরচ বাঁচাতে গিয়ে না আবার আইয়ুব আর মোনায়েম দুই খানই বেঁচে যায়। প্রথম কথা হলো একটা দড়িতে একটা বড় ফাঁস বানিয়ে দুজনের কল্লা একসঙ্গে ঢুকিয়ে দেওয়ার পর তাদের দুজনের গলায় ফাঁস লাগবে কি না। শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ না হলে তারা দুজন কি মারা যাবে? না গেলে কী হবে? আবার দুজনের ভর একসঙ্গে একটা দড়ি সইতে পারবে কি না? যদি দড়ি ছিঁড়ে যায়, তাহলে কী হবে? পড়ে গিয়ে বেটারা ব্যথা পাবে কি পাবে না! ফাঁসির আসামি কোনো কারণে বেঁচে গেলে নাকি মাফ পেয়ে যায়, এই শোনা কথাটা কি ঠিক?

মিছিল বড় হচ্ছে, আর তার দৈর্ঘ্য বাড়তে বাড়তে একেবারে আজাদের কাছে পর্যন্ত এসে যাচ্ছে। আরে, মুশকিল তো, সে তো মিছিলে নামবে বলে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে পথে নামেনি। তার উদ্দেশ্য অত মহৎ নয়। নিতান্তই একটা সাপাইয়ের কাজ পটানোর জন্যে না সে...

'দোস্তো, আইসা পড়ছ, ভালো ভালো। তুমগো মতো বড়লোকের পোলা আইসা পড়লে না মিছিলে জোশ আহে।' কে? না খসরু। তার একজন ক্লাসমেট। নিজেও সে বড়লোকের

ছেলে। তবে সে নিজেকে শ্রেণীচ্যুত বলে মনে করে। এখন কৃষক-শ্রমিকের নেতৃত্বে একটা বিপ্লব-টিপ্লব ঘটানোর স্বপ্ন দেখছে।
জেলের তালা ভাঙব, শেখ মুজিবকে আনব।
খসরু স্লোগানে কণ্ঠ মেলায়। আজাদ বিস্মিত। কারণ শেখ মুজিবকে খসরু নেতা মানে না। মনে করে বুর্জোয়া স্বার্থের বাঙালি প্রতিনিধি।
'কী ব্যাপার, তুমিও শেখ সাহেবের মুক্তি চাও নাকি?' আজাদ বলে।
'অফকোর্স চাই। মওলানা কইয়া দিছেন, মজিবররে ছাড়তে হইব। ব্যস, আমি তার লাইনে আছি।'
মিছিল আরো বড় হচ্ছে। এখন আজাদের পেছনেও মানুষ। তার পরিচিত আরো আরো লোকজন বন্ধুবান্ধবকে দেখা যাচ্ছে।
আজাদ বিস্মিত হয়ে খেয়াল করে, মিছিলের সঙ্গে হাঁটতে তার ক্লান্তি লাগছে না, অনেকটা পথ যে সে ইতিমধ্যেই পাড়ি দিয়ে এসেছে সে খেয়ালই করেনি। জ্বালো জ্বালো... আবার ধ্বনি ওঠে। আগুন জ্বালো, আজাদ স্লোগানের জবাব দেয়। সে ভেবেছিল, এই জবাব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে আরেকটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করবে। কিন্তু তা আর করা হয় না। তার হাত আপনা-আপনি মুঠো হয়ে আকাশের দিকে উড়তে থাকে। তখন তার নিজেকে বেশ শক্তিশালী বলে মনে হয়। ইতিমধ্যে তাদের পাশে একটা রায়ট পুলিশভ্যান উদিত হয়েছে। কিন্তু আজাদের বিন্দুমাত্র ভয় লাগে না। মনে হয় এত এত মানুষের শক্তির কাছে ওরা খুবই নগণ্য, খুবই তুচ্ছ।
আজাদ মনে মনে বলে, বাবারা, তোমরা আস্তে আস্তে নয়াপল্টনের দিকে চলো। আমার রাস্তা সংক্ষিপ্ত হয়। গন্তব্য কাছে আসতে থাকে। তার মনে হয় এই মিছিলটা একটা ট্রেন, আর সে বিনা টিকেটে এই ট্রেনে উঠে পড়েছে। সে বিনা টিকেটে উঠেছে, কারণ তার উদ্দেশ্য আর মিছিলকারীদের উদ্দেশ্য এক নয়। সে শুধু নয়াপল্টনে মিন্টু সাহেবের বাসা পর্যন্ত পৌঁছতে চায় আর মিছিলকারীরা চায় রাজবন্দিদের মুক্তি, ছাত্রদের ১১ দফার বাস্তবায়ন, আওয়ামী লীগের ৬ দফা অর্জন। কী জানি, সবাইকে সে তো চেনে না। ওদের মধ্যে কেউ কেউ নিশ্চয় চায় স্বাধীন বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা।
আজাদ এসবের ঠিক কোনটা যে চায়, সে জানে না। তবে এই শালা আইয়ুব খানটা গেলে সে খুশি হয়। আর পশ্চিম পাকিস্তানিদের সঙ্গে থাকাটা ঠিক পোষাবে না। ওরা শালা বাঙালিদের ঠিক মানুষই মনে করে না, মুসলমানও মনে করে কি না সন্দেহ। করাচিতে দীর্ঘদিন থেকে এ কথাটা সে বুঝে এসেছে। শেখ সাহেব ৬ দফার ব্যাখ্যায় পশ্চিম পাকিস্তানিদের উদ্দেশে বলেছেন, পাকিস্তানের মোট রাজস্বের শতকরা ৬২ টাকা খরচ হয় দেশরক্ষা বাহিনীতে আর ৩২ টাকা খরচ হয় কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনায়। এই ৯৪ টাকা পুরাটাই খরচ হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। অথচ পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠের বাস। পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার দুই তৃতীয়াংশ আয় হয় পূর্ব পাকিস্তানের পাট থেকে। শেখ মুজিব এইটা ঠিক বলেছেন। ডিম পাড়ে হাঁসে, খায় বাঘডাশে। এত বৈষম্য সহ্য করা যায় না। আবার প্রতিবাদ করলেই গুলি। মিছিল অনেক বড় হয়ে গেছে, আর সামনে কাকরাইলের মোড়ে পুলিশ আর ইপিআর কাঁটাতারের ব্যারিকেড দিয়ে মিছিলের গতিরোধ করার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।
আজাদের রক্ত গরম হতে থাকে। সে চেয়েছিল অন্তত পল্টন পর্যন্ত মিছিলের সঙ্গে হেঁটে যেতে, আর এ শালারা সেটা করতে দেবে না। কেন? মিছিল করার অধিকার কি আমাদের মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে না? ওই শালারা, রাস্তা কি তোগো বাপের? মিছিল করতে দিবি না, কোন আইনে? আমার টাকায় কেনা গুলি আমার বুকেই মারো?
হালা, এই ঢিল ল তো।
আজাদ নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাতে থাকে।
মিছিলকারীরা ঢিল পাটকেল সংগ্রহ করতে ব্যস্ত। রাস্তার পিচ্চিগুলোর উৎসাহ, তৎপরতা, সাহস আর সাফল্য বেশি। তাদের ঢিল গিয়ে পড়ছে পুলিশের গায়ে।
গুড়ুম। কাঁদানে গ্যাসের শেল এসে পড়ে মিছিলের অনেক সামনে। জনতা সেই শেল ফেটে যাওয়ার আগেই তুলে নিয়ে ছুড়ে মারে উল্টো পুলিশের দিকেই। আবার কাঁদানে গ্যাসের শেল এসে পড়তে থাকে পরপর।
ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে এলাকাটা। আজাদের চোখ জ্বালা করতে থাকে। এখন সে করবেটা কী? সামনের দিকে জনতা, বিশেষ করে খেটে খাওয়া ধরনের মানুষগুলো ঢিল ছুড়েই চলেছে। রাস্তার পিচ্চিগুলোর সাহস তো একেবারেই আকাশছোঁয়া।
আজাদ আগুন দেওয়ার জন্যে পকেটের লাইটারটা বের করে, হাতের কাছে কী পাওয়া যায় যাতে আগুন দেওয়া যায়। একটা ইপিআরটিসির বাস পেলে ভালো হতো। কিন্তু চোখ এমন জ্বলছে যে সে আর কিছুই দেখে না। খসরু তার হাতে ধরে টান দিয়ে বলে, 'আগে চউখে পানি দেওন লাগব। চলো ওই গলির হোটেলে ঢুইকা পড়ি।'
আজাদ বাঁয়ের একটা গলির দিকে যেতে থাকে।
খসরু বলে, 'ওইটায় যাইও না, ওইটা কানাগলি। আমার লগে আহো।'
আজাদ খসরুর হাত ধরে তার সঙ্গে একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে।

২০

গোয়েন্দা হিসাবে জায়েদের তুলনা মেলা ভার। ক্লাস নাইনে পড়া জায়েদ, বাসায় ফিরতে না ফিরতেই আজাদ তার সামনে পড়ে, 'দাদা, তিনটা টাকা দ্যাও তো!'

'ক্যান, টাকা দিয়া তুই কী করবি!'
'টাকা দিয়া আমি কী করি, তুমি তো জানোই। সিনেমা দেখুম।'
'আজকে তো হরতাল। সিনেমা হল খুলবে না।'
'কালকা দেখুম।'
'কালকেও খুলবে না।'
'যেদিন খুলব সেইদিন দেখুম।'
'এখন খুচরা নাই। পরে আসিস।'
'দাদা, আমি কিন্তু আম্মারে কই নাই, তুমি মিছিলে গেছলা!'
'আমি মিছিলে গেছি তোকে কে বলেছে!'
'গেছলা। আমি জানি!'
এর পরে তিন টাকা না দিয়ে আর আজাদের কোনো উপায় থাকে না। জায়েদের মুখ বন্ধ করা যায় বটে, কিন্তু মার কাছে ব্যাপারটা গোপন থাকে না।
'কিরে, তোকে দেখতে এমন লাগে কেন?' মা তাকে দেখামাত্রই বলেন।
'কেমন লাগে!
'চোখ লাল। গা ঘামে ভিজে গেছে!'
'আরে হরতাল না! গাড়িঘোড়া কিছু আছে নাকি! হেঁটে যেতে হলো। রোদ চড়চড় করছে। তাই ঘেমে গেছি।'
আজাদ বারান্দায় গিয়ে জগের পানিতে চোখ ধোয়।
'চোখে কী হলো?'
'আরে টিয়ার গ্যাস মেরেছে। মিছিলের পেছনে পড়েছিলাম।'
'তুই মিছিলে গেছিস!'
'যাই নাই। আমি তো নয়াপল্টন যাচ্ছি। মিছিল আমার আগে আগে যায়। আমি কি আর অত বুঝেছি।'
'না, আম্মা, দাদায় স্লোগানও দিছে'-জায়েদের গলার স্বর।
'ওই। তিন টাকা ফেরত দে'-আজাদ বলে।
মা বলেন, 'আজাদ, তোকে না বলেছি মিছিলে যাবি না। আমার কি সাত-আটটা ছেলে। আমার ছেলে একটাই। তুই। তোকে আমি কি জালিমদের গুলিতে মরতে দেব! কী গোলাগুলিই না করছে। আজকে শুনি ঢাকায় মরেছে তো কালকে টঙ্গীতে, পরশু নারায়ণগঞ্জে। খবরদার, তুই এইসবে যাবি না। নেতারা তো কেউ মরে না, খালি পাবলিক মরে।'
জায়েদ বলে, 'নেতাও মরতেছে। আসাদ মারা গেল না?'

'ওই একজন দুইজন। পাবলিক মরে শয়ে শয়ে'-মা বলেন।
'নেতা কি শয়ে শয়ে আছে নাকি! আর আওয়ামী লীগের গুলান তো সব জেলে। বাইরে আছে খালি মওলানা ভাসানি'-আজাদ বলে।
মা জগ থেকে পানি ঢালেন আজাদের হাতে। আজাদ চোখ ধোয়। আসলে তার উচিত ছিল রুমাল ভিজিয়ে পকেটে নিয়ে যাওয়া। তাহলে কাঁদানে গ্যাসে তাকে কাবু করতে পারত না-সে ভাবে।
মা বলেন, 'তুই পলিটিক্সের মধ্যে যাবি না। আমাদের কী?'
আজাদ বলে, 'পলিটিসিয়ানদের কী? আমাদের দেশ। করাচি গিয়ে দেখে এসেছি না ওরা আমাদের কী রকম ঠকাচ্ছে।'
মা বলেন, 'আপন বাঁচলে তার পরে না দেশ। তোর কিছু হলে দেশ নিয়ে আমি কী করব!'
আজাদ বলে, 'আমার কিছু হবে না।'
মা আজাদের হাত ধরে বলেন, 'বাবা রে, তুই এসবের মধ্যে যাবি না। দোহাই লাগে।' মার চোখ জলে ভিজে আসে।
আজাদ একটু বিস্মিত হয়। মাকে সে সাধারণত কাঁদতে দেখে না। মাকে তার সব সময়ই মনে হয়েছে যেন এক আশ্চর্য পাথর, যা সব অশ্রু শোষণ করে নেয়, কিন্তু নিজে কখনও গলে না।
আজাদ মায়ের কথামতো চলে কিছুদিন। বিশ্ববিদ্যালয়ে সে যায়। ক্লাস হলে ক্লাস করে। ইদানীং প্রায়ই ক্লাস হয় না। ছাত্ররা ১১ দফা দাবি দিয়েছে। তার সমর্থনে মিছিল-মিটিং করে। প্রায়ই সারা প্রদেশে ছাত্রধর্মঘট ডাকে। হরতালও হয় প্রায়ই। আজাদ মিছিলে যায় না। তবে বটতলায় সভা থাকলে মাঝে মধ্যে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গিয়ে আশেপাশে দাঁড়ায়। বক্তৃতা শোনে। বাদাম খায়। সেখান থেকে চলে যায় ব্যবসার ধান্দায়। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভালো নয় বলে ব্যবসাপাতিও ভালো হচ্ছে না।
ঢাকা যেন তপ্ত কড়াই হয়ে আছে। গতকালকে (১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯) সারাটা ঢাকা শহর পরিণত হয়েছিল মিছিলের নগরীতে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হক আর ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক সেনানিবাসের ভেতরে বন্দি অবস্থায় বাথরুমে যাওয়ার পথে গার্ডের বন্দুকের গুলিবর্ষণের শিকার হয়েছেন-এ রকম খবরে এমনিতেই সারাটা বাংলাদেশ ছিল বিক্ষুব্ধ। কালকে সকালে সরকারিভাবেই যখন স্বীকার করা হলো, সার্জেন্ট জহুরুল হক মারা গেছেন, তখন মনে হলো, ঢাকা যেন একটা বারুদের স্তূপ, আর কে যেন তাতে দিয়াশলাইয়ের কাঠি ধরল। মিছিলে মিছিলে

সয়লাব হয়ে গেল পুরোটা শহর। যেন এত বিদ্রোহ কখনও দেখেনি কেউ। মিছিল, আগুন, টিয়ার গ্যাস, ফায়ার। সে এক অন্য রকম ঢাকা।

আজকে হরতাল। হরতালের পাশাপাশি শুরু হয়েছে নতুন উপদ্রব। কারফিউ থাকে প্রতিদিনই প্রায়। এভাবে ঘরের মধ্যে বসে থাকা যায়? আজাদ চলে যায় বন্ধুবান্ধবদের আড্ডায়। সৈয়দ আশরাফুল হকদের বাসায়। ওখানে কার্ড খেলাটা জমে ভালো। কিন্তু সন্ধ্যার আগে আগে ঘরে ফিরে আসতে হয়। বিকেল সাড়ে ৫টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত কারফিউ। কারফিউয়ের মধ্যে আটকা পড়লে রাতটা মেসে কাটাতে হবে। চিন্তায় চিন্তায় মা কলজে পুড়িয়ে ফেলবে। পৌনে ৫টার সময় ইস্কাটন থেকে বেরিয়ে আজাদ দৌড় ধরে। তেজকুনিপাড়ায় পৌঁছতে হবে ১৫ মিনিটে। এই সময় কোনো যানবাহন পাওয়া যায় না। সবাই উর্ধ্বশ্বাসে যে যার গন্তব্যে ছুটতে থাকে। ব্যাপারটা দেখতে লাগে ভয়াবহ রকম হাস্যকর। মনে হয় বনে আগুন লেগেছে আর চতুষ্পদ প্রাণী সব দৌড়ে পালাচ্ছে। তেজগাঁওয়ে পৌঁছতে না পৌঁছতেই ৫টা বেজে গেছে। এখনও বাসায় পৌঁছতে অন্তত ১০ মিনিট। তবে বড় রাস্তা ছেড়ে সে ঢুকে পড়েছে পাড়ায়, এটাই ভরসা। বড় রাস্তায় ট্রাকের সামনে আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে জল্লাদের মতো ভঙ্গি করে সামরিক যান সব চলতে শুরু করেছে। সে চলার গতি দ্রুত করে। একটা বাঁক ঘুরলেই বড় রাস্তা থেকে তাকে আর দেখা যাবে না। সৈন্যরা পাগলা কুত্তার মতো হয়ে গেছে। ইচ্ছা হলেই বন্দুক চালাচ্ছে। আরে বন্দুক চালানোর মধ্যে বাহাদুরি কী আছে! আজাদও বহুত বন্দুক চালাতে পারে। তার বাবার বন্দুকের দোকান ছিল। সে সেখান থেকে বন্দুক ধার নিয়ে শিকারে যেত। তার নিজের কাছে এখনও একটা রিভলবার আছে। লাইসেন্স করা রিভলবার। তার বন্দুকের হাতও খুব ভালো। উড়ন্ত পাখি মেরে ক্লাস এইটে থাকতেই সে সবাইকে একবার তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। 'বাবা রে ও বাবা, আমারে নিতে যে আইল না, আমি অহন কী করুম। আমারে তো গুলি কইরা মাইরা ফেলাইব'-একটা খোঁড়া ভিক্ষুক চেঁচিয়ে কাঁদছে। আজাদ তাকায়। সন্ধ্যার ফ্যাকাসে আলোয় দেখতে পায়, ভিক্ষুকটার দু পা হাঁটু পর্যন্ত কাটা। একটা বিয়ারিংয়ের চাকার ট্রলিতে সে বসে আছে। আজাদের মায়াই হলো লোকটার জন্যে। তবে পুলিশ মিলিটারি তাকে গুলি করবে-এ রকম ভাবাটা বাড়াবাড়ি। এ গলিতে পুলিশের ঢোকার কারণ আজাদ দেখে না। তার মধ্যে একটা খঞ্জ ফকিরকে ওরা মারবে কেন? ও কি ৬ দফা চায় নাকি! গুলি না খেলেও লোকটার কপালে দুর্ভোগ থাকতে পারে। আজ রাতে হয়তো তাকে নিতে কেউ আসবে না। লোকটাকে সারা রাত শীতের মধ্যে এখানে থাকতে হবে। আজাদ লোকটার কাছে ফিরে যায়। গায়ের সোয়েটারটা খুলে তার হাতে দিয়ে বলে, 'তুমি আইয়ুব খান না ৬ দফা?'

ফকির বলে, 'আলাহ ভরসা বাবা, আমারে যে নিতে আইল না।'

আজাদ বলে, 'আলাহর নাম লও আর-কি!'

বাসার সামনে গিয়ে দেখে মা দাঁড়িয়ে আছেন রাস্তায়। 'এটা তোর কী বিচার-' মা বলেন, 'কারফিউ শুরু হয়েছে কখন, আর তুই এতক্ষণে এলি! নাহ। এটা তোর একদম উচিত হয়নি। আমি তো চিন্তায় চিন্তায় কাহিল।'

'তুমি চিন্তা মা একটু বেশিই করো। আমি তো ৫টার আগেই গলিতে ঢুকে পড়েছি। একটা নুলা ফকির পড়ে আছে। তাকে নিতে কেউ আসে নাই। আমি তাকে সোয়েটারটা দান করে দিয়ে এলাম। যদি তাকে নিতে না আসে।'

মা বলেন, 'ভালো করেছিস বাবা। তোর অন্তরটা বড় হয়েছে, আমি খুব খুশি।'

জায়েদ বলে, 'ওইটা ফকির না। ওইটা পুলিশের গোয়েন্দা।'

মা বিস্মিত, 'বলিস কি তুই!'

আজাদ বলে, 'চোপ। বেশি কথা বলে।'

এত তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে আজাদের দমবন্ধ লাগে। কী করবে সে! মা চা বানিয়ে মুড়ি মেখে দেন। আজাদ তার ঘরে বসে মুড়ি চিবোয়। বই নিয়ে বসা যায়। এখনও বই পড়ার নেশাটা তার আছে। থ্রি কমরেডস বইটা নিয়ে সে পড়তে বসে। মশা বড় জ্বালাচ্ছে। তা ছাড়া ঠাণ্ডাও খুব। আজাদ বিছানায় উঠে বসে পায়ের ওপরে লেপ টেনে দেয়।

সারাটা পাড়া স্তব্ধ। মাঝে মধ্যে কুকুরের ডাক। মনে হয় ভোল্টেজ কম। আলোটা অনুজ্জ্বল দেখায়। লাইটের চারদিকে পোকা উড়ছে। একটা টিকটিকি তার কাছে বসে আছে ওত পেতে।

মা রান্নাঘরে। পিচ্চিগুলো তাঁকে সাহায্য করছে। কেউ কেউ পড়তে বসেছে। জায়েদ সব সময়ই শব্দ করে পড়ে। আজও তার ব্যতিক্রম নয়। শব্দ করে পড়ার উদ্দেশ্য যতটা না পড়াটা আত্মস্থ করা, তার চেয়েও বেশি মাকে বোঝানো যে সে পড়ছে।

মা মনে হয় মুরগি রাঁধছেন। গরম ঝোলের মসলাঅলা গন্ধ আসছে। আজাদের পেটে খিদেটা চাড়া দিয়ে ওঠে। সে বিছানা ছেড়ে উঠে রান্নাঘরে যায়। বলে, 'মা, দেখি তোমার মুরগির ঝোলে লবণ হয়েছে কি না!'

মা একটা চামচে ঝোল তুলে দেন। আজাদ দুবার ফুঁ দিয়ে ঝোলটা মুখে দিয়ে বলে, 'ফার্স্ট ক্লাস। তবে মা তুমি যে রোজ রাঁধো, নিশ্চয় ঝোল চাখো, নাইলে বুঝবা কেমন করে লবণ হয়েছে কিনা, তাইলে তুমি যে বলো তুমি আমিষ খাও না, এটা তো ঠিক না।'

মা হাসেন। বলেন, 'আমার খাওয়া লাগে না। আমি এমনিই রাঁধতে পারি।'

চুলার কমলা আলো এসে পড়েছে মায়ের মুখে। মাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।

ঠিক এই সময় বাইরে থেকে স্লোগানের শব্দ আসতে থাকে। এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে মানুষজন সব বেরিয়ে রাস্তায় নেমে যাচ্ছে। জায়েদ ছুটে আসে। 'দাদা, সবাই রাস্তায় যাইতেছে। চলো আমরাও যাই।'
মা বলেন, 'ব্যাপার কী না বুঝে তোরা কই যাস।'
আজাদ বাসার বাইরে এসে দেখে আশপাশের বাসার ছেলেপুলে সব বেরিয়ে এসেছে।
'কী হয়েছে?' আজাদ জিজ্ঞেস করে।
'আরে রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে মিলিটারি গুলি কইরা তিনজন প্রফেসররে মাইরা ফেলছে। বিবিসিতে কইছে। আবার কালকা সারা দিন কারফিউ ডিক্লেয়ার করছে। তাই শুইনা ক্ষেইপা লোকজন রাস্তায় নাইমা পড়তেছে'-একজন জবাব দেয়।
আজাদ ঘরে ফিরে এসে তাড়াতাড়ি একটা প্যান্ট পরে নেয়। একজোড়া কেডস পায়ে দেয়। বিবিসির খবরটা এখন থেকে নিয়মিত শুনতে হবে-আজাদ ভাবে। পারফিউম স্প্রে করার সময় এখন নাই। সে বেরিয়ে পড়ে ঘর থেকে। এখানে ওখানে খণ্ড খণ্ড মিছিল। নুলো ফকিরটা পর্যন্ত তার ঠেলাগাড়িতে চড়ে চলেছে স্লোগান দিতে দিতে। তাকে ঠেলছে আরেক ভিক্ষুক।
মগবাজার মোড়ে আসতে আসতে মিছিল মহা মানবসমুদ্রে পরিণত হয়। আজাদ মগবাজার মোড়ে তার পরিচিত বন্ধুবান্ধবদেরও দেখতে পায়। আশরাফুল, ওমর, ফারুক, কাজী কামাল, হাবিব-সবাই মগবাজারের মোড়ে মিছিলে অংশ নিচ্ছে। কাজী কামাল আজাদকে দেখে বলে, 'দোস্তো, সিগারেট দ্যাও।' আজাদ সিগারেটের প্যাকেট বের করে। তারা স্লোগান ধরে : 'রক্ত দিলেনগুরু, সংগ্রাম হলো শুরু।'
দৈনিক ইত্তেফাক-এর রিপোর্টারও শহরে চক্কর দিচ্ছেন। কিছুদিন আগে ইত্তেফাকের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে। আজাদদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। ওমর তাঁকে চেনে। ওমর বলে, 'ভাইয়া, কী খবর।'
রিপোর্টার বলেন, 'সারাটা শহর মনে হচ্ছে অগ্নিগিরি। লাভা বেরুচ্ছে। আজকেই আইয়ুব খানের দিন শেষ।'
রিপোর্টার টিকাটুলির মোড়ে অফিসে ফিরে গিয়ে লিখতে বসেন :
গত রাত্রে রাজধানী ঢাকা নগরীতে অকস্মাৎ সান্ধ্য আইনের কঠিন শৃঙ্খল এবং টহলদানকারী সামরিক বাহিনীর সকল প্রতিরোধ ছিন্নভিন্ন করিয়া হাজার হাজার ছাত্র-জনতা আকিস্মক জলোচ্ছ্বাসের মত পথে নামিয়া আসে এবং শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও 'আগরতলা' ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে।

ইন্ট্রোটা লিখে তিনি চিৎকার ওঠেন, 'আসগর, চা দে।' আসগর হলো অফিসের পিয়ন। তাকে পাওয়া যায় না। আর দুই বার চিৎকার করার পর একজন সাব-এডিটর এসে জানায়, 'অফিসে পিয়নরা কেউ নাই। সবাই মিছিলে গেছে।'
'আরে, এ যে কুত্তা খুঁজতে গিয়ে পত্রিকা বের হলো না অবস্থা। কম্পোজিটররা আছে তো!'
'আছে। আপনে তাড়াতাড়ি লেখেন। সিরাজ স্যারে বইসা আছে। মিজান ভাইয়ে রাজশাহীর নিউজ বানাইতেছে। প্রোক্টর শামসুজ্জোহা মারা গেছেন। আরো ১ জন নিহত, ৪ জনগু লিবিদ্ধ।'
'যতটুকু লিখছি কম্পোজে ধরিয়ে দেন। আমি বাকিটা লিখতে থাকি।'
তিনি লিখে চলেন : এই অবস্থার মধ্যে আজ সকাল ৭টা হইতে বৈকাল ৫টা পর্যন্ত সান্ধ্য আইনের যে বিরতি ঘোষণা করা হইয়াছিল, তাহা অকস্মাৎ প্রত্যাহার করা হয় এবং কোনওরূপ বিরতি ছাড়াই পরবর্তী ২৪ ঘণ্টা সান্ধ্য আইন জারি করা হয়।
খোঁজ লইয়া জানা যায়, গতকল্য রাজশাহীতে জনৈক অধ্যাপকের হত্যা এবং সান্ধ্য আইন জারির খবর এখানকার ছাত্র ও সর্বশ্রেণীর নাগরিকের মনে প্রবল অসন্তোষের সঞ্চার করে। তদুপরি গতকল্যকার সংবাদপত্রে আগরতলার ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তি সম্পর্কে আশাবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরেও শেখ সাহেব গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের উদ্দেশ্যে গতকাল ঢাকা ত্যাগ না করায় ছাত্র জনমনে এই বিশ্বাস দানা বাঁধিয়া উঠে যে, শেখ সাহেবের মুক্তির ব্যাপারে সরকার আন্তরিক নহেন। বর্তমান প্রচণ্ড গণজাগরণের পটভূমিতে উপরোক্ত দুইটি ঘটনা ছাত্র-জনতাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তোলে এবং তাহারা সান্ধ্য আইনের অনুশাসন উপেক্ষা করিয়া দাবি-দাওয়ার প্রতিধ্বনি করিবার জন্য অকস্মাৎ রাস্তায় নামিয়া আসে।
কোনও রকম পূর্ব ঘোষণা বা পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই প্রায় একই সঙ্গে শহরের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এইভাবে ছাত্র-জনতাকে রাস্তায় বাহির হইতে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হয়। রাত্রি ৮টার পর হইতে মধ্য রাত্রি পার হইয়া যাওয়া পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন স্থানে সমানে বিক্ষোভ চলিতে থাকে।
সামরিক বাহিনীর গাড়ির শব্দ এবং বিক্ষিপ্তভাবে বন্দুকের গুলির আওয়াজ পরিবেশকে আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া তোলে।
পরের দিন ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯-এর দৈনিক ইত্তেফাকে এই রিপোর্ট ছাপা হয়।
রাত্রি বেড়ে চলে। বাসার আর সবাই ঘুমে অচেতন। শুধু আজাদের মা জেগে আছেন। আজাদ আর জায়েদ বাইরে গেছে। এখনও ফিরল না। এককেটা বন্দুকের গুলির

আওয়াজ হয়, আর মায়ের হৃৎপিণ্ড কেঁপে কেঁপে ওঠে। এই শীতের রাতেও তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা যায়।

রাত দুটোর দিকে আজাদ আর জায়েদ ফেরে।

মা কোনো কথা না বলে খাবার টেবিলের সরপোশগুলো সরাতে থাকেন। বলেন, 'হাত-পা ধুয়ে আসো। আমি খাবার গরম করি।'

ভাত খেতে খেতে আজাদ আর জায়েদ রাস্তায় কোথায় কী ঘটেছে, তার গল্প করতে থাকে।

মা বলেন, 'আজাদ, তোকে যে বলেছিলাম, তুই মিছিলে যাবি না।'

আজাদ বলে, 'মা, আজকা তো এটা মিছিল না। এটা হলো গিয়ে আইয়ুব খানের কুলখানি। আইয়ুব খান আজকেই শেষ। রাস্তায় মানুষ আর মানুষ। এইটাতে যাওয়ায় দোষ নাই। না গেলে দোষ আছে।'

মা দীর্ঘশ্বাস গোপন করেন। ছেলে বড় হয়ে গেলে সে বাইরের ডাকে সাড়া দেবেই। মা কি আর তাকে আটকে রাখতে পারবে? সব মা-ই আটকে রাখতে চায়, কিন্তু কোন মা-ই বা পারে?

২১

আজাদ ভাইয়ের মা মারা গেছে, এই খবরটা সৈয়দ আশরাফুল হক পেয়েছে কদিন পরে। খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে এক সুতীব্র বেদনাবোধ বেড়ের মতো যেন তার কলজে কেটে চলে। সে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। কত স্মৃতি, কত কথা। জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক সৈয়দ আশরাফুল হক ওরফে বাবু বয়সে আজাদের চেয়ে ছোট। সেও ছাত্র ছিল সেন্ট গ্রেগরি স্কুলের। আগে তাদের বাসা ছিল হাটখোলায়, সেখান থেকে ১৯৬৬ সালে তারা চলে আসে ইস্কাটনে। আজাদ ভাই বলতে সে ছিল অজ্ঞান। আজাদের মা মারা যাওয়ার কয়েক দিন পরে এই ক্রিকেটার দুঃসংবাদটা শুনতে পায়। তার চোখ স্মৃতিজলে ঝাপসা হয়ে আসে। আজাদ ভাইকে তার কাছে মনে হতো ওই সময়ের ঢাকার আদর্শ যুবক। সে বিড়বিড় করতে থাকে, 'আজাদ ভাই ছিল শহরের সবচেয়ে ফ্যাশনেবল, সবচেয়ে সুদর্শন যুবক। তার রুচি ছিল স্নিগ্ধ আর অভিজাত, সবচেয়ে ভালো পোশাক পরত সে, সবচেয়ে ভালো বই পড়ত, সবচেয়ে ভালো গান শুনত। সে ছিল আমার গুরু। তাকে আমরা ডাকতাম এলভিস প্রিসলি বলে। আর তার মাকে আমি ডাকতাম মা বলে। মা ছিলেন মাটির কাছাকাছি থাকা এক মহিলা।'

তবে আশরাফুল হক শুনতে পেয়েছিল, এক সময় আজাদের মাও অত্যন্ত শৌখিন ছিলেন, ফ্যাশনেবল মহিলা ছিলেন। কিন্তু সাফিয়া বেগমের এই রূপ আশরাফুল দেখেনি। তাকে সে একবার বলেছিল, 'মা, মা, তুমি নাকি আগে অনেক ফ্যাশনেবল আছিলা, ঠিক নাকি?'

জবাবে সাফিয়া বেগম কিছুই বলেননি। কেবল মিটিমিটি হেসেছেন।

সৈয়দ আশরাফুল হক বাবুদের সঙ্গে আজাদদের পারিবারিক সম্পর্ক ছিল। আজাদের বাবার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল আশরাফুল হক বাবুর বাবা কৃষক শ্রমিক জনতা পার্টি নেতা আজিজুল হক নান্না মিয়ার। আজাদের মাও আসতেন তাদের বাসায়।

সৈয়দ আশরাফুল হক ক্রিকেট তো খেলতই। বাস্কেটবলও খেলত। আজাদ নিজে খেলত না, কিন্তু খেলোয়াড়দের পছন্দ করত খুবই। সব সময় স্টেডিয়ামপাড়ায় আড্ডা দিতে যেত।

আশরাফুল হকের মনে পড়ে যায় তারুণ্যভরা সেইসব দিন, যখন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৭/৮ ঘণ্টা সে আড্ডা দিত আজাদের সঙ্গে। বিশেষ করে সন্ধ্যার পরে তাদের আড্ডাটা জমত ভালো। অন্য ক্রিকেটার বাস্কেটবল খেলোয়াড়রাও যোগ দিত সেই আড্ডায়। রাত ১টা-২টা পর্যন্ত চলত ম্যারাথন গল্পগুজব, রাতের বেলা মগবাজার মোড়ের ক্যাফে ডি তাজে বিরিয়ানি খেয়ে তারপর তারা ঘরে ফিরত।

আজাদের ব্যবহারও ছিল খুবই অমায়িক। সে আশরাফুল হককে বলত, 'বুঝলা, সব সময় মনে রাখবা, তুমি যদি অন্যের সাথে ভালো ব্যবহার করো, অন্যরাও তোমার সাথে ভালো ব্যবহার করবে।'

১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের সময় ঢাকায় আসার কথা ছিল এমসিসি ক্রিকেট দলের। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সুবিধার নয়, এই অজুহাতে তাদের এ কর্মসূচি বাতিল করা হয়। বিক্ষোভে ফেটে পড়ে ঢাকার ক্রিকেটার আর ক্রিকেটামোদীরা। তারা নানা ধরনের বিক্ষোভ কর্মসূচি হাতে নেয়। একটা কর্মসূচি ছিল ক্রিকেট ব্যাট পুড়িয়ে দেওয়া। এইসব কর্মসূচিতে সৈয়দ আশরাফুল হক, জুয়েল প্রমুখ ক্রিকেটারের সঙ্গে আজাদও অংশ নিয়েছিল।

২২

আজাদেরা চলে আসে ৩৯ মগবাজারের বাসায়। হাজি মনিরুদ্দিন ভিলায়। এ কথা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার মুক্তিযোদ্ধাদের শিরদাঁড়া দিয়ে বরফের সাপ নেমে যায়। কারণ এই বাসার দেয়ালে এখনও লেগে আছে গুলির সীসা। এই বাসাতেই

আজাদেরা ছিল একাত্তরে, এখানেই আশ্রয়-প্রশ্রয় পেয়েছিল বহু মুক্তিযোদ্ধা, এখানে রাখা হয়েছিল অনেক অস্ত্রপাতি-গোলাবারুদ। এই বাসা থেকেই আজাদ গিয়েছিল যুদ্ধে। এখান থেকেই ২৯শে আগস্ট ১৯৭১ দিবাগত রাতে, অর্থাৎ ৩০শে আগস্টের প্রথম প্রহরে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় আজাদকে। এরপর আজাদ আর কোনো দিন ফিরে আসেনি।
মগবাজারের দিনগুলোর কথা জায়েদ কিংবা টগর ভুলতে পারে না, পারবেও না। কারণ এই বাসাতেই তারা গুলিবিদ্ধ হয়েছিল, সারা রাত নাকি পড়ে ছিল রক্তশয্যায়, অচেতন। জায়েদের হাতের তালু আবার ঘামতে থাকে, শরীরে বোধ হতে থাকে উত্তাপ।
কিন্তু মগবাজারে তাদের দিনগুলো আনন্দপূর্ণই ছিল। আজাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পরীক্ষা দিচ্ছে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে। পাশাপাশি চেষ্টা করছে ব্যবসাপাতি করবার, সংসারটার হাল ধরবার। ফলে তাদের সুদিন ফিরে আসছে, এ রকম একটা ধারণা তাদের হচ্ছিল।
আজাদের মাও যেন এ রকম একটা সুদিনের অপেক্ষাতেই ১০টা বছর ধরে কষ্ট আর সংগ্রাম করে আসছেন। তখন জায়েদের একটা দৈনন্দিন কাজ ছিল কাওরানবাজারে সকালবেলায় গিয়ে বড় বড় পাবদা মাছ কিনে আনা। পাবদা মাছ খুব প্রিয় ছিল আজাদের। তা এ বাজার করার কাজটা তখন জায়েদ আনন্দের সঙ্গেই করত। তার তো বেশি দরকার ছিল না, কোনোমতে তিনটা টাকা সরাতে পারলেই একটা রিয়ার স্টলের টিকেট জোগাড় হয়ে যেত। এরই মধ্যে জায়েদের এসএসসি পরীক্ষা হয়ে গেছে, সে পাসও করেছে। ফলে এখন হাতে তার প্রচুর সময়। ছবি দেখাটা সে সময়ের একটা উত্তম ব্যবহার বলে সে গণ্য করত। তবে আরেকটা মজার উপদ্রব ঢাকা শহরে তখন দেখা দিয়েছিল। টেলিভিশন। তাদের বাসায় টেলিভিশন ছিল না। কিন্তু পাশের বাড়িঅলা কুলি খানের একটা টিভিসেট ছিল বটে। তাদের ঘরে টিভি দেখা হতো সন্ধ্যায়, রাতে। জানালা খোলা থাকত। দু বাড়ির মধ্যে একটা অভিন্ন প্রাচীর। সেটায় বসলে ভেতরের টেলিভিশন বেশ আরাম করেই দেখা যেত। সত্য বটে, কুলি খানের দুই মেয়ে ছিল, কিন্তু তাদের দিকে জায়েদের কোনো নজর ছিল না। একদিন সন্ধ্যায় জায়েদ মগ্ন হয়ে টেলিভিশন অনুষ্ঠান দেখছে তার পাঁচিল-আসনে বসে, অনায়াসে, আয়েশ করেই। হঠাৎই একটা লাঠির বাড়ি এসে পড়ে তার পায়ের কাছে দেয়ালের গায়ে। সে তাড়াতাড়ি সরে যায় খানিক। তখনই হুঙ্কার। জায়েদ দেখতে পায় কুলি খানের টাক বারান্দা থেকে আসা আলোয় চকচক করে উঠছে, কুলি খানের হাতের লাঠি আবার দুলে উঠলে জানালা দিয়ে আসা টেলিভিশনের আলোয় সেটা একটা লাঠির একাধিক সচল প্রতিচ্ছবি তৈরি করে তার দিকেই এগিয়ে আসে, কর্তব্য স্থির করতে জায়েদের সময় লাগে না, সে লাফ দিয়ে দেয়ালের এপারে নেমে আসে, কিন্তু আসার আগে তার কাঁধে লাঠির একটা বাড়ি পড়েই যায়। কুলি খানের সরোষ হুঙ্কার চলে আরো খানিকক্ষণ। আজাদ বাসায় ছিল। সে এগিয়ে আসে।
জায়েদ তাড়াতাড়ি অন্তর্ধান করার সুযোগ খোঁজে।
'কী হয়েছে রে জায়েদ, মেয়ে দেখতে উঠেছিলি?' আজাদ বলে।
'না দাদা, টিভি দেখতে উঠছিলাম।'
'টিভির জন্যে বাড়ি মেরেছে। ছোটলোক আছে তো। চল।'
'কই যাইবেন?'
'বায়তুল মোকাররম। এখন খোলা আছে? না বন্ধ হয়ে গেছে?'
'৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে তো!'
'তাহলে এখনই চল বায়তুল মোকাররমে যাই। টিভি কিনে আনি।'
সে রাতেই তারা বায়তুল মোকাররমের টেলিভিশনের দোকানে যায়। বেশির ভাগ দোকান তখন বন্ধ হয়ে গেছে। একটা দুটো খোলা আছে। জায়েদ বলে, 'দাদা, কালকা আসি। বাইছা ঘুইরা দামাদামি কইরা কিনি।'
'না। আজকেই কিনতে হবে।' আজাদ বলে।
তারা একটা স্যানিও ব্লাক অ্যান্ড হোয়াইট টেলিভিশন সেট কেনে, দাম পড়ে ৯৭০ টাকা। বাসায় ফিরে আসার পর টিভিযন্ত্রটা রাতেই সেট করা হয়। সেট করা হয় কুলি খানের বাড়ির দিকের রুমটায়। জানালা খুলে সাউন্ড বাড়িয়ে অন করা হয় টিভি।
সেই থেকে এই বাসায় টিভি চলে। জায়েদের খুব প্রিয় অনুষ্ঠান ত্রিরত্ন। হাসির অনুষ্ঠান। ওটা শুরু হলেই আজাদ হাঁক পাড়ে, 'জায়েদ চলে আয়।' আর আজাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লুসি শো।
কিন্তু এক রাতে টিভিতে তার প্রিয় অনুষ্ঠান দেখতে বসে জায়েদ রীতিমতো ক্ষেপে যায়। অনুষ্ঠান বন্ধ করে হচ্ছে হাম্‌দ আর নাত। তারপর দেশাত্মবোধক গান। জায়েদ বসেই থাকে। এরপর যদি ত্রিরত্ন হয়? না, হয় না। তার বদলে পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীত-পাক সাদ জমিন সাদ বাদ... ব্যাপার কী?
ব্যাপার কিছুই নয়। নতুন সামরিক আইন প্রশাসক এখন জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন। কেমন লাগে? দিন-দুই তিন আগে, ২৪শে মার্চ ১৯৬৯, আইয়ুব খান বিদায় নিয়েছে। এসেছে ইয়াহিয়া খান। ঢাকার লোকদের মধ্যে অবশ্য তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া নাই। আইয়ুব খান যাওয়ায় লোকে খানিকটা খুশি। জায়েদ তো আর রাজনীতি বোঝে না। সে বোঝে টেলিভিশনের অনুষ্ঠানের ভালো-মন্দ। হাসির নাটক না হয়ে এই শালা মিলিটারি জেনারেলের ইংরেজি বক্তৃতা কে শোনে?
সে রাগে গজর-গজর করতে থাকে।

২৩

বাশার চিঠি লিখেছে আজাদকে। তার পড়াশোনা শেষ। এখন সে আর করাচিতে থাকতে নারাজ। ঢাকায় চলে আসবে। ঢাকায় তার কিছু আত্মীয়স্বজন আছে বটে। তবে সেখানে সে উঠতে চায় না।

আজাদ তাকে তাড়াতাড়ি চিঠির জবাব লেখে। 'তোমার কোনো চিন্তা করার দরকার নাই। তুমি শুধু চলে আসো। ঢাকার মাটিতে পা রাখো। বাকি দায়িত্ব আমার।'

এয়ারপোর্টে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আজাদ। বাশার বের হয়। আজাদ তাকে জড়িয়ে ধরে। কত দিন পরে দেখা হলো দুবন্ধুর। প্রায় দেড় বছর।

আজাদ ট্যাক্সি দাঁড় করিয়েই রেখেছিল। তারা ট্যাক্সিতে ওঠে। তেজগাঁও থেকে মগবাজার। পৌঁছতে বেশি দেরি হয় না।

মা তৈরি হয়েই ছিলেন। জানেন আজকে আজাদের করাচির বন্ধু আসবে। তিনি ভালো-মন্দ রান্না করেই রেখেছেন।

মগবাজারের বাড়িটায় রুম আছে তিনটা। একটা রুম বাশারের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।

পরদিন বাশার যায় টাঙ্গাইল। তার বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। তার বাবা পুলিশে চাকরি করেন। টাঙ্গাইলে তাদের অনেক বিষয় -সম্পত্তি।

দুদিন পরে বাশার ফিরে আসে আজাদদের বাসায়। পড়াশোনা শেষ। এখন চাকরি-বাকরি খোঁজা দরকার। ঢাকায় থাকতে হবে। কোথায় থাকবে!

আজাদের মা মানুষের জন্যে করতে পারলে খুশি হন। আজাদও ভয়ানক বন্ধুবৎসল। আজাদ স্পষ্ট করে বলে দেয় বাশারকে, 'যত দিন তোমার চাকরি না হচ্ছে, ততদিন তুমি এ বাসায় থাকবা। এই রুমটা তোমার।'

বাশার বলে, 'তা কী করে হয়। আমি একটা রীতিমতো বাইরের লোক। আমার খাওয়া-দাওয়া, থাকা, একটা খরচ আছে না! আজাদ তো এখনও ভালো কিছু করে না। ওর পড়াশোনাও শেষ হয় নাই। এমন না যে বাবার কাছ থেকে ও সাহায্য নেয়।'

আজাদের মা বলেন, 'বাবা, তোমাকে এত চিন্তা করতে হবে না। আমরা যদি খাই, তুমিও খাবে, আমরা যদি না খেয়ে থাকি, তুমি না খেয়ে থাকবে। পারবে না?'

'তা পারব।' বাশার মাথা নাড়ে।

সেই থেকে বাশার রয়ে যায় এ বাসাতেই।

পরে, ইতিহাসের আরেক প্রান্তে দাঁড়িয়ে জায়েদের মনে হবে, আজাদের মায়ের মনে হবে, বাশার এ বাসায় না উঠলেই ভালো করত। মৃত্যুই বোধ করি তাকে টেনে এনেছিল এ বাসায়।

বাশার চাকরি খুঁজতে থাকে। কয়েক দিনের মধ্যেই মর্নিং নিউজ পত্রিকায় চাকরিও পেয়ে যায় সে।

আজাদের মতো বাশারেরও ঝোঁক ছিল সাহিত্যপাঠের দিকে। নিউমার্কেট গিয়ে সেও বই কেনে। চাকরিতে যোগ দিয়ে প্রথম মাসের বেতন পেয়ে সবার আগে সে আজাদের মায়ের হাতে দেয় কিছু টাকা, বলে, 'খালাম্মা, আমি তো আপনার ছেলের মতোই। আপনার ছেলে চাকরি করলে নিশ্চয় আপনার হাতে টাকা দেবে। আমিও বেতন পেয়েছি, প্রত্যেক মাসে কিছু কিছু টাকা আমি আপনাকে দেব। আপনি না করতে পারবেন না।'

এ কথা শোনার পরে আজাদের মা না-ই-বা করেন কী করে?

তারপর বাশার যায় নিউমার্কেটে। কিনে আনে পেঙ্গুইন ক্লাসিকের কয়েকটা বই। টলস্টয়ের চাইল্ডহুড, বয়হুড, ইয়ুথ বইটা তার মধ্যে একটা। কিন্তু যতই সে মন দিয়ে বই পড়ুক না কেন, টেলিভিশনে শাহনাজ বেগমের (পরবর্তীকালে রহমতুল্লাহ) গান হলে তাকে ডাকতেই হবে।

সে হা করে তাকিয়ে থাকে শাহনাজ বেগমের মুখের দিকে।

আজাদ বলে, 'বাশার, তুমি কি গান শোনো, না গেলো? তারপর নিজেই খোলাসা করে, মনে হয় তুমি কান দিয়া গান শোনো, আর চোখ দিয়া ছবি গেলো।'

বাশারের কানে এসব টিপ্পনি ঢোকে না। সে শাহনাজ বেগমের মুখের দিকে হা করে তাকিয়েই থাকে।

২৪

আজাদের পরীক্ষা। বাসার সবাই সন্ত্রস্ত। মা কাউকে কথা বলতে দেন না। শব্দ করতে দেন না। সবাই কথা বলে ফিসফিস করে। বাসায় ডিমের প্রবেশ নিষিদ্ধ। ছেলে যদি পরীক্ষায় যাওয়ার আগে ডিম দেখে তাহলে সে পরীক্ষায় গোল্লা পেয়ে যেতে পারে।

সকালবেলা মা চিনির শরবত বানিয়ে আনেন আজাদের সামনে। 'এই চিনিটা পড়া চিনি। জুরাইনের বড় হুজুর নিজে চিনিতে ফুঁ দিয়ে দিয়েছেন। বাবা, বিসমিল্লাহ বলে খা। তিন ঢোকে খাবি। আরে কী করিস, বসে খা।'

'কী জিনিস?'

'আছে। হুজুর দিয়েছেন।'

আজাদ প্রশ্ন না করে খায়। মা আজাদের মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, 'ইনশালাহ পরীক্ষা ভালো হবে।'
আজাদ বলে, 'তুমি দোয়া করলে তো ভালো হবেই।'
'আলাহর রহমতে। তবে চেষ্টাও করতে হবে। তুই তো এবার অনেক পড়াশোনা করেছিস।'
গোসল সেরে নিয়ে কাপড়-চোপড় পরে আজাদ প্রস্তুত হয়। পাইলট কলম। ইয়ুথ কালি। কলমে সে সকালেই কালি ভরে নিয়েছে। সঙ্গে আরেকটা কলম। পকেটে আইডি কার্ড। সব ঠিক আছে। আজাদ মাকে কদমবুসি করে। মা বলেন, 'বাবা, বিসমিলাহ করে বের হ। ডান পা আগে দিস। পরীক্ষার খাতা হাতে পেয়ে বিসমিলাহ বলে আগে রাব্বি জেদনি এলমান তিনবার পড়বি। ইনশালাহ পরীক্ষা ভালো হবে।'
আজাদ বেরিয়ে যায়।
মা তাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দেন। ছেলে হেঁটে চলে যায় দৃষ্টির আড়ালে। তবু মা গেট ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন। এটাই ছেলের শেষ পরীক্ষা। এমএ ফাইনাল। এই পরীক্ষায় পাস করলেই মায়ের মিশন শেষ। ছেলেকে নিয়ে তিনি একদিন একবস্ত্রে ইস্কাটনের বাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছিলেন। তখনও সে স্কুলে পড়ে। ম্যাট্রিকও পাস করেনাই। নাবালক। তাঁর নিজের কী হবে তিনি জানেন না। ছেলের কী হবে, তাও জানেন না। স্বামীর বাড়ি থেকে চলে আসার পর ছেলে স্কুল ছেড়ে দিল। সাফিয়া বেগমের বোন মারা গেল। কী ভীষণ দিন গেছে একেকটা। এমন দিনও গেছে, চাল কেনারও টাকা ছিল না। ছেলে উচ্ছন্নে যাওয়ার জোগাড়। সেখান থেকে সে ফিরে এল। ম্যাট্রিক পাস করল। আইএ পাস করল। বিএ পাস করেছে। এবার এমএ। কূলে এসে গেছে তরী। অচিন সমুদ্র পাড়ি দিয়ে। এখন শুধু বন্দরে ভিড়বার অপেক্ষা। তাঁর নিজের জীবনে তিনি আর কিছু চান না। ছেলের পরীক্ষাটা এখন ভালোয় ভালোয় শেষ হলে হয়। তারপর ছেলের নিজের জীবন সে নিজে গড়ে নেবে। তাঁর কিছু বলার নাই। বাবার বিষয়-সম্পত্তির ভাগ সে পেলে পেল। না পেলেও কিছু যায় আসে না। তিনি নিজের চোখের সামনে আজাদের বাবাকে ছোট থেকে বড় হতে দেখেছেন। বিষয়-সম্পত্তি আসল কথা নয়। আসল কথা হলো ঘরের শান্তি। মনের শান্তি। ছেলেকে তিনি খুব ভালো একটা মেয়ে দেখে বিয়ে দেবেন। লক্ষ্মী শান্ত একটা মেয়ে দেখে। তারপর সংসারের ভার ছেড়ে দেবেন বউমার হাতে। তিনি সংসারের নিত্যদিনের কচকচানির ঊর্ধ্বে উঠে যাবেন। বই পড়বেন। ইদানীং কাজের চাপে আর দুশ্চিন্তায় গল্পের বই পড়া হয় না। শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ বইটা আলমারি থেকে নামিয়ে রেখেছেন, কিন্তু পড়া আর হচ্ছে না।
'আম্মা, কালা মুরগিটা কোনখানে ডিম পাড়ছে দ্যাখো'-মহুয়া চিৎকার করে।
'কোনখানে?'
'এই যে স্টোরের চিপায়।'
'কই, দেখি দেখি।'
'দেখবা। তোমার ছেলে না পরীক্ষা দিতে গেছে। তুমি ডিম দেখলে হে ফির গোলা-পাইব না তো!'
'তাও তো কথা। তাহলে আমি আর দেখি না। তুই বুঝমতো মিছিল করে রাখ।'
মহুয়া খিলখিল করে হেসে ওঠে-'আম্মা, তুমি যে কী না। দাদায় দেয় পরীক্ষা, আর তুমি ডিম না দেখা নিয়া শাস্ত্র মানো। হিহিহিহিহি। মুরগির ডিম না দেখলেই যদি এমএ পাস দেওন যাইত, তাইলে বহু লোকে এমএ বিএ হইয়া যাইত।'

২৫

আজাদের মায়ের মৃত্যুর পরে আজাদের খালাতো বোন কচিরও কত কথা মনে পড়ে। জন্মাবধি সে তার এই খালার কাছেই মানুষ। ১৯৬৯-৭০ সালে তার বয়স কত আর হবে, ১০/১১ বছর। এই সব সময়ের মধুর সব স্মৃতি তার মনে উঁকি দেয়। তার মনে পড়ে, তাদের খালা সাফিয়া বেগম, যাকে তারা ডাকত আম্মা বলে, সব সময় শুদ্ধ বাংলায় কথা বলতেন। একবার কী উপলক্ষে কচি বলেছিল দুবলা ঘাস, আম্মা বলেছিলেন, 'কী বললে, দুবলা নয়, বলবে দূর্বা। শোনো, কলকাতার ভিখারিরাও সুন্দর করে কথা বলে। এসে বলে, মা দুটো চাল দিন না মা! শুনতেও কত ভালো লাগে।'
আম্মা সব সময় বই পড়তেন। শরৎচন্দ্র তাঁর ছিল সবচেয়ে প্রিয় লেখক। রবীন্দ্রনাথের বই পড়তেন খুবই মন দিয়ে। বাসায় উল্টোরথ রাখা হতো। আম্মার হাতে থাকত এই পত্রিকাটা। উল্টোরথ-এর গল্প-উপন্যাস তিনি মন দিয়ে পড়তেন।
কচিও ছিল গল্পের বইয়ের পোকা। একটা নতুন বই বাসায় এলে কে আগে পড়বে, এই নিয়ে প্রতিযোগিতা হতো আম্মার সঙ্গে তার। শেষে আম্মাও পড়ছেন, তিনি কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লে কচিও পড়ছে, এই রকম চলত। তারপর আবার অবসর পেলে আম্মা পড়ার জন্যে বই হাতে নিতেন। নিয়েই বলতেন, 'কচি...'
'জি আম্মা।'
'আমার চিহ্ন কই?'
কচি জিভে কামড় দিত। আম্মা কোন পাতা পর্যন্ত পড়েছেন, একটা চিহ্ন দিয়ে রেখেছিলেন। এটা সে হারিয়ে ফেলেছে। আজকে যে প্রথম সে পেজ মার্কার হারাল, তা

নয়। প্রায়ই সে এই কর্মটি করছে। আম্মার পেজ মার্কার হারিয়ে ফেলছে। বা নিজে পড়তে পড়তে বিভোর হয়ে গিয়ে পেজ মার্কার ফেলে দিচ্ছে মাটিতে। পরে সেটা তুলে যে পাতায় রাখছে, সেটা আর যা-ই হোক, আম্মার কাঙ্ক্ষিত পাতা নয়।

আজাদ দাদাও খুব বই পড়ত। আজাদ দাদা শুধু যে ইংরেজি বই পড়ত, তা নয়, বাংলা বইও পড়ত খুব। আর তার ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া বন্ধুদের বলত, তোদের জন্যে আমার খুব আফসোস হচ্ছে রে। তোরা রবীন্দ্রনাথ পড়িস না! শরৎচন্দ্র পড়িস না! মানিক, তারাশঙ্কর পড়িস না! তোদের হবে কী?

একবার আজাদ দাদা একটা মজার কাণ্ড করেছিল। কচিরা গিয়েছিল জোনাকি সিনেমা হলে ছবি দেখতে। মহুয়া, তার বর, আর সে। তারা ফিরে আসার পরে আজাদ দাদার সঙ্গে দেখা।

'কই গিয়েছিলি?' আজাদ দাদা বলে।

'সিনেমা দেখতে'-কচি বাসার ভেতরে দৌড় ধরে।

'এই এই, কই যাস? এদিকে আয়। শোন, হাতমুখ ধুয়ে খেয়েদেয়ে একটা রচনা লিখবি। এই যে সিনেমা হলে যাওয়া থেকে শুরু করে পুরা সিনেমাটা কী দেখলি, এই অভিজ্ঞতাটা নিজের ভাষায় লিখবি।'

দাদার আদেশ, তারা ফেলতে পারে না। কচিকে ঠিকই লিখতে বসতে হয়। সিনেমা হলে রিকশায় চড়ে যাওয়া আর ফিরে আসা, মধ্যখানে বাদাম খাওয়া-এসব না হয় সে লিখল। কিন্তু রাজ্জাক আর কবরীর মধ্যে যে ভাব-ভালোবাসা হলো, এই কাহিনী সে এখন কীভাবে লেখে? রচনার ভেতরে সেসব লেখা যায়? কচি খুবই মুশকিলে পড়ে যায়।

মাঝে মধ্যে আজাদ ডাকত কচিকে, 'কচি, এদিকে আয়। একটা গান শোনা তো।'

আজাদ দাদাকে গান শোনাতে কচির তেমন সংকোচ নাই। কিন্তু পাশেই বাশার দাদা যে রয়ে গেছে। বাইরের মানুষ। তার সামনে কি কচির লজ্জা লাগে না!

'কী, গা।'

কচি হাত কচলায়।

'এখন গান না শোনালে সিনেমা দেখতে যাওয়া বন্ধ। জোনাকিতে ভালো সিনেমা এসেছে।'

কচি বলে, 'কোন গানটা শোনাব?'

বাশার বলে, 'ওইটা শোনাও। আমি যে কেবল বলেই চলি, তুমি তো কিছুই বলো না।'

কচি আরো লজ্জা পায়। এটা হলো আগন্তুক ছবিতে কবরীর গাওয়া গান। এই গান এখানে গাওয়া যায়? শেষে আজাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আর নতুন ছবি দেখতে যাওয়ার লোভে সে গলা খোলে, আমি যে কেবল বলেই চলি, তুমি তো কিছুই বলো না।

আর কচির মনে পড়ে, আম্মা তাদের ভাত তুলে খাওয়াতেন। আম্মার প্রত্যেকটা আঙুল সে চেটে চেটে খেত। তবে আম্মার সঙ্গে মাঝখানে তার আর থাকা হয়নি। যুদ্ধের পরে নিজের পছন্দমতো বিয়ে করেছিল আম্মা রাগ করেছিলেন তার ওপরে। কচি ওই বাসায় যায়নি বহুদিন। এই তো কদিন আগে আম্মা তাঁর জীবনের শেষের দিকে এসে তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

২৬

আজ ইলেকশন। কিশোর জায়েদ বোঝে না, ইলেকশন কী? তবে তার মধ্যে তীব্র কৌতূহল। সে ইলেকশন দেখতে যাবে। চারদিকে নৌকা মার্কার জয়জয়কার। এবার নাকি নৌকার জয় হবে। নৌকা ছাড়া মার্কা আছে হারিকেন। এই কদিন শহরটা ইলেকশন ইলেকশন করে পাগল হয়ে গেছে। মাঝে মধ্যেই মিছিল বের হয়, মার্কাটা কী? নৌকা। জাগো জাগো, বাঙালি জাগো। তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা। সেসব মিছিলে যাওয়ার তার খুব ইচ্ছা ছিল, একদিকে আম্মা, আরেক দিকে দাদা, এদের কঠোর শাসনে সেই খায়েশটা তার পূরণ হয়নি। এদিকে টেলিভিশনেও ভালো অনুষ্ঠান কম। কয়েক দিন প্রচার হলো শুধু ঘূর্ণিঝড় আর জলোচ্ছ্বাসের খবর। কী বড় জলোচ্ছ্বাসটাই না হয়ে গেছে কদিন আগে। ১০ লাখ লোক নাকি মারা গেছে। যে সে কথা!

জায়েদ বাসায় কিছু না বলে বেরিয়ে যায় নির্বাচন দেখতে। ডিসেম্বর মাস। ১৯৭০ সাল। বাইরে শীত পড়েছে ভেবে জায়েদ একটা সোয়েটার পরে ঘর থেকে বেরয়। কিন্তু বাইরে এসে বোঝে সে একটা ভুল করেছে। রোদ চড়চড় করছে। সোয়েটারটা গায়ে রাখা যায় না। সে সোয়েটার খুলে কাঁধে ঝোলায়। মুশকিলটা হলো, তার শার্টের পকেটটার সেলাই খুলে গেছে। পকেটটা বুকের কাছে ঝুলে আছে। ওপরে সোয়েটার থাকবে ভেবে সে আর শার্টটা পাল্টায়নি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, সবাই তার ছেঁড়া পকেটটার দিকেই তাকিয়ে আছে। সে গলায় পেঁচানো সোয়েটারের হাতাদুটো পকেটের ওপরে বারবার টেনে আনছে, যাতে এটা দেখা না যায়। আস্তে আস্তে সে চলে আসে মগবাজারের মোড়ে। ভোটটা হচ্ছে কোথায়? সে দেখতে পায়, রিকশার গায়ে নানা সুন্দর সুন্দর পোস্টার লাগানো। মনে হয় এই রিকশা ভোটের কাজ করছে। সে রিকশাঅলাকে জিজ্ঞেস করে, 'ভোট হইতাছে কই?'

'ওই তো ইশকুলে'-রিকশাওয়ালা দেখিয়ে দেয়।

ওরেব্বাস। স্কুলের সামনে ভিড়। আর পোস্টার টাঙিয়ে এলাকাটাকে একেবারে ছেয়ে ফেলেছে দেখা যাচ্ছে। গেটের কাছে লুঙ্গি, খাকি শার্ট আর খাকি জুতা পরা আনসার দেখা যাচ্ছে। লুঙ্গির সঙ্গে জুতা পরায় তাদের দেখা যাচ্ছে হাস্যকর। তাদের হাতে লাঠি। জায়েদ এগোতে থাকে। ভোটকেন্দ্রের চত্বরে দেখা যাচ্ছে সবার বুকে মার্কা-আঁকা ব্যাজ। নৌকা মার্কার ব্যাজটা সুন্দর। কাগজটা ঝকঝক করছে। আর হ্যারিকেন মার্কার ব্যাজটা ম্যাটমেটে। তার খুবই শখ হয় সে একটা নৌকা মার্কার ব্যাজ পরবে। ওই যে আজাদ দাদার বন্ধু ফারুককে দেখা যাচ্ছে। সে তাঁর কাছে যায়। 'ফারুক ভাই, একটা নৌকা মার্কা ব্যাজ দেন না?'

ফারুক এদিক-ওদিক তাকায়। 'ব্যাজ তো আর নাই।'

এদিকে জায়েদের এক বন্ধু মিজানকে দেখা যাচ্ছে একটা নৌকা মার্কা আরেকটা হ্যারিকেন মার্কা ব্যাজ পরে আছে।

মিজান বলে, 'কী রে জায়েদ, কী হইছে?'

জায়েদ বলে, 'ব্যাজ খুঁজতাছি।'

'লাগাইবি?'

'হ।'

'লাগা'-সে একটা হারিকেন মার্কা ব্যাজ এগিয়ে দেয়।

জায়েদ উৎসাহ পায় না। সে নৌকা মার্কা ব্যাজ খুঁজছিল।

মিজান এসে তার বুকে হারিকেনের ব্যাজ পিন দিয়ে লাগাতে লাগাতে বলে, 'কিরে, পকেট ছিঁড়ছস কেমনে?'

জায়েদ বলে, 'আরে ব্যাটা টাকার ভারে ছিঁইড়া গেছে।'

'হ। কত টাকা। ল। এই ব্যাজ দিয়া তোর দুই কাম হইল। পকেটটাও জোড়া লাগান হইল, ফির ব্যাজও লাগান হইল।'

জায়েদ হারিকেন মার্কার ব্যাজ পরে খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে। তখন চারদিকের পরিবেশ-পরিস্থিতি দেখে তার মনটা খারাপ হয়ে যায়। নৌকা মার্কা জিততে যাচ্ছে। হারিকেন হেরে যাবে একদম নিশ্চিত। সে কেন তাহলে নৌকা মার্কার ব্যাজ পেল না। সে হ্যারিকেনের ব্যাজটা খুলে ফেলে। তারপর আস্তে করে ফেলে দেয়।

'এই জায়েদ, তুই এখানে কী করিস?' আজাদ দাদার গলা। সর্বনাশ। সে সভয়ে তাকায়। আজাদ দাদা তাঁর বন্ধুবান্ধব নিয়ে এদিকটাতেই আসছে। বন্ধুরা গল্পে মশগুল।

'এদিকে আয়'-আজাদ ডাকে।

জায়েদ এগিয়ে যায়।

'কখন এসেছিস?'

'এই তো, পাঁচ মিনিট হইব।'

'যা, বাড়ি যা।'

'আচ্ছা।'

'এই শোন, শার্ট ছিঁড়েছিস কেমন করে?'

'সেলাই খুইলা গেছে।'

'যা, এমনি আসা নিষেধ, তার ওপর আবার ছেঁড়া শার্ট। ভাগ।'

জায়েদ তাড়াতাড়ি স্কুল-চত্বর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে।

রাতের বেলা টেলিভিশনের অনুষ্ঠান মাঝে মধ্যেই বন্ধ করে দেখানো হচ্ছিল ভোটের ফল। আজাদ আর বাশার বসে বসে টিভি দেখছে। মোড়া নিয়ে এক কোণে বসে জায়েদও টিভি দেখে। জায়েদ বুঝতে পারে, তার ধারণাই ঠিক। সব নৌকা মার্কাই জিতে নিচ্ছে। ভাগ্যিস সে তার হারিকেন মার্কার ব্যাজটা ফেলে দিয়েছিল। এর মধ্যে সাফিয়া বেগম আসেন, কিরে, ইলেশকশনের কী খবর?

আজাদ বলে, 'ঠিক আছে। একচেটিয়া নৌকা। মা, দুই কাপ চা পাঠাবা?'

মা হেসে সম্মতি জানান।

টিভি কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায়। রেডিও খোলা থাকে। কিন্তু রেডিওটা আছে আজাদ দাদার কাছে। বাশার ভাইজান আর আজাদ দাদা গল্প করছে আর রেডিও শুনছে। সেখানে গিয়ে রেডিও শোনার আশা বৃথা।

জায়েদ এর চেয়ে ঘুমিয়ে পড়াটাকেই শ্রেয় বলে মনে করে।

বিছানায় শুয়ে সে শুনতে পায়-বাইরে লোকেরা স্লোগান দিচ্ছে নৌকা নৌকা বলে। মনে হচ্ছে বিজয়-মিছিল। সেই মিছিলের শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে থাকে দূর রাত্রির গায়ে। আর আস্তেআস্তে ঘুমের অতলে পৌঁছে যায় জায়েদ।

২৭

১৯৭১ সাল। ফেব্রুয়ারি মাস। আজাদ বাসায় বসে পত্রিকা পড়ছিল। একটা সুবিধা হয়েছে ইদানীং। আবুল বাশার সাংবাদিক হওয়ায় দুটো পত্রিকা ফ্রি পাওয়া যায়। আর একটা আজাদ পয়সা দিয়ে রাখে। সকালবেলা তিনটা পত্রিকা পড়তে পড়তে অনেকটা সময় চলে যায়। আজকে আজাদের বাইরে তেমন কোনো কাজও ছিল না। বেলা ১১টা পর্যন্ত সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তিনটা পত্রিকাই পড়ে। দেশের পরিস্থিতিও এমন যে, খবরের কাগজ না পড়লে আর ভালো লাগে না।

আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জয়লাভ করেছে। উভয় পাকিস্তান মিলে এটাই এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। বাংলায় তো সংখ্যাগরিষ্ঠ বটেই। আগামী ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে কী হয়, এটাই এখন দেখার বিষয়। পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা ভুট্টো অবশ্য ইতিমধ্যেই ঢাকার অধিবেশনকে কসাইখানা বলে চিহ্নিত করেছেন। আর বলে দিয়েছেন, আওয়ামী লীগ যদি ৬ দফা পুর্নবিন্যাসের আশ্বাস না দেয়, তাহলে তার দল জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যাবে না।

এইসব নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলছে।

পত্রিকা পড়া শেষ করে আজাদ বাথরুমে যায় গোসল করতে।

এই সময় সৈয়দ আশরাফুল হক আজাদদের বাসার সামনে আসে তার ভক্স ওয়াগনটা নিয়ে। দু বার হর্ন বাজায়। তারপর গাড়ি থেকে নেমে এসে ঢোকে বাসার ভেতরে।

সৈয়দ আশরাফুল হকের কোনো ঘটনাই নয়। প্রায়ই আসে সে। কিন্তু আজকে তার আগমনের মধ্যে একটা বিশেষ ব্যাপার আছে। সে হাঁক পাড়ে, 'মা, মা, আজাদ ভাই কই?'

আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে সাফিয়া বেগম এগিয়ে আসেন-'আজাদ তো এ ঘরেই ছিল। কই যে গেল।'

আশরাফুল সাফিয়া বেগমের পায়ের কাছে বসে পড়ে তাঁকে কদমবুসি করে।

সাফিয়া বেগম বলেন, 'হঠাৎ সালাম যে। কী ব্যাপার, বাবু?'

আশরাফুল বলে, 'আছে ব্যাপার। আগে তোমাকে কওন যাইব না মা। তুমি আবার আমার বাসায় কইয়া দিবা। ইট্স আ সিক্রেট।'

আজাদ আসে। তার হাতে তোয়ালে। সে মাথা মুছছে।

সাফিয়া বেগম বলেন, 'কী ব্যাপার আজাদ। বাবু আমার পায়ে সালাম করল কেন রে?'

আজাদ কিছু বুঝে উঠতে পারে না। সে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করে, 'ঘটনা কী?'

আশরাফুল বলে, 'আছে ঘটনা আজাদ ভাই, চলো।'

'কই?'

'আরে গেলেই তো বুঝবা। আগেই সব কথা কওন লাগব নাকি? হারি আপ, লেটস গো। মুভ। মা, আমারে দোয়া কইরো। প্রে ফর মি। ইউ আর আ পিয়োর লেডি। আলাহ উইল হিয়ার ইয়োর প্রেয়ার।'

আজাদ কাপড়-চোপড় গায়ে চাপায়। জুতো পরে। গায়ে সুগন্ধি স্প্রে করে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখে নেয় নিজেকে।

সৈয়দ আশরাফুল বলে, 'আরে, তোমারে এলভিস প্রিসলির মতনই দেখা যাইতেছে। আর সাজতে হইব না। টুডে ইজ নট ইয়োর ডে। দিস ইজ মাই ডে।'

'হোয়াটস দ্য ম্যাটার বাবু?' আজাদ চোখ সরু করে তাকায় আশরাফুলের দিকে-'সাবেরা কই?'

'চলো তো তাড়াতাড়ি।'

তারা গেটের বাইরে আসে। আজাদ দেখে, আশরাফুলের ভক্স ওয়াগন গাড়িটা দাঁড়িয়ে। সে সামনের সিটে আশরাফুলের পাশে বসে।

'কী ব্যাপার বলো তো?' আজাদ রিয়ার ভিউ মিররের দিকে হেলে পড়ে নিজের চেহারাটা দেখে নিয়ে বলে।

'আছে ব্যাপার। বিয়া করনের লাইগা যাইতাছি।'

'বলো কি?'

'হ। দেশের যে পরিস্থিতি, সাবেরা কই থাকব, আমি কই থাকুম, উই শুড নট টেক এনি রিস্ক, ইটস বেটার টু গেট ম্যারিড নাউ। তার উপরে আবার নিউজিল্যান্ড টিম আসতেছে। খেলা দেখতে হইব না?'

'ওকে। শুভস্য শীঘ্রম। দ্যাটস আ গু ড নিউজ। এখন আমরা কোনদিকে যাচ্ছি?'

'নিউমার্কেটের মোড় থাইকা সাবেরাকে তুলতে হইব। হ্যারিস, জুয়েল, ফারুক-অরা সব মগবাজার কাজি অফিসে গেছে। সবকিছু রেডি কইরা রাখব। আমরা খালি যামু আর বিয়া পড়ুম।'

আজাদ চুপ করে থাকে।

'ডোন্ট ইউ লাইক দিস আইডিয়া?'

'অফ কোর্স। হোয়াই নট। সাবেরা থাকবে তো?'

'শিয়োর। ওরে ঘরের থন বাইর কইরা না আমি তোমারে নিতে আইলাম।'

'আর যদি না আসে?'

'এ কথা ক্যান কইলা আজাদ ভাই। তুমি তো সাবেরারে খুব ভালো কইরাই জানো। সে কি যেমন-তেমন মেয়ে? শি ইজ সিরিয়াস।'

'আরে না। বিয়ে সম্পর্কে মেয়েদের কতগু লো স্বপ্ন থাকে। তারা বেশ ঘটা করে বউ-টউ সেজে গায়ে হলুদ করে বিয়ে করতে চায়। সেই জন্যে বললাম আর কি?'

'সেটাও করন যাইব। দ্যাট উই উইল শিয়োরলি ডু। আগে রেজিস্ট্রি কইরা ফালাই তো।'

ভক্স ওয়াগন নিউমার্কেটের দিকে যাচ্ছে। বসন্তকাল এসে গেছে। রমনার সামনের রাস্তার গাছে গাছে বেগু নি রঙের ফুল, মনে হচ্ছে আশরাফুল আর সাবেরার বিয়ে উপলক্ষে এই বিশেষ আয়োজন। গাড়ির জানালা দিয়ে আসা বাতাসটাও দারুণ আরামদায়ক। আমগাছের পাশ দিয়ে গেলে মুকুলের গন্ধ এসে নাকে লাগে। রাস্তায় একটা মিছিলও চোখে পড়ে। কোনো একটা পেশাজীবী সংগঠনের মিছিল। দু লাইনে সার বেঁধে খুবই ভদ্রতা

বজায় রেখে যাচ্ছে। সামনের ব্যানারে লেখাঃ 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা।' আজাদও এই স্লোগানটা অনেকবার মিছিলে দিয়েছে বটে, কিন্তু মানেটা ঠিক বুঝতে পারেনি। তবে 'পিন্ডি না ঢাকা? ঢাকা ঢাকা'-এই স্লোগানটার মানে তার কাছে স্পষ্ট।

নিউমার্কেটের আজিমপুরের দিকের গেটের সামনে এসে গাড়ি দাঁড়ায়। এখানেই সাবেরার থাকার কথা। কই কাউকে তো দেখা যাচ্ছে না? আশরাফুলের বুকটা কেঁপে ওঠে।

সে হর্ন দেয়।

তখনই নিউমার্কেটের ভেতর থেকে সাবেরা উদিত হয়। শাড়ি পরা সাবেরাকে দেখতে সত্যি সুন্দর লাগছে। বিয়ের আগে মেয়েরা কি বেশি সুন্দর হয়ে ওঠে? আজাদ ভাবে।

আজাদ গাড়ি থেকে নামে। বলে, 'সাবেরা, ইউ বেটার সিট ইন দ্য ফ্রন্ট সিট।'

আশরাফুল ড্রাইভিং সিটে বসা, সে জানালা দিয়ে মাথা বাড়িয়ে বলে, 'না, না। কেউ দেখে ফেলতে পারে। সাবধানের মার নাই। সাবেরা, তুমি পেছনে ওঠো।'

সাবেরা গাড়িতে উঠে বলে, 'দ্যাখেন তো আজাদ ভাই, আশরাফুলের কাণ্ড...'

আজাদ বলে, 'রাইট মোমেন্টে এটা হলো রাইট ডিসিশন। ইউ আর ডুয়িং দ্য রাইট থিং।'

গাড়ি একটানে চলে আসে মগবাজার কাজি অফিসের সামনে। জুয়েল এগিয়ে আসে, 'হেই এত দেরি ক্যান? আমি তো ভাবলাম, আমগো বসায়া রাইখা তোমরা গাছের মগডালে উইঠা পড়ছ, টোনাটুনি ডাকিয়া উঠিল, টুন-টুন-টুন।'

তারা কাজি অফিসের ভেতরে ঢোকে। হ্যারিস, ফারুককেও দেখা যায় ভেতরে।

একটা অফিসঘরের মতো ঘর। দেয়ালে মক্কা ও মদিনা শরিফের ছবি। এক কোণে কাজি সাহেবের চেয়ার-টেবিল। একটা দেয়ালের পাশে লম্বা সোফা। কাজি সাহেব মধ্যবয়স্ক, শ্মশ্রুমণ্ডিত। সম্ভবত দাড়িতে মেহেদি মাখা। তার মুখটা হাসি হাসি। মাথায় জিন্নাহ টুপি। তাঁর চেহারার মধ্যে এমন কিছু আছে, দেখলে মনে হয় পান খেয়ে দাঁত লাল করে রেখেছেন। কিন্তু আশ্চর্য যে তাঁর দাঁত খুবই পরিষ্কার। মনে হয় তিনি পাঁচ ওয়াক্ত মেসওয়াক করেন।

জুয়েল বলে, 'কাজি সাহেব, এই যে বর আর কন্যা আইসা পড়ছে। নেন। আলাহর নামে শুরু করেন।'

কাজি সাহেব তার মোটা রেজিস্ট্রি খাতা বের করেন। আশরাফুল আর সাবেরার সামনে ফরম মেলে ধরেন। তারা পূরণ করতে লেগে যায়। হ্যারিস যায় মিষ্টি কিনে আনতে।

কাজি সাহেব বলেন, 'মেয়ের ম্যাট্রিকের সার্টিফিকেট আনছেন?'

'না। তা তো আনা হয় নাই'-আশরাফুল বলে। তার বুক কেঁপে ওঠে। তীরে এসে না তরী ডুবে যায়।

জুয়েল বলে, 'ম্যাট্রিক পাস ছাড়া মেয়ে বিয়া দেওন যায় না, নাকি? নতুন নিয়ম? ইয়াহিয়া খানের?'

কাজি সাহেব হেসে বলেন, 'না, কনের বয়সের প্রমাণ।'

জুয়েল বলে, 'ও তো আমগো চাইতে বড়। আমরা সবাই বিএ পাস। মেয়েও এমএ পাস।'

আজাদ বলে, 'এই জুয়েল, ইয়ারকি কোরো না। হজুর পাজলড হয়ে যাবেন।'

ফরম পূরণ করা হয়ে গেলে সাক্ষীর ঘরে জুয়েল, আজাদ আর ফারুক স্বাক্ষর করে।

কাজি সাহেব দোয়া-দরুদ পড়তে শুরু করেন। সাবেরা তার ঘোমটাটা বাড়িয়ে দেয়। আশরাফুল একটা টুপি মাথায় চাপায়।

কাজি সাহেব মোনাজাতের সময় চমৎকার চমৎকার কথা বলেন। হজরত আদমের সঙ্গে বিবি হাওয়ার যে সম্পর্ক ছিল, হজরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর সঙ্গে হজরত আয়েশা(রা)-র যে এশ্‌ক ছিল, সে রকম মহব্বত যেন এই মিয়া-বিবির মধ্যে পয়দা হয়, এবং রোজ কিয়ামত পর্যন্ত যেন তাদের এশ্‌ক অটুট থাকে, তিনি দোয়া করতে থাকেন।

দোয়া শেষ হলে ফারুক কাজি সাহেবের পাওনা বুঝিয়ে দেয়।

ব্যস। বিয়ে হয়ে গেল। আজাদ বিস্মিত। বিয়ে করা এত সোজা? এই জন্যে তো লোকে বলে, মিয়া-বিবি রাজি তো কিয়া করেগা কাজি।

জুয়েল বলে, 'লেটস গো টু দি হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টাল। উই উইল হ্যাভ আওয়ার লাঞ্চ দেয়ার।'

আশরাফুল বলে, 'অত টাকা তো নাই। কাজি সাহেবের ফি দিতেই তো ফতুর। ক্যাফে ডি তাজে চলো, বিরিয়ানি খাওয়ায়া দেই।'

আজাদ বলে, 'দরকার কী? আমার বাসায় চলো সবাই। মাকে বললেই তো মা নাচতে নাচতে রাঁধতে বসে যাবে। চলো।'

'সেই ভালো। ইলিশ-পোলাও হইব। আম্মার হাতের ইলিশ-পোলাও? উফ্। মাই মাউথ ইজ অলরেডি ওয়াটার্‌ড'-জুয়েল বলে।

তারা আজাদদের বাসায় যায়। আজাদ জায়েদকে কাওরানবাজারে পাঠায় ইলিশ মাছ কিনতে।

সৈয়দ আশরাফুল হক আর সাবেরা গিয়ে সালাম করে আজাদদের মাকে।

মা হাসেন, 'কী ব্যাপার?'

আশরাফুল হেসে বলে, 'আছে ব্যাপার। ইলিশ-পোলাওটা আজকা স্পেশাল কইরা রাইন্ধো তো মা।'
মা আশরাফুল আর সাবেরার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন।

২৮

ক্রিকেট খেলা চলছে ঢাকা স্টেডিয়ামে। পাকিস্তান বনাম নিউজিল্যান্ড। ২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ থেকে শুরু হয়েছে এই টেস্ট। আজ ফোর্থ ডে। পাকিস্তান দলে বাঙালি আছে প্রথম একাদশে রকিবুল হাসান। টুয়েলভ্থ ম্যান হিসাবে সুযোগ পেয়েছে তান্না। নিউজিল্যান্ডের টার্নার সেঞ্চুরি করেছে। পাকিস্তান দলের পশ্চিম পাকিস্তানি খেলোয়াড়রা যে ব্যাট নিয়ে নেমেছে, তার পেছনে রঙিন হাতলটা চিকন হয়ে ব্যাটের ঘাড় থেকে পিঠের দিকে নেমে গেছে। দেখতে তলোয়ারের মতো লাগে। তলোয়ার ছিল ভুট্টোর পিপিপির নির্বাচনী প্রতীক। স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে তাই নিয়ে গুঞ্জন। দেখছস, মাউড়াগুলান তলোয়ার মার্কা ব্যাট নিয়া নামছে। এবার দেখা যাক রকিবুল হাসান কী ব্যাট নিয়ে নামে। সবার মধ্যে এই ঔৎসুক্য ছিল। রকিবুল হাসান নেমেছিল জয় বাংলা লেখা ব্যাট নিয়ে। গ্যালারি তালি দিয়ে উঠেছিল সোল্লাসে। তবে এই তালি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। জিরো আর ১ রান করে দু ইনিংসে আউট হয়ে গিয়েছিল রকিবুল।
গ্যালারিতে বসে আছে আজাদ, কাজী কামাল আর হিউবার্ট রোজারিও। তারা বাদাম চিবাচ্ছে। একটা চানাচুরঅলা ঢুকে পড়েছে গ্যালারিতে। তার পরনে লাল রঙের পোশাক, মাথায় কোণাকার টুপি, পায়ে ঘুঙুর। তার হাতে চোঙ। চোঙে মুখ লাগিয়ে সে হাঁক ছাড়ছে : চানাচুর গরম, জয় বাংলা চানাচুর।
কাজী কামাল সেদিকে দেখিয়ে হাসে-'বেটা ব্যবসা ভালো বুঝেছে।' একটা সিগারেটঅলা সিগারেট নিয়ে গ্যালারির আসনগুলোর ফাঁকে ফাঁকে দ্রুত পায়ে চলে যাচ্ছে। আজাদ বলে, 'কিরে, তোর সব সিগারেট কি জয় বাংলা নাকি!'
সিগারেটঅলা বুঝতে পারে না। বোকার মতো হাসে। আজাদ বলে, 'বিদেশী সিগারেট আছে?'
'নাই স্যার'-সিগারেটঅলা লোকটা দ্রুত পায়ে চলে যায়।
কাজী কামাল বলে, 'বাংলা সিগারেট আর বাংলা মদ, এসবের বেলায় জয় বাংলা না হইলেই ভালো।'
আজাদ বলে, 'এসবের বেলায় পাকিস্তান জিন্দাবাদ কিন্তু আরো খারাপ।'
কামাল বলে, 'ক্যান দোস্তো। তুমি না করাচি থাইকা পইড়া আইলা।'
আজাদ বলে, 'আরে দেখে এসেছি না। দেখেশুনেই তো বলছি। ওদের সাথে থাকা যাবে না।'
রুমী আর জামীকে দেখা যায়। তারা চানাচুরঅলাটাকে ধরে নিয়ে এসেছে।
রুমী বলে, 'আজাদ, খাবে নাকি! জয় বাংলা চানাচুর।'
আজাদ বলে, 'নাও না দেখি। কেমন লাগে!'
ছক্কা। স্টেডিয়ামে হৈ ওঠে। কে মারল? লোকজন সব রেডিওতে কান পাতে। অনেকেই সঙ্গে করে রেডিও নিয়ে এসেছে। রেডিওঅলারা ভলুম বাড়াতে নব ঘোরায়।
জুয়েল আসে গ্যালারিতে। জুয়েল পূর্ব পাকিস্তানের সেরা ব্যাটসম্যান। আজাদ বয়েজে খেলেছে। এখন খেলে মোহামেডানে। তার খেলায় একটা মারকুটে ভাব আছে। ৪৫ ওভারের সীমিত ম্যাচে সে ঝড়ের মতো পেটায়। বল জিনিসটা যে পেটানোর জন্যে, এটা তার ব্যাটিং দেখলে বোঝা যায়। উইকেটকিপিংও করে। সে এসে বসে কাজী কামালের পাশে। কাজী কামাল প্রদেশের সেরা বাস্কেটবল খেলোয়াড়।
জুয়েল বলে, 'কামাল, তোরে নাকি পাকিস্তান ন্যাশনাল টিমে ডাকছে!'
'হ।'
'গেলি না?'
'কিয়ের ন্যাশনাল টিম। ওয়েস্ট পাকিস্তানে যাব না। জয় বাংলা টিম হইলে যাব।'
রুমী বলে, 'এসেম্বিতে যে কী হবে! ভুট্টো তো বলে দিয়েছে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কেউ এলে কসাইখানা বানানো হবে।'
জুয়েল বলে, 'জনা তিরিশেক নাকি আইসা গেছে অলরেডি পাকিস্তান থাইকা।'
আজাদ বলে, 'ঢাকাকে রাজধানী বানাতে হবে। সব হেডকোয়ার্টার ঢাকায় আনতে হবে। আর্মিতে বেশি বেশি বাঙালি রিক্রুট করতে হবে। পাটের টাকা সব বাংলায় আনতে হবে। এত দিন ওরা আমাদেরকে কলোনি বানিয়ে রেখেছে, এবার আমরা ওদেরকে কলোনি বানাব। তাইলে না শোধ হয়।'
রুমী বলে, 'ওসব হবে না। তার চেয়ে স্বাধীনতা ডিক্লেয়ার করে দেওয়া ভালো। লেফ্টরা যে ফরমুলা দিয়েছে, ওটাই ভালো। মাও সে তুং তো বলেই দিয়েছেন, বন্দুকের নল সব ক্ষমতার উৎস।'
আবার বাউন্ডারি। দর্শকদের হৈ-হল্লা।
খেলায় এখন বিরতি। লাঞ্চ পিরিয়ড চলছে। রেডিওতে বারবার বলা হচ্ছে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা দেবেন। সবাই অধীর আগ্রহে রেডিও ধরে বসে আছে। বেলা ১টার দিকে রেডিওতে ইয়াহিয়া খানের ঘোষণা প্রচারিত হতে থাকে। ইয়াহিয়ার

নিজের মুখে নয়। অন্য একজন পড়ে শোনায়। পরশুদিন ৩ মার্চ ১৯৭১ থেকে জাতীয় পরিষদের যে অধিবেশন ঢাকায় বসার কথা ছিল, তা অনির্দিষ্ট কালের জন্যে স্থগিত করা হয়েছে। ঘোষণা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরো গ্যালারি একযোগে স্লোগান দিয়ে ওঠে, 'ইয়াহিয়ার ঘোষণা, মানি না মানব না'। 'ভুট্টোর পেটে লাথি মারো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো'। 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো'। 'জয় বাংলা'। তাকিয়ে দ্যাখো পূর্ব গ্যালারির দিকে। সমস্তগ্যালারি আগুনে জ্বলে উঠেছে যেন। যার কাছে যা আছে, তাতেই আগুন লাগিয়ে দিয়েছে দর্শকরা।

আজাদ, জুয়েল, রুমী, জামী, কামাল, হিউবার্ট রোজারিও -সবাই সেই মিছিলের অংশ হয়ে যায় আপনা-আপনিই। খেলা বন্ধ। সবাই বেরিয়ে আসছে স্টেডিয়াম থেকে। বিশাল মিছিল শুরু হয়ে যায় স্টেডিয়াম এলাকায়।

ঢাকার অন্য এলাকা থেকেও মিছিল আসতে থাকে। পুরো ঢাকাই যেন একটা বিক্ষুব্ধ জনসমুদ্র। ফুঁসছে, গর্জে উঠছে।

রুমী বলে, 'জামী, চল তোকে আব্বার অফিসে রেখে আসি। নাহলে আবার আব্বা চিন্তা করবে।'

রুমী আর জামী মিছিল থেকে বেরিয়ে যেতে চায়। কিন্তু মিছিল থেকে বেরুনো কি সোজা কথা? চারদিকেই তো মিছিল। চারদিক থেকেই তো আসছে মানুষের স্রোত। সহস্র কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে গগনবিদারী স্লোগান। সবার হাতে লাঠি, রড। মুখে স্লোগান, 'বাঁশের লাঠি তৈরি করো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো'।

পূর্বাণী হোটেলে আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি পার্টির মিটিং চলছে। শেখ সাহেব ওখানে আছেন। জনতা পূর্বাণী হোটেলের দিকে চলেছে।

আজাদ বলে, 'এইখানে থেকে লাভ নাই। চল, ইউনিভার্সিটি যাই। ওখানে কী হয় দেখে আসি।' জুয়েল, কাজী কামাল রাজি হয়। তারা হাঁটতে হাঁটতে ইউনিভার্সিটির দিকে রওনা দেয়। ওখানেও একই অবস্থা। পুরোটা ক্যাম্পাস একটা বিশাল মিছিলে পরিণত হয়েছে। 'এক দাবি, এক দফা, বাংলার স্বাধীনতা'। 'ভুট্টোর পেটে লাথি মারো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো'।

বাসায় ফিরতে ফিরতে মেলা রাত। মা জায়নামাজে। আজাদ এসেছে টের পেয়ে তিনি উঠে আসেন। বলেন, 'সারা দিন কই ছিলি না ছিলি কোনো খবর নাই। চোখমুখের অবস্থা কী করেছিস! যা, হাতমুখ ধুয়ে আয়!'

আজাদ হাতমুখ ধুয়ে আসে। মা টেবিলে খাবার বেড়ে দেন। আজাদ টিভিটা ছেড়ে খানিক দেখে টেবিলে চলে আসে। ছেলের পেস্টে তরকারি তুলে দিতে দিতে মা বলেন, 'আজকেও মিছিলে গিয়েছিলি?'

আজাদ হাসে। 'আজকে মা কাউকে মিছিলে যেতে হয় নাই। যে যেইখানে ছিল, সেই জায়গাটাই মিছিল হয়ে গেছে। আমি ছিলাম স্টেডিয়ামে গ্যালারিতে। গ্যালারিটাই মিছিল হয়ে গেল। তুমি তো স্টেডিয়াম থেকে বের হবে, মানুষের স্রোত ধরে বের হতে হবে, সবাই তো স্লোগান ধরেছে, তারপর রাস্তা, পুরা রাস্তাই মানুষে সয়লাব।'

মা বলেন, 'জায়েদও গিয়েছিল মিছিলে। বাবা রে, মিছিল করা কি তোদের কাজ? তোরা কি পলিটিক্স করে মিনিস্টার হবি! মজিবর মন্ত্রী হলে আমাদের কী, আর ভুট্টো হলেই আমাদের কী!'

'কী বলো। ভুট্টো কেমনে মন্ত্রী হয়! শেখ মুজিব মেজরিটি পেয়েছে না! আর এইবারের সংগ্রাম তো কে মিনিস্টরা হবে তার জন্যে না, এইবার পাকিস্তানের সাথে বাঙালির ফাইট। এটাতে মা আমাদের অনেক কিছু যায়-আসে।'

'দ্যাখ বাবা। তুই লেখাপড়া শিখেছিস। এখন তো তুই আমার চেয়ে বেশিই বুঝবি। কিন্তু তুই কোনো বিপদ-আপদের মাঝে যাবি না। আহা রে, কত মায়ের ছেলে মারা গেছে জয় বাংলা জয় বাংলা করে। খারাপ লাগে না! আমি তো আমাকে দিয়ে বুঝি। তোর কিছু হলে, আল্লাহ না করুক, আমি সইতে পারব না। শোন, দেশের যা পরিস্থিতি। কখন কী হয়ে যায়। আমি তোকে এমএ পাস করিয়েছি। এখন আমি আমার শেষ কাজটা করে যেতে চাই।'

'কী কাজ?' মুখে ভাত থাকতেই গেলাস তুলে পানি মুখে দিয়ে তারপর আজাদ বলে।

'তোর জন্যে আমি পাত্রী দেখছি। আশরাফুলও তো বিয়ে করে ফেলল।'

'তুমি তো মা পাগল আছ। আগে আমার ব্যবসাটা আরেকটু সেট্ল করুক। হরতাল হরতাল করে তো ব্যবসার দিকে নজরই দিতে পারলাম না।'

'ব্যবসা হবে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন, বিয়ে করলে ভাগ্য খোলে'-মা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। হয়তো তাঁর নিজের জীবনের কথা মনে পড়ে যায়। সবাই বলে, ইউনুস চৌধুরীর সৌভাগ্যের পেছনে ছিল সাফিয়া বেগমের অবদান।

'জুরাইনের বড় হজুরও বলে দিয়েছেন তোকে বিয়ে দিতে।' মা আরেক চামচ তরকারি আজাদের পাতে তুলে দিতে দিতে বলেন।

'হজুররে কও আরেকটা বিয়া করতে। তার কপাল খুলুক।'

'তওবা তওবা, এটা তুই কী বললি?'

'না, আমি ঠিক তোমাকে হার্ট করার জন্যে বলি নাই। কথার পিঠে বললাম আর -কি এই যে তওবা পড়লাম, তওবা, তওবা...'

২৯

রুমী সকালবেলা উঠে এক কাপ ব্লাক কফি খায়। হাতে থাকে টাটকা দৈনিক পত্রিকা। ইত্তেফাকই তার বেশি প্রিয়। তবে সঙ্গে দৈনিক পাকিস্তানটাও সে পড়ে থাকে। আজকে পত্রিকা পড়তে গিয়ে সে উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করতে থাকে। 'আম্মা, আম্মা...'

জাহানারা ইমাম এগিয়ে আসেন। 'কী হলো রুমী!'

'দ্যাখো সিকান্দার আবু জাফরের কী কবিতা বের হয়েছে পেপারে।' রুমী গলা চড়িয়ে আবৃত্তি করতে শুরু করেছেঃ

অনেক মাপের অনেক জুতোর দামে
তোমার হাতে দিয়েছি ফুল হৃদয় সুরভিত
যে-ফুল খুঁজে পায়নি তোমার চিত্তরসের ছোঁয়া
পেয়েছে শুধু কঠিন জুতোর তলা।
আজকে যখন তাদের স্মৃতি অসম্মানের বিষে
তিক্ত প্রাণে শ্বাপদ নখের জ্বালা,
কাজ কি চোখের প্রসন্নতায়
লুকিয়ে রেখে প্রেতের অট্টহাসি!
আমার কাঁধেই দিলাম তুলে
আমার যত বোঝা :
তুমি আমার বাতাস থেকে
মোছো তোমার ধুলো
তুমি বাংলা ছাড়ো।

জাহানারা ইমাম ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। রুমী আবৃত্তিটা ভালোই করে। করবেই। সে তো ডিবেটে চ্যাম্পিয়ন। কলেজের কালচারাল উইকে অনেকগুলো পুরস্কার পেয়েছে। আবৃত্তি শুনতে শুনতে, বিশেষ করে যখন রুমী বলে উঠছে তুমি বাংলা ছাড়ো, জাহানারা ইমামের সমস্তটা শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে।

আবৃত্তি শেষ হলে তিনি বলেন, 'রুমী, আজকে তাড়াতাড়ি নাশতা করে নে। তোরা তো রেসকোর্সের জনসভায় যাবি। সুবহানও যাবে জেদ ধরেছে। এর আগের দিন 'না' করেছি। আজকে তো বাবা আর 'না' করা যায় না। আজকে শেখ সাহেব নিশ্চয় ইম্পর্ট্যান্ট কিছু বলবেন।'

রুমী বলে, 'ওকে ওকে। আই অ্যাম গোয়িং টু হ্যাভ মাই ব্রেকফাস্ট। বাট, আজকের পেপারটা পড়ে একটু বোঝা দরকার, শেখ মুজিব আজকে কী বলবেন, কিছু আঁচ অনুমান করা যায় কি না।'

টগর পড়ে জগন্নাথ কলেজে। সে আজাদের আরেক খালাতো ভাই। জায়েদেরও খালাতো ভাই সে। আজাদদের মগবাজারের বাসায় থেকে সে জগন্নাথ কলেজে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে পড়ছে। তার বাবার ব্যবসা পটুয়াখালীতে। সেখানে সে পড়েছে স্কুলে। সেখানে সে যুক্ত ছিল ছাত্র ইউনিয়ন মতিয়া গ্রুপের সঙ্গে।

আজাদ দাদা বয়সে তার চেয়ে অনেক বড়। তার বন্ধুবান্ধবরাও আলাদা। কাজেই টগরের সঙ্গে আজাদের সারা দিন দেখা হয় কেবল বাসাতেই। সকালে বা গভীর রাতে।

আজ ৭ই মার্চ ১৯৭১।

টগর সকাল থেকেই উত্তেজিত। আজ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষণ দেবেন। ১লা মার্চই বঙ্গবন্ধু হোটেল পূর্বাণীতে ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন, বাংলার মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির ঘোষণা তিনি দেবেন ৭ই মার্চ, জনসভা করে, রেসকোর্স ময়দানে। এরই মধ্যে দেশের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। পুরোটা দেশ যেন এক উত্তাল বিক্ষুব্ধ সমুদ্র, সব রাজপথ আজ যেন মিছিল, প্রতিটা মানুষ আজ মিছিলম্যান, প্রতিটা কণ্ঠ আজ যেন স্লোগান। মিছিল, মিটিং, প্রতিবাদ, ব্যারিকেড, কারফিউ-জারি, কারফিউ ভঙ্গ, গুলি। রোজ রাজপথে গুলি খেয়ে মারা যাচ্ছে মানুষ।

এ অবস্থায় গতকাল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ভাষণ দিয়েছেন। তাতে নতুন কোনো কথা নাই। ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেছেন। আর বলে দিয়েছেন, 'আমি এখনও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আছি, পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক আছি। আমি যতক্ষণ আছি, পাকিস্তানের পুরোপুরি অখণ্ডতা বজায় রাখার চেষ্টা আমি করবই। আমি জেনেশুনেই পূর্ব পাকিস্তান কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছি যেন আইন অমান্যকারীদের লুট, হত্যা ও অগ্নিসংযোগ করার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।'

তাঁর এই ধমক শুনে কি বঙ্গবন্ধু পিছিয়ে যাবেন? নাকি আজ রেসকোর্সের ভাষণে তিনি বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন? সর্বত্র এই আলোচনা।

তরুণ টগর যে এত কিছু বোঝে তা নয়। সে শুধু বোঝে আজ রেসকোর্স ময়দানে যেতে হবে।

আজাদ বেরিয়ে গেছে দুপুরবেলাতেই। তার সঙ্গে আছে তার বন্ধুরা। আশরাফুল হক, জুয়েল, হ্যারিস, ইব্রাহিম সাবের প্রমুখ। কে আছে এ ই ঢাকায়, যার যৌবন আছে, কিন্তু যে আজকের জনসভায় যাবে না? আজকে সবাই উঠে গেছে রাজনীতির উর্ধ্বে, দলের পরিচয়ের উর্ধ্বে, রেসকোর্স ময়দানে সবাই যাচ্ছে দেশের টানে।

জুয়েল বলে, 'আশরাফুল যখন বউ ছাইড়া আসতে পারছে, তখন সবাই আজকা মিটিংয়ে যাইব। আইজকা আর মিটিংয়ে জায়গা পাও য়া যাইব না।'

ইব্রাহিম সাবের বলে, 'আমার কিন্তু আজকে শেখ সাহেব কী বলেন, এইটা বড় ইন্টারেস্ট না। আমার বড় ইন্টারেস্ট আরেকটা। আমি চোখ-কান খোলা রাখব আর একজন নেতার দিকে। বল তো কে?'

আশরাফুল বলে, 'কে?'

ইব্রাহিম সাবের বলে, 'নাজিম কামরান চৌধুরী।'

আজাদ, জুয়েল, হ্যারিস সবাই হো হো করে হেসে ওঠে।

আশরাফুল মুখে কৌতূহল ফুটিয়ে তুলে বলে, 'ক্যান?'

ইব্রাহিম সাবের বলে, আমাদের বন্ধু নাজিম কামরান চৌধুরী, ডাকসুর ডাকসাইটে নেতা, যিনি কিনা উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান থাইকাই গণআন্দোলন সমর্থন করতেছেন, তিনি তার সিলেটি বচনে কেমন ভাষণ দেন, এটাই আমার প্রিন্সিপ্যাল অ্যাট্রাক্‌শন।

হ্যারিস বলে, 'আমার মনে হয় না নাজিম ভাই আজকে ভাষণ দেবেন। আজকে শুধু বঙ্গবন্ধু একাই বলবেন। আর কোনো বক্তারই আজকে কোনো চান্স নাই।'

ইব্রাহিম সাবের বলে, 'দেখি গিয়া।'

তারা হাঁটছে। মার্চের আকাশ ঘন নীল। রোদটা গায়ে মিষ্টিই লাগছে। একটু একটু করে বইছে বসন্তের বিখ্যাত বাতাস।

জুয়েল বলে, 'এই, দেখছস, বাতাসটা কত মজা লাগতেছে। কপালের ঘামের মধ্যে বাতাস লাগলে মনে হইতেছে, বউ আঁচল দিয়া বাতাস করতেছে। আশরাফুল, ক তো দেখি এই বাতাসের নাম কী?'

আশরাফুল বলে, 'বাতাসের আবার নাম কী?'

জুয়েল বলে, 'আছে। এই বাতাসটার নাম হইল ছমিরন বিবি।'

আজাদ বলে, 'যাহ্।'

জুয়েল বলে, 'আমরা কই ছমিরন বিবি। আর বইয়ের ভাষায় সমীরণ। মৃদুমন্দ সমীরণ। হালায় মৃদুটা না হয় বুঝলাম, মন্দটা বুঝলাম না? ছমিরন বিবির মনে হয় ক্যারেক্টার লুজ।'

আজাদরা হাঁটে। মগবাজার থেকে রেসকোর্স ময়দান, বেশি দূর নয়। আর পুরোটা ঢাকা যেন আজ ছুটে চলেছে রেসকোর্সের দিকে। কত দূরদূরান্ত থেকে আসছে এইসব মানুষ-কে জানো? সবার হাতে লাঠি, কারো কারো হাতে রড। ওই যে টঙ্গী থেকে আসছে শ্রমিকদের মিছিল।

'হায় হায় দ্যাখো দ্যাখো'—হ্যারিস আঙুল তুলে দেখায়, একটা শাদাছড়ি মিছিল যাচ্ছে। সবাই অন্ধ। অন্ধরাও যাচ্ছে আজ মিছিলে।

জায়েদ রওনা দিয়েছিল একটু বেলা করে। মগবাজার থেকে রমনা পর্যন্ত এসে সে আর এগোতে পারে না। কাকরাইল মোড় পর্যন্ত গিজগিজ করছে মানুষ। সে ভিড়ের মধ্যে তার ছোট্ট শরীরটা সুইয়ের মতো গলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু সমস্যা করছে পায়ের স্পঞ্জের স্যান্ডেলগুলো। লোকের পায়ের পাড়া পড়ে স্যান্ডেলের গোড়ায়, স্বাধীনমতো এগোনো যায় না। দুরো শালার স্যান্ডেল। সে পা থেকে স্যান্ডেল দুটো খুলে হাতে নেয়। তারপর তার এগোতে সুবিধা হয় বটে, কিন্তু পাবলিকের গায়ে স্যান্ডেলের ছোঁয়া লাগতে থাকে। না, এটা অন্যায় হবে। এরা সবাই জয় বাংলার লোক। এদের গায়ে স্যান্ডেলের স্পর্শ লাগলে এদের অকল্যাণ হতে পারে। সে স্যান্ডেল দুটো বিসর্জন দেয় জনতার ভিড়ে। আকাশে হঠাৎই হেলিকপ্টার উড়তে দেখা যায়। জনতা ক্ষণিকের জন্যে গুঞ্জরণ করে ওঠে। তারা সবাই তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। ব্যাপার কী? হেলিকপ্টার কেন? বোমা ফেলবে নাকি? নাকি বাঙালিকে ভয় দেখাচ্ছে? বাঙালি ভয় পাওয়ার পাত্র নাকি?

জাহানারা ইমাম তার বাড়ির ছাদে উঠেছেন রেডিও নিয়ে। একটু আগেও রেডিওতে আমার সোনার বাংলা গান হচ্ছিল। এখন কোনো সাড়াশব্দ নাই। ব্যাপার কী? তার স্বামী শরীফ ইমাম, তার দুই ছেলে রুমী আর জামী, বাড়ির কাজের লোক সবাই গেছে শেখ মুজিবের জনসভায়। তিনি ভেবেছিলেন রেডিওতে এই ভাষণ সরাসরি প্রচার করা হবে যখন, তিনি রেডিওতেই শুনবেন। এখন দেখি কোনো আওয়াজ হচ্ছে না। ব্যাপার কী? ছাদে উঠে তিনি দেখতে পান হেলিকপ্টারের চক্কর। তার বুকটা একটু কেঁপে ওঠে।

টগর লম্বায় তেমন বেশি নয়। এমন গাদাগাদি ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে মঞ্চটা দেখতে পাচ্ছে না। সে এখন করেটা কী? বঙ্গবন্ধুকে তার এক নজর দেখা চাই-ই চাই। ওই তো একটা গাছ দেখা যায়, তাতে একজন দুজন ছেলে-ছোকরা উঠে পড়েছে। সেও তো এই কাজটা পারে। গাছে ওঠার ব্যাপারে তার দক্ষতা সে পটুয়াখালীর দিনগুলোতে প্রমাণ করেছে। সে তাড়াতাড়ি গাছের নিচে চলে যায়। একটা কৃষ্ণচূড়াগাছ। গোড়াটা বেশ

লকলকে, ডালপালাহীন। চড়াটা সহজ হবে না। সুপারিগাছে ওঠার মতো করে বেয়ে বেয়ে উঠতে হবে। তাই সই। টগর গাছে উঠতে লেগে যায়। গাছের একটা সুবিধাজনক জায়গায় সে পৌঁছয়। একটা ডালের ওপরে পা, একটা ডালের ওপরে তার পশ্চাদ্দেশ ঠেকিয়ে সামনে আরেকটা ডালকে সে হাতে ধরার জন্যে পেয়ে যায়। এই জায়গায় এসে তার নিজেকে খুবই সৌভাগ্যবান আর বুদ্ধিমান বলে মনে হয়। সে পুরোটা মাঠ, গাছের পাতার আড়ালে পড়া কিছু কিছু অংশ ছাড়া, বেশ আরামেই দেখতে পাচ্ছে। ওই যে নৌকার মতো করে বানানো মঞ্চটা। চারদিকে কলরেডির মাইক্রোফোন। হায়, কত মানুষ এসেছে! মানুষ ছাড়া তো আর কিছুই দেখা যায় না। ওই দ্যাখো, কত কত মহিলাও এসেছেন। সবার হাতে লাঠি, অনেকের হাতে সবুজের পটে লাল সূর্যের ভেতরে সোনালি মানচিত্র-খচিত স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা।

আর ওই দ্যাখো, গাছটার একটু ওপরের দিকে একটা পাখির বাসাও দেখা যাচ্ছে। বসন্ত কালে পাখিরা বুঝি ঘর বাঁধে! ভালো করে তাকিয়ে টগর বোঝার চেষ্টা করে ভেতরে ডিম আছে কি নাই।

বাঙালির একটা সমস্যা আছে। একজনকে সে যা করতে দেখে, সে নিজেও তা-ই করে বসে। তার দেখাদেখি আরো আরো মানুষ এই কৃষ্ণচূড়াগাছটায় ওঠার চেষ্টা করছে। 'ভাই, করেন কী?' টগর চিৎকার করে বলে, 'এই ভাই, কৃষ্ণচূড়ার ডাল খুব নরম। এত লোক উইঠেন না। ভাইঙ্গা যাইব।'

কিন্তু মাইকের গগনবিদারী আওয়াজ, জনসমুদ্রের কলোলের তলায় তার একাকী কণ্ঠ কোথায় মিলিয়ে যায়।

লোকেরা গাছ পেয়ে উঠতেই থাকে।

তারপর যা হওয়ার তা-ই হয়। এক সময় তাকে নিয়ে গাছের একটা ডাল চড়চড় শব্দ করে ভাঙতে থাকে। টগরের সুবিধা ছিল, সে আরেকটা ডাল ধরে ছিল। সে সেই ডাল দু হাতে ধরে বাদুড়ের মতো ঝুলতে থাকে। এবার সে আরেকটা ডালে পা রাখতে যাবে, কিন্তু তার আগে দেখতে পায় তার হাতে ধরা ডালটায় তার মতো আরো আরো মনুষ্য-বাদুড় ঝুলে আছে, আর এই চিকন ডালটাও সেই ভর সহ্য করতে না পেরে চড়চড় শব্দ করতে শুরু করেছে। টগর বুকে সাহস সঞ্চয় করে। ডালটা ধীরে ধীরে নিচে নেমে যাচ্ছে। মাটির সঙ্গে তার দূরত্ব আসছে কমে। সে একটা লাফ দেবার কথা ভাবে। তাকে লাফ দিতে হয় না, শুধু হাতের মুঠো আপনা-আপনিই আলগা হয়ে এলে সে নিচে পড়ে যায়। ভাগ্যি নিচে ঘাস ছিল। আর ততক্ষণে নিচে দাঁড়িয়ে থাকা জনতা পরিমড়ি করে চারপাশে ঝাপ্টা তুলে সরে গিয়েছে। টগরের পা মাটিতে পড়ে। আর টাল সামলাতে না পেরে সে সামনের দিকে উপুড় হয়ে পড়ে যায়। এটাও তার জন্যে বিপরীতে হিত হয়। সেকেন্ডখানেক পরই গাছের ডালটা এসে তার পায়ের ওপর পড়ে। পা বলেই ব্যথাটা সহ্য করা যায়। মাথা হলে সইত কি না, আলাহ জানে। টগর উঠে বসে। তাকে সাহায্য করতে দুজন হাত বাড়িয়ে দেয়। একজনের হাত ধরে উঠতে গিয়ে তার চোখ পড়ে মাটিতে পড়ে থাকা একটা পাখির বাসার দিকে। আহা, বাসাটা মাটিতে পড়ে গেছে। ভেতরে ডিম দেখা যাচ্ছে। মানুষের পায়ের চাপে না ডিম নষ্ট হয়ে যায়। টগর পাখির বাসাটা কুড়িয়ে বুকের কাছে আলতো করে ধরে রাখে। ভিড়টা একটু কমলে সে বাসাটাকে আবার গাছের ওপরের দিকের ডালে রেখে আসবে। বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা দিতে দাঁড়িয়েছেন। মুহূর্তে সমস্ত জনসমুদ্র উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

বঙ্গবন্ধু জমাট জলের মেঘের মতো মায়া আর বজ্রমাখা কণ্ঠে বলে ওঠেন : আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন, সবই বোঝেন।

নিজের পায়ের ব্যথা ভুলে গিয়ে টগর হা করে গিলছে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ। সে সমস্ত ইন্দ্রিয় কেন্দ্রীভূত করে শুনতে চাইছে স্বাধীনতা শব্দটা। ২৩ বছরে বাঙালির ওপর পরিচালিত পাকিস্তানিদের শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাঙালির সংগ্রামের কাহিনী বর্ণনা করে শেখ মুজিব বলেন, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার মানুষকে হত্যা করা হয়, তোমাদের প্রতি আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ করে তোলো। তোমাদের যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে...

রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশালাহ। এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।

তখন টগর যেন আর কিছুতেই নিজের মধ্যে থাকে না। স্বাধীনতা শব্দটা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে তাকে আকাশে তুলে ধরে, সমস্তটা জনসমুদ্র একেবারে গর্জন করে উঠেছে, তার ঢেউয়ের মাথায় চড়ে টগর যেন ভাসছে আর ভাসছে... তখন আশ্চর্য হয়ে টগর লক্ষ করে, তার হাতে ধরে রাখা পাখির বাসায় ডিম দুটো ফেটে যায়, দুটো বাচ্চা বেরিয়ে আসে, আর দুটো খয়েরি রঙের পাখি বিমানের মতো নেমে আসে আকাশ থেকে, পা দুটো নামিয়ে তারা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যায় শাবক দুটোকে, আর আকাশে উড়ে গিয়ে চক্কর দিতে দিতে তারা চিৎকার করে ডেকে ওঠে স্বাধীনতা স্বাধীনতা বলে, তখন আরো আরো পাখি উড়ে ওঠে আকাশে, বিচিত্র সব পাখি, তারা একটা যেন আরেকটাকে ডেকে বলছে স্বাধীনতা স্বাধীনতা, টগরের সমস্ত পৃথিবীজুড়ে তখন আর কোনো শব্দ নাই, কেবল স্বাধীনতা ছাড়া...

জাহানারা ইমাম চিন্তিত। রেডিওতে শেখ মুজিবের ভাষণ সরাসরি প্রচারিত হওয়ার কথা ছিল, হলো না কেন? কী বললেন শেখ সাহেব? তিনি বাসায় একা একা পায়চারি করছেন। আর তার সঙ্গে আছে কিটি, বিদেশিনী তরুণ-অতিথি।
ডোরবেল বেজে ওঠে।
জাহানারা দরজা খোলেন। স্বামী শরীফ ইমাম, আর তাঁর বন্ধু ফখরুদ্দিন এসেছেন। খানিক পরে আসে গৃহপরিচারক সুবহান। আর সবার শেষে আসে রুমী আর জামী। রুমী দরজা থেকেই নাটকীয় কায়দায় বলতে শুরু করে, 'এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।'
ফখরুদ্দিন বলেন, 'ভাবি, চা খাওয়ান।' সুবহান চা বানাতে রান্নাঘরে যায়।
তারপর শুরু হয় হিসাব-নিকাশ। আজকে কত লোক হয়েছে? ২০ লাখ নাকি ৩০ লাখ? এক সময় রুমী মাথা নাড়তে থাকে। সে বলে, 'আরে আজকে একটা বড় সুযোগ শেখ সাহেব মিস করলেন। তাঁর উচিত ছিল আজকেই স্বাধীনতা ডিক্লেয়ার করে দেওয়া।'
ফখরুদ্দিন সাহেব বলেন, 'চ্যাংড়া-প্যাংড়ারা কী রকম হঠকারী কথা বলে শুনছেন। আজকে এইখানে স্বাধীনতা ডিক্লেয়ার করলে তো পাকিস্তানি মিলিটারি এখনই ঝাঁপিয়ে পড়ত। সারা দুনিয়াকে বলত, দ্যাখো, ওরা রাষ্ট্রদ্রোহী, ওরা বিচ্ছিন্নতাবাদী। বরং আমি মনে করি, শেখ সাহেবের ভাষণটা এর চেয়ে ভালো করে আর দেওয়া যেত না। তিনি গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বলেছেন। যার যা আছে, তাই নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে হবে... না যেন কী বললেন না। আর শেষ করলেন কী দিয়ে... এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। স্বাধীনতাও ডিক্লেয়ার করা হলো, আবার দায়দায়িত্ব সব পশ্চিমাদের ঘাড়ে চাপানো হলো। মাথা গরম করে তো কিছু হবে না। ডিপোম্যাটিক হতে হবে...'
রুমী ঠিক যেন এই যুক্তি মেনে নিতে পারছে না। সুবহান ততক্ষণে চা দিয়ে গেছে।
জামী এল পাশের ঘর থেকে। তার কাছে নতুন খবর। 'জানো মা, আজ বিকালের পেনে জেনারেল টিক্কা খান এসেছে গভর্নর হয়ে।'
সবাই খবরটার তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করছে। এক সপ্তাহের মধ্যে দুবার গভর্নর বদল হলো। ব্যাপার কী?

আজাদ বাসায় ফিরে আসে গভীর রাতে। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে তারপর। কাপড় পাল্টাতে পাল্টাতে বলে, 'কই, বাশার কই। তোমাদের কী খবর বলো তো। আজকে মিটিংয়ে কত লোক হয়েছিল?'
বাশার তখন একমনে একটা বই পড়ছিল। বলল, 'একটা সোর্স বলছে তিরিশ লাখ। আমার বিশ্বাস হয় না।'
টগরকে সামনে পেয়ে আজাদ জিজ্ঞেস করে, 'কিরে তুই যাস নাই মিটিংয়ে?'
'গেছলাম।'
'কই ছিলি?'
'গাছের উপরে উঠছিলাম। ডাল ভাইঙ্গা নিচে পড়ছি। তখন ব্যথা বুঝি নাই। অহন তো হেভি ব্যথা করতেছে।'
'পা ভাঙ্গিস নাই তো?'
'না।'
'আয়োডেক্স লাগা।'
'লাগাইছি।'
'দাদা'-জায়েদ উঁকি দেয়।
আজাদ বলে, 'কিরে জায়েদ, তুই যাস নাই মিটিংয়ে?'
জায়েদ বলে, 'রমনা পার্ক পর্যন্ত যাইতে পারছিলাম। মাইনষের গুঁতায় আর যাইতে পারি নাই।'
মা আসেন এ ঘরে। তার চোখেমুখে ঘুম। তিনি শাড়ির আঁচল ঠিক করতে করতে বলেন, 'আজাদ এসেছিস। ভাত খাবি না?'
'না মা। ক্যাফে ডি তাজে খেয়েছি। তুমি আবার উঠলা কেন?'
'দিনকাল ভালো না। তোরা বাইরে থাকলে কি আর আমার ঘুম হয়। এই, রেডিওতে না শেখ সাহেবের ভাষণ প্রচার করার কথা ছিল, করল না কেন?'
আজাদ বলে, 'বুঝতে পারলাম না। বাশার, তোমাদের খবর কী বলো তো, রেডিও বন্ধ কেন?'
বাশার বলে, 'ভাষণ রিলে করার জন্যে রেডিওর লোকেরা রেডিই ছিল। কিন্তু মার্শাল ল অথরিটি অর্ডার দিয়েছে ভাষণ প্রচার করা যাবে না। এ জন্যে রেডিওর লোকেরা স্ট্রাইক করে সব প্রোগ্রামই বন্ধ করে দিয়েছে।'
মা বলেন, 'তা-ই হবে। তাই তো বলি রেডিওতে কোনো সাড়াশব্দ নাই কেন? আজাদ, তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে শুয়ে পড়। যা।'
পরদিন সকালবেলা। রোদ এসে পড়েছে জানালার পর্দায়, পর্দার ফাঁক দিয়ে ঘরের মেঝেতে। আজাদ আর আবুল বাশার আজকে তাড়াতাড়িই ঘুম থেকে উঠেছে প্রধানত গতকালকের উত্তেজনাবশত। কালকের এত এত ঘটনা ঘটে গেল দেশে, আজকের পত্রিকাগুলো সেগুলো নিয়ে কে কী লিখেছে, সেটা দেখা দরকার।

তবে আবুল বাশার মর্নিং নিউজ পত্রিকাটা হাতে নিয়েই প্রথমে খুঁজতে থাকে নিজের লেখা নিউজটা। বহু কষ্টে সেটা খুঁজে পায়। তার তৈরি করা খবরের ট্রিটমেন্ট দেখে ভুরু কুঁচকে ফেলে সে। বিড়বিড় করে বলে, 'থ্রি সি নিউজ করায়া নিয়া সিঙ্গেল কলাম ছাপানোর কী মানে?'

আজাদের হাতে ইত্তেফাক। তার সামনে চায়ের কাপ। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আজাদ বলে, 'শোনো, কালকে রেসকোর্সের পাবলিক মিটিং ছাড়া আর কিছু দুনিয়ায় ঘটে নাই। তুমি যে নিউজ করেছ, এটা যে সিঙ্গেল কলাম দিয়েছে, এটাই বেশি। এই দ্যাখো বাঙালি জেগে আছে, রেডিও সেন্টারে অলরেডি বোমা ছোড়া সারা। দাঁড়াও তো রেডিওটা ছাড়ি। আজকে কী অবস্থা, দেখা দরকার।'

রেডিওর নব ঘোরাতেই ঢাকা সেন্টার শোনা যায়। খুলেছে তাহলে। একটু পরে ঘোষণা, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভাষণ প্রচার করা হবে আজ সকাল সাড়ে ৮টায়।'

আজাদ বিছানার কাছে গিয়ে বালিশের নিচ থেকে ঘড়িটা বের করে। আরে, সাড়ে ৮টা তো প্রায় বাজেই। 'মা, মা'-সে চিৎকার করে ওঠে। 'মা, মা...'

রান্নাঘর থেকে মায়ের কণ্ঠ শোনা যায়, 'কী, বল।'

'এদিকে আসো। রেডিওতে শেখ সাহেবের ভাষণটা বাজাবে এখন। শুনবা না?'

'হাত বন্ধ তো। কচি, কচি, এদিকে আয় তো মা। চচ্চড়িটা তুই একটু দেখ। যেন তলায় না লেগে যায়। নাড়া দিবি।'

কচি বলে, 'তুমি কই যাও?'

'শেখ মুজিবরের ভাষণ নাকি হবে। আজাদ ডাকে...'

'আমি শুনব না?'

'তুইও শুনবি?'

'শুনব তো।'

'আচ্ছা তাহলে চচ্চড়িটা নামিয়েই রাখি।'

আজাদের মা হাত ধুয়ে আঁচলে মুছতে মুছতে আজাদদের ঘরে আসেন। ততক্ষণে ভাষণ শুরু হয়ে গেছে। আজাদ ভলিউম বাড়িয়ে দেয়। জায়েদ, টগর, টিসুও এসে দাঁড়ায় ঘরের ভেতরে। বঙ্গবন্ধু বলে চলেন, 'আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার মানুষকে হত্যা করা হয়, তোমাদের প্রতি আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম...' স্বাধীনতা কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আবারও টগরের মাথার ওপর দিয়ে হাজার হাজার পাখি উড়তে শুরু করে, যেন ডিম ভেঙে বেরিয়ে আসছে তারা, হাজারে হাজারে, আকাশ ঢেকে দিচ্ছে, আর স্বাধীনতা এই কলতানে মুখর করে তুলছে জগৎটাকে।

৩০

'আজাদ, কই যাস?' মা জিজ্ঞেস করেন।

'এই তো, ইস্কাটনে'-আজাদ শার্টটা প্যান্টের ভেতরে ঢোকাতে ঢোকাতে বলে।

'ইস্কাটনে? ইস্কাটনে কার বাসায়?'

'আবুল খায়েরের বাসায়। ক্রিকেট খেলতে।'

মা আশ্বস্ত হন। দেশের অবস্থা খুবই খারাপ। ইয়াহিয়া খান যে কী করছে, সে-ই জানে। শেখ মুজিব ভোটে জিতেছে, তাকে তুমি গদি ছেড়ে দাও। সে দেশ চালাক। তা না। ইয়াহিয়া চলছে ভুট্টোর কথামতো। শেখ সাহেব কি সেটা মেনে নেবার মতো মানুষ! নাকি বাঙালিরা তাকে তা মানতে দেবে। অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন শেখ সাহেব। সবকিছু তার কথামতো চলছে। যদি মুজিবর বলে, বিকালবেলা অফিস বসবে, তো বিকালবেলাই বসছে। হরতাল হচ্ছে। কিন্তু ইয়াহিয়া কারফিউ দিলে সেটা কেউ মানছে না। রাতের বেলা মিছিল বের হচ্ছে। মিছিলে গুলি চলছে। কতজন যে গুলিতে মারা গেল, ইয়ত্তা নাই। মায়ের বুকের মধ্যে হাহাকার করে ওঠে। কত মা আজ ছেলে ছেলে বলে কাঁদছে। মা বেঁচে থাকতে ছেলের মৃত্যু, এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কী আছে মায়ের কাছে ? আহা, আমার ছেলেটাকে সহিসালামতে রেখো মাবুদ। অজানা আশঙ্কায় তাঁর বুকের ভেতরটা কেঁপে কেঁপে ওঠে।

আজাদ বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ে নিউ ইস্কাটন রোডে আবুল খায়েরের বাসার উদ্দেশে। আবুল খায়ের দারুণ ক্রিকেটার। আজাদ বয়েজ ক্লাবের হয়ে ফার্স্ট ডিভিশনে খেলে নিয়মিত। তাদের বাসার ছাদটাও যেন একটা ছোটখাটো ক্রিকেট মাঠ। ওখানে বেশ ক্রিকেট প্রাকটিস করা চলে। ক্রিকেটের পাশাপাশি চলে আড্ডা। এ ছাড়া আর তাদের কী-ইবা করার আছে। কলেজ, ইউনিভার্সিটি বন্ধ। অফিস-আদালত বন্ধ। রাস্তায় যানবাহন নাই। শুধু আছে মিছিল আর মিটিং। কত সভাই না হচ্ছে। আওয়ামী লীগের, ছাত্রলীগের, ন্যাপের, ছাত্র ইউনিয়নের দু গ্রুপের, কমিউনিস্টদের, লেখক-শিল্পীদের, মিটিংয়ের কোনো শুমার নাই। ধারাবাহিক মিটিং প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। প্রত্যেকটাতে লোকসমাগম হচ্ছে প্রচুর। ইতিমধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকার নকশা করা হয়ে গেছে, বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে ছাত্রনেতারা সে পতাকা উত্তোলন করেছে আনুষ্ঠানিকভাবে, পতাকা ওড়ানো হচ্ছে চারদিকে, বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে

রবীন্দ্রনাথের আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি-কে বেছে নেওয়া হয়েছে। বামদলগুলো আহ্বান জানাচ্ছে স্বাধীনতা ঘোষণা করার জন্যে । তারা জনযুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে লিফলেট ছড়াচ্ছে। ছাত্ররাও শেখ মুজিবকে চাপ দিচ্ছে স্বাধীনতা ঘোষণা করার জন্যে।

সব ঠিক আছে। কিন্তু আজাদরা কী করবে! তারা তো আর কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য নয়। কোনো মিটিং মিছিল তাদের জন্যে বসে নাই। তারা তাই ক্রিকেট খেলে আর আড্ডা দেয়। আজাদদের মগবাজারের বাসা থেকে নিউ ইস্কাটন, সামান্যই পথ। হেঁটে যাওয়া চলে। রাস্তাঘাট ফাঁকা। শুধু বস্তির পিচ্চিদের একটা মিছিল দেখা যাচ্ছে। তাদের স্লোগানও খুব মজার। 'ইয়াহিয়ার দুই গালে, জুতা মারো তালে তালে'। দুই হাতে ছেঁড়া জুতা পরে নিয়ে তারা ডাম্বেলের মতো বাজাতে বাজাতে যাচ্ছে।

আবুল খায়েরদের বাসার ছাদে গিয়ে দেখা যায়, অনেকেই এসেছে। ইব্রাহিম সাবের খোঁড়াচ্ছে। খেলতে গিয়ে সে চোট পেয়েছে। জুয়েল পরে এসেছে একটা নীল রঙের টিশার্ট। চোখে একটা সানগ্লাস। তাকে দেখাচ্ছে একেবারে ইংরেজি ছবির নায়কের মতো। সৈয়দ আশরাফুল হকের বাসাও কাছেই। সেও এসে গেছে। আশরাফুলও দারুণ ক্রিকেট খেলে। হাবিবুল অলম আসে খানিকক্ষণ পরে। তার বাসা দিলু রোডে। সবাই কাছাকাছিই থাকে। শুধু জুয়েলের বাসা হাটখোলা।

আজাদ জিজ্ঞেস করে, 'জুয়েল, কেমন করে আসলি?'

জুয়েল বলে, 'কেমন কইরা আসলাম মানে!'

আজাদ বলে, 'হরতাল না! গাড়িঘোড়া কিছু আছে নাকি!'

'পালকি চইড়া আসলাম। ইয়াহিয়া খানের মাইয়ার লগে আমার বিয়ার কথা চলতেছে না। পালকি কইরা নিয়া আইল।'

আজাদ বলে, 'আরে আমি জিগাই হেঁটে আসলি নাকি!'

জুয়েল বলে, 'না, ক্রলিং কইরা আসলাম। যুদ্ধ শুরু হইলে ক্রলিং করতে হইব তো। তাই হাটখোলা থাইকা চার মাইল রাস্তা ক্রলিং কইরা আসলাম।'

আজাদ বলে, 'আরে জুয়েল খালি পেঁচায়।'

কাজী কামাল আসে। লম্বা একটা ছেলে। বাস্কেটবল খেলোয়াড়দের লম্বা হতে হয়। আজাদ ভাবে-অথচ ছোটবেলায় কামাল আর আমি একই সমান ছিলাম।

আবুল খায়ের বলে, 'জুয়েল তো জোকসের হাঁড়ি। উইকেটকিপিং করতে করতে জুয়েল এমন সব জোক্‌স বলে, ব্যাটসম্যান হাসতে হাসতে আউট হইয়া যায়।'

কামাল বলে, 'একটা জোক ছাড় না জুয়েল।'

আবুল খায়ের বলে, 'সুপারিরটা ক, জুয়েল সুপারিরটা ক।'

জুয়েল গা মোচড়ায়-'আরে এক জোক কয়বার কমু। ইয়াহিয়া, আইয়ুব, ভুট্টো-তিনজন গেছে পরকালে। ওইখানে প্রত্যেকরে কওয়া হইছে একটা কইরা ফল আনতে। আইয়ুব খান নিয়া গেছে একটা সুপারি। তার পিছন দিয়া সুপারি দিছে ঢুকাইয়া। তারপর আসছে ইয়াহিয়া। সে নিয়া গেছে কদবেল। তখন হেরা কয় বলে এত বড় ফল আনছ। সর্বনাশ করছ। এইটা তোমার পিছন দিয়া ঢুকাইতে হইব। শুইনা ইয়াহিয়া হাসে। আরে ব্যাক্কল, হাসিস কেন? ইয়াহিয়া কয়, আমি তো কদবেল আনছি। এরপর ভুট্টো আসতেছে। সে আনছে নারকেল।'

জুয়েলের কৌতুক শুনে সবাই হাসে। নির্দোষ হাসি, তা বলা যাবে না। ইয়াহিয়া আর ভুট্টোর শরীরের সঙ্গে বাংলার বাঁশগুলোর কোনো একটা সম্পর্ক স্থাপন করার বাসনায় প্রত্যেকের মন দোষযুক্ত হয়ে আছে।

আশরাফুল ব্যাট নিয়ে নেমে গেছে ছাদের ওপরেই। খায়ের বল করছে। খায়ের আশরাফুলকে সাবধান করে দেয়, 'বল ছাদ থেকে পড়ে গেলে কিন্তু আউট। খালি আউট না, ৬ রান মাইনাস। আর রেলিংয়ে লাগলে ৪।'

কিছুক্ষণ ক্রিকেট খেলা চলে। তারপর আবার সবাই বসে রেলিংয়ের ওপরে। আবার জমে ওঠে আড্ডা। দেশের কী হবে? ইয়াহিয়া আসলে কী চায়? ইন্টার কন্টিনেন্টালে আলোচনার নামে কী হচ্ছে! শেখ মুজিব কি ভুল করছেন! ছাত্রনেতারা, চার খলিফা কেন তাহলে চাপ দিয়ে স্বাধীনতা ডিক্লেয়ার করাচ্ছেন না।

রুমী আসে। এলিফ্যান্ট রোড থেকে হেঁটে আসায় তার চোখমুখ লাল হয়ে গেছে। তার গাল দুটো মেয়েদের মতো দেখাচ্ছে। আসলে সে হলো সর্বকনিষ্ঠ। কিন্তু তার কথাবার্তায় একটা বুদ্ধিজীবী-বুদ্ধিজীবী ভাব আছে। সে বলে, 'এভাবে হবে না। লড়াই করে স্বাধীনতা আনতে হবে। একদিকে আলোচনার নামে প্রহসন চলছে, আরেকদিকে প্লেনে করে মিলিটারি আনছে। আমার কিছু ভালো লাগছে না। ঘটনা খুব খারাপ দিকে মোড় নিচ্ছে। মাও সে তুংয়ের লাইন নিতে হবে। গণযুদ্ধের রণনীতি বইয়ে আছে না...

জুয়েল তার কথা মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলে, 'আইসা পড়ছে আমাদের তাত্ত্বিক। শোনো, এক মাইয়া। আমগো গাঁয়ের মাইয়া। তার সাথে বিয়া হইছে এক প্রফেসরের। মহাপণ্ডিত। বাসর রাতে প্রফেসর সাব খালি লেকচার দেয়। কয়, ফ্রয়েড বলেছেন... এইভাবে এক রাত যায়, দুই রাত যায়, ফ্রয়েড আর শেষ হয় না। মাইয়া কয়, আপনের যন্ত্রপাতি সব ঠিক আছে তো... তাইলে লেকচার দেন ক্যান?

প্রফেসর কয়, অহনও পূর্বরাগ চ্যাপ্টারই শেষ হয় নাই। তারপর আইব ফোরপে... তারপর... আস্তেধীরে আরো ২০০ পৃষ্ঠা পরে না অ্যাকশন... তা প্রফেসর সাহেব যখন ২০০ পৃষ্ঠা পড়ানো শেষ করলেন, মাইয়া তখন ৮ মাসের প্রেগন্যান্ট... প্রফেসর সাব কয়

কেমনে হইল... আমি তো তোমারে টাচই করলাম না, মাইয়া কয় আপনে যে পড়াইছেন, এতেই হইয়া গেছে... প্রফেসর কয় হইতে পারে আমারই উচিত ছিল প্রিকশন লওয়া... ফ্যামিলি প্লানিং চ্যাপ্টার আগে না পড়ানোয় এই ভুলটা হইয়া গেছে... কী বুঝলা, থিয়োরি কপচাইবা না...'

রুমী বলে, 'আমিও তো তাই বলি। এখন আলোচনার সময় না, এখন চাই ডাইরেক্ট অ্যাকশন...'

এর মধ্যে এসে পড়েছে ফারুক। সে বলে, 'তোমরা লেফটিস্টরা যখন নানা রকমের থিয়োরি দিচ্ছ, বাংলার মানুষ কিন্তু তখন মুক্তির লাইনে অনেক দূর এগিয়ে গেছে, কম তো শুনলাম না, ভোটের আগে ভাত চাই, এখন শুনছি, এই লড়াই হলো দুই কুকুরের লড়াই, আসল কাজ হলো শ্রেণীশত্রু খতম করা, মানুষ এসবকে পাত্তা দেয় নাই, ছয় দফার পেছনে বঙ্গবন্ধুর পেছনে একযোগে দাঁড়িয়ে পড়েছে, এখন সামনে আর কোনো উপায় নাই, দেশ স্বাধীন হবেই, চারদিকে তো শুধু স্বাধীন বাংলার পতাকা...'

একজন বলে, 'আরে ভোটের আগে ভাত চাই-এটা ভাসানী বলেছেন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করেই, যাতে বাঙালি ভোট ভাগ না হয় সেজন্য তিনি সরে গেছেন, আসলে বঙ্গবন্ধু আর ভাসানীর সম্পর্ক তো গুরুশিষ্য, না হলে ধরো পিতাপুত্রের...

'আচ্ছা, এত যে যুদ্ধ যুদ্ধ করতেছ, যুদ্ধ আরম্ভ হইলে কে কে যুদ্ধে যাবা?' একজন প্রশ্ন তোলে।

হাবিবুল আলম বলে, 'আমি যাব।'

কাজী কামাল বলে, 'আমিও যাব।'

জুয়েল বলে, 'আমি সবার আগে থাকব।'

রুমী বলে, 'আমাকে তো যেতেই হবে। উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই...'

'আজাদ, তুই কী করবি?'

আজাদ বলে, 'আমি মাকে গিয়ে বলব, মা, আমি যুদ্ধে যাব। তুমি 'না' কোরো না। মা যদি অনুমতি দেন, অবশ্যই যাব। না দিলে কী করব, সেটা বলতে পারি না। তোরা তো জানিসই, আমার মা বেঁচে আছে শুধু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে...'

আজাদ এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে পুরোটা আড্ডা নীরব হয়ে যায়, কারণ সবাই জানে আজাদের ব্যাপারটা, সবাই জানে এই ইস্কাটনের কোন বড়লোক বাড়ির ছেলে আজাদ, শুধু মায়ের সম্মান রক্ষার জন্যে মায়ের সঙ্গে মগবাজারের বাসায় একা পড়ে আছে।

সেই নীরবতা ভঙ্গ করে দূর থেকে মিছিলের স্লোগানের ধ্বনি ভেসে আসে, 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো...'

৩১

আজাদ নিজেকে সব সময়ই ননপলিটিক্যাল বলে পরিচয় দিতে পছন্দ করত। তবে ২৫শে মার্চ রাতে সে মগবাজারে পিকেটিং করছিল, ব্যারিকেড দিচ্ছিল রাস্তায়, এ কথা কাজী কামালের মনে আছে। স্পষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যায় জায়েদেরও। জায়েদ বলে, ২৫শে মার্চ রাতে মগবাজারে আজাদের সঙ্গে আশরাফুলসহ মগবাজার ইস্কাটন এলাকার বন্ধুরাও ছিল। হাবিবুল আলমের মনে আছে, সেও ছিল মগবাজারের মোড়েই। তার সঙ্গে ছিল শেখ কামাল। মেলা রাত পর্যন্ত। আর ছিল জনতা। ছাত্র, যুবক, শ্রমিক। সবার হাতে বাঁশের লাঠি। রড। পৌনে ১২টার দিকে শেখ কামাল চলে যায়।

আজাদের এ রাতে পিকেটিং করতে যাওয়ার পেছনে অন্যান্য কারণের সঙ্গে একটা প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত ক্ষোভও আছে। আজাদ আর জায়েদ সম্প্রতি দিনের বেলা গিয়েছিল ফরাশগঞ্জে। ওখানে আজাদের বাবার এক কর্মচারীর কাছ থেকে আজাদ মাসোহারার টাকা নিয়মিতভাবে তুলে থাকে। অসহযোগের ভেতরে তার ব্যবসা-বাণিজ্য খারাপ যাওয়ায় একদিন হরতালের বিরতিতে আজাদ জায়েদকে নিয়ে গিয়েছিল ফরাশগঞ্জে, মাসোহারার টাকা তুলতে। কর্মচারীটি টাকা দিতে আপত্তি জানিয়েছিল। ওজর দেখিয়েছিল, ব্যাঙ্ক বন্ধ, হাতে টাকা নাই। জায়েদ 'হারামজাদা' বলে চেয়ার তুলে ছুড়ে মেরেছিল কর্মচারীটার মাথা বরাবর। তাতে কাজ হয়েছিল। কর্মচারী বাপ বাপ বলে টাকা তুলে দিয়েছিল আজাদের হাতে। দুজন টাকা নিয়ে বেবিট্যাক্সিতে ফিরছিল। পথে একটা জায়গায় ব্যারিকেড। তারা ব্যারিকেডের ওখানে নেমে রাস্তা পার হবে হেঁটে, ঠিক করেছিল। ঠিক এই সময় কতগুলো পাঞ্জাবি সৈন্য তাদের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে তেড়ে এসেছিল। বলেছিল, ব্যারিকেড নিকাল দো। তারা তাদের রাইফেলের বাঁট দিয়ে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে বাধ্য করেছিল রাস্তার ব্যারিকেড অপসারণের কাজ করতে। কাজটা করতে আজাদের মোটেও ভালো লাগছিল না। আর হারামজাদা ধরনের গালি, সঙ্গে রাইফেলের বাঁটের মৃদু প্রহার মোটেও সম্মানজনক বলে তার কাছে মনে হচ্ছিল না। সে দাঁতে দাঁত ঘষে পণ করেছিল, সুযোগ পেলেই এ বেটা পাঞ্জাবিদের ছ্যাঁচা দিতে হবে।

আসলে আজাদ, আশরাফুল, কাজী কামাল, হাবিবুল আলম, জুয়েল-এরা সবাই বা এদের মতো ঢাকার আরো অসংখ্য তরুণ, প্রায় সব তরুণ-যুবক অসহযোগ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিল, তার পেছনে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্য নয়, বরং কাজ করেছিল স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা, স্বতঃস্ফূর্ত দায়িত্ববোধ, যৌবনের স্বাভাবিক অপরাজেয় অপ্রতিরোধ্য প্রতিবাদী চেতনা ও স্বভাবধর্ম। হেলাল হাফিজের ওই সময়ে রচিত ওই কবিতাটাতেই এই ব্যাপারটা অভ্রান্তভাবে ধরা পড়েছে :

এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়

এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়
২৫শে মার্চ ১৯৭১-এও যৌবনের স্বভাবধর্ম মিছিলে ব্যারিকেডে টেনে নিয়ে এসেছিল আজাদকে, জায়েদকে, টগরকে, কাজী কামালকে, হাবিবুল আলমকে, সৈয়দ আশরাফুল হককে, লক্ষ লক্ষ ঢাকাবাসীকে। ইতিমধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে পাকিস্তানি নেতাদের আলোচনা ভেঙে গেছে, ২৩শে মার্চ দেশব্যাপী প্রতিরোধ দিবস পালিত হয়ে গেছে, বঙ্গবন্ধু নিজে তার বাসভবনে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেছেন। ২৪শে মার্চ দিনটা ছিল থমথমে। মানুষ রাস্তা পাহারা দিচ্ছে, আর স্থানে স্থানে গুলি হচ্ছে, সারা বাংলায় জনা পঞ্চাশেক মানুষ মারা গেছে সেনাবাহিনী ও পুলিশের গুলিতে। এদিকে আওয়ামী লীগ ২৬ তারিখ থেকে সর্বাত্মক হরতাল ডেকেছে, ২৫শে মার্চ রাতে তারই সমর্থনে ছাত্রজনতা রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড দিচ্ছে।

আজাদের মা বসে আছেন ভাত নিয়ে। এশার নামাজ পড়া হয়ে গেছে। তিনি তেলাওয়াত করেন প্রতিটা ওয়াক্তের নামাজের শেষে, জায়নামাজে বসে, আজ তাও সমাপ্ত। রাত বাড়ছে। আজাদ কেন এখনও ফেরে না। জায়েদ ফিরে এসেছে। সে উত্তেজিত-'আম্মা, একটা পানির ট্যাঙ্ক দিয়া ব্যারিকেড দিছে। মগবাজারের মোড়ে। হেভি হইছে। অহন ইটা ফেলতাছে। দাদারা স'মিল থাইকা গাছের গুঁড়ি আনতে গেছে। গাছের গুঁড়ি ফেললে ব্যারিকেডটা সলিড হইব।'

মায়ের কেমন যেন ভয় ভয় লাগে। কখন কী হয়? যদি মিলিটারি গুলি করে!

রাত বাড়তে থাকলে রাস্তায় ভারি যানবাহন চলাচলের শব্দ শোনা যায়। জায়েদ বাইরে থেকে খোঁজ নিয়ে এসে বলে, 'ট্যাংক নামায়া দিছে। বুলডোজার নামাইছে।'

গুলির শব্দ। গোলার শব্দ। জানালায় দাঁড়ালে আকাশে দেখা যাচ্ছে, আলো- বোমা ছোড়া হচ্ছে আকাশে। সমস্ত আকাশ হঠাৎ হঠাৎ আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। আর শোনা যাচ্ছে সম্মিলিত মানুষের হৈ-হল্লা। এত জোরে জোরে আওয়াজ হচ্ছে, যেন আজই কেয়ামত হয়ে যাবে। মা বাসার সবাইকে খাটের নিচে শুইয়ে দেন। কিন্তু নিজে বারবার ছুটে যান গেটের দিকে। আজাদ কেন ফেরে না। আজাদ কোথায় গেল? তার কিছু হয় নি তো!

দরজায় ধাক্কার শব্দ। মা দৌড়ে গিয়ে দরজা খোলেন। আজাদ নয়, বাশার। মা বলেন, 'এসেছ বাবা।'

বাশার বলে, 'বাইরের অবস্থা খারাপ।'

'আজাদকে দেখেছ?'

বাশার উদ্বিগ্ন-'আজাদ আসেনি? ঠিক আছে, আমি দেখি, ও কোথায়?'

মা বলেন, 'না বাবা, তুমি যেও না। কোথায় খুঁজতে যাবে?'

এই সময় আজাদ ফেরে। বলে, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে। আর্মি নেমেছে। মাইকে এনাউন্স করছে, যেখানেই ব্যারিকেড দেখবে, সেইখানেই গুলি চলবে। আশপাশের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেবে।'

'আরে, তোকে এত কিছু দেখতে শুনতে কে বলেছে! তুই মাটিতে শুয়ে পড়'-মা তাকে ধরে মেঝেতে শুইয়ে দেন।

বাড়ির সবাই মেঝেতে শুয়ে আছে। বোমার আওয়াজ, মেশিনগানের আওয়াজ, রাইফেলের গুলির আওয়াজ, মানুষের আর্তনাদ, ভেসে ভেসে আসছে। মনে হচ্ছে আকাশের সমস্ত মেঘ বিদ্যুৎ আর বজ্রসমেত ভেঙে পড়ছে পৃথিবীর ওপর।

আজাদ ওঠে। জানালার ধারে যায়। বাইরের আকাশে ট্রেসার হাউই উড়ছে মাঝে মধ্যে, আকাশ আলোকিত করে, আর চারদিকে আগুনের লেলিহান শিখা। মা বকতে থাকেন, 'আজাদ, জানালার ধারে যাস কেন, এদিকে আয়। এদিকে আয়। লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা পড়। হে আল্লাহ, জালিমের জুলুম থেকে তুমি আমাদের রক্ষা করো।'

৩২

১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ রাতে, এই ঢাকা শহরে পাকিস্তানি জান্তা তার সামরিক বাহিনীকে ট্যাঙ্ক, কামান, মর্টারসহ নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর লেলিয়ে দিয়ে যে গণহত্যা আর ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল, তার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে আর একটাও পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ আছে। শুধু ২৫শে মার্চ রাতের ধ্বংসযজ্ঞ, নৃশংসতা, চারদিকে আগুনের লেলিহান শিখা, কামান দাগিয়ে উড়িয়ে দেওয়া ছাত্রাবাস, ছাত্রাবাস থেকে বের করে এনে কাতারবন্দি করে দাঁড় করিয়ে ছাত্রদের ব্রাশ ফায়ার করে মেরে ফেলা, যেন তারা পিঁপড়ার সারি, আর তুমি অ্যারোসল স্প্রে করে মারলে শত শত পিঁপড়াকে, গণকবর খুঁড়ে মাটিচাপা দেওয়া সেইসব লাশ, এখনও মারা না যাওয়া কোনো গুলিবিদ্ধ ছাত্রের মাটিচাপা পড়ে তলিয়ে যাওয়ার আগে মা বলে কেঁদে ওঠা শেষ চিৎকার, শিক্ষক-আবাসে ঢুকে নাম ধরে ডেকে ডেকে হত্যা করা শিক্ষকদের, তার শিশুসন্তানের সামনে, তার স্ত্রীর সামনে, কামানের তোপ দাগিয়ে উড়িয়ে দেওয়া পুড়িয়ে ভস্মীভূত করা সংবাদপত্র অফিস আর খুন করে ফেলা সাংবাদিকদের, আর আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া জনবসতি, ভেতরে পুড়ে যাচ্ছে মা আর তার স্তনবৃন্তে মুখ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়া শিশু, ভেতরে পুড়ে যাচ্ছে বৃদ্ধ, তার মুখ থেকে এখনও শেষ হয়নি বিপদতাড়ানিয়া আজানের আল্লাহু আকবার ধ্বনি, মাংস পোড়া গন্ধে ভারি হয়ে উঠছে বাতাস, আর সে-মাংস মানুষের, আর ভীতসন্ত্রস্ত পলায়নপর মানুষদের নির্বিচারে গুলি করে হত্যা, পুলিশ

ব্যারাকে আগুন লাগিয়ে জীবন্ত দগ্ধ করে মারা বাঙালি পুলিশদের, ইপিআর ব্যারাকে হামলা চালিয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে গুলি করে মারা বাঙালি ইপিআর সদস্যদের, সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল ঘেরাও করে ভেতরে আশ্রয় নেওয়া মানুষদের নির্বিচারে পাখি মারার মতো করে হত্যা করা, লাশে আর রক্তে ভেসে যাচ্ছে বুড়িগঙ্গা, যেন হঠাৎ মাছের মড়ক লাগায় নদীতল ছেয়ে গেছে মরা মাছে, না, কোথাও পানি দেখা যাচ্ছে না, লাশ আর লাশ, আর সেসব মাছ নয়, মানুষ, ঢাকার সবগুলো পুলিশ স্টেশনে টেবিলের ওপরে উপুড় হয়ে আছে বাঙালি ডিউটি অফিসারের গুলি খাওয়া মৃতদেহ, দমকল বাহিনীর অফিসে ইউনিফরর্ম পরা দমকলকর্মীরা শুয়ে আছে, বসে আছে, গুলিবিদ্ধ হয়ে দেয়ালে আটকে আছে লাশ হয়ে, ঢাকার সবগুলো বাজারে আগুন দেওয়া-পাতার পর পাতা শুধু এই পৈশাচিকতার, এই আগুনের, লাশের, হত্যার, আর্তনাদের আর মানুষ মারার আনন্দে উলাসে ফেটে পড়া সৈনিকের অট্টহাসির, আর মদের গেলাস নিয়ে মাতাল কণ্ঠে সাবাস সাবাস আরো খুন আরো আগুন আরো রেইপ বলে জেনারেলদের চিৎকারে ফেটে পড়ার বর্ণনা লেখা যাবে, শত পৃষ্ঠা, সহস্র পৃষ্ঠা, নিযুত পৃষ্ঠা, তবু বর্ণনা শেষ হবে না, তবু ওই বাস্তবতার প্রকৃত চিত্র আর ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হবে না। কেউ-বা সব দেখেছে একবারে, যে দেখেছে রাজারবাগে হামলা, তার কাছে ওই তো নরক, যে দেখেছে ইপিআরে হামলা, এক জীবনে সে আর কোনো দিনও স্বাভাবিক হতে পারবে না, যে অধ্যাপক ভিডিও করেছেন জগন্নাথ হলের মাঠে সারিবদ্ধ ছাত্রদের গুলি করে মেরে ফেলার দৃশ্য, তিনিও তো ঘটনার সামান্য অংশই চিত্রায়িত করতে পেরেছেন মাত্র, যে সায়মন ড্রিঙ্ক বিদেশী সাংবাদিকদের বহিষ্কার এড়িয়ে ইন্টার কন্টিনেন্টাল হোটেলের রান্নাঘর দিয়ে পালিয়ে গিয়ে লন্ডনের দি ডেইলি টেলিগ্রাফ-এ পাঠিয়েছিলেন 'জেনোসাইড ইন বাংলাদেশ, সাম উইটনেস অ্যাকাউন্টস, হাউ ড্যাক্কা পেইড ফর ইউনাইটেড পাকিস্তান', তিনি নরকের বর্ণনার সামান্যই দিতে পেরেছিলেন।

৩৩

২৫শে মার্চ রাতে সারাটা শহরে পাকিস্তান আর্মি কোন জাহান্নাম প্রতিষ্ঠা করেছে, তার বর্ণনা আস্তে আস্তে ঢাকাবাসী জানতে, বুঝতে, উপলব্ধি করতে শুরু করে। ২৭শে মার্চ কারফিউ উঠিয়ে নেওয়ার পরে যারা রাস্তায় বেরোয়, তারা দেখতে পায় শুধু লাশ আর লাশ। রাজারবাগের আশেপাশে যাদের বাসা ছিল, তারা ওই রাতে প্রত্যক্ষ করেছে, সারা রাত গুলির মধ্যে কোনো রকমে মাথা বাঁচিয়ে উপলব্ধি করেছে পাকিস্তানি সৈন্যদের নৃশংসতা। কামান মর্টার দিয়ে গোলা তো ছোড়া হয়েইছিল রাজারবাগ পুলিশ লাইনে, চারদিক থেকে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাদের ক্যাম্পে। পানির ট্যাঙ্কে যে বাঙালি পুলিশ পজিশন নিয়েছিল, তারা মারা গেছে ফুটন্ত পানিতে সেদ্ধ হয়ে। আলতাফ মাহমুদের বাসা ছিল রাজারবাগ পুলিশ লাইনের খুব কাছে। তাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন সেই দোজখের খানিকটা। ভোর হতে না হতে প্রতিরোধকারী বাঙালি পুলিশরা আর টিকতে না পেরে একজন-দুজন করে পালিয়ে যাচ্ছিল এদিক-ওদিক। তাদেরই দুজন আসে আলতাফ মাহমুদের বাসায়। তারা তাদের পোশাক খুলে সাধারণ লুঙ্গি-শার্ট ধার নিয়ে পরে অস্ত্র রেখে পালিয়ে যায়। এ রকম পলায়নপর বাঙালি পুলিশদের আশ্রয় দিয়েছিল, পোশাক দিয়েছিল আশপাশের অনেক বাঙালি পরিবার। নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চুর মনে আছে, ২৫শে মার্চ রাতে রাস্তায় গাছ কেটে, সুয়ারেজ পাইপ ফেলে তারা ব্যারিকেড দিচ্ছিল। ১১টা সাড়ে ১১টার দিকে ট্যাঙ্ক, আরমার্ড কার নিয়ে আর্মি রাস্তায় নেমে আসে গুলি করতে করতে। রাতের বেলা জোনাকি সিনেমা হলের কাছে হাসানের বাসায় আশ্রয় নেয় সে, সারা রাত রাজারবাগে পুলিশের সঙ্গে পাকিস্তানি আর্মির যুদ্ধ হয়, ভোরবেলা বাচ্চু বেবির বাসা হয়ে পল্টন লাইনের নিজের বাসায় ফিরছে গলিপথে, দেখতে পায় বাঙালি পুলিশরা পালিয়ে যাচ্ছে।বাচ্চুদের কাছেও তারা অস্ত্র রেখে যায়। তখনও ধোঁয়া উড়ছে শান্তিনগরে, রাজারবাগে, জোনাকির সামনে রাস্তায় লাশ পড়ে আছে।

২৬শে মার্চ ১৯৭১। বাইরে কারফিউ। আজাদ আর বাশার বাসায় বসে আছে। কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। মায়ের কঠোর নিষেধ, বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করা যাবে না। জায়েদ উসখুস করছে, তার মতলব একবার গলির মুখে গিয়ে দেখে ঘটনা কী? মাঝে মধ্যে ট্যা-ট্যা করে গুলির শব্দ ভেসে আসছে। ছাদে গিয়ে তাকালে এদিকে-ওদিকে ধোঁয়া দেখতে পাওয়া যায়। আবার গোলাগুলির শব্দ। খুব কাছে থেকে আসছে শব্দ। মনে হয় শেল এসে পড়ছে এই বাসারই ওপরে। আজাদের মা দৌড়ে আসেন। 'আজাদ কোথায়? আয়। আয়। শুয়ে পড়। জায়েদ কোথায়? এই তুই আবার উঠে পড়ছিস কেন? শো বলছি।'

একটু পরে আবার শব্দ থেমে যায়। আজাদ রেডিও অন করে। রেডিও পাকিস্তান থেকে একটা অপরিচিত কণ্ঠ ভেসে আসছে। কোনো অবাঙালি হবে হয়তো। না ইংরেজি, না উর্দু, না বাংলা, এক অদ্ভুত ভাষায় সে ঘোষণা পাঠ করে চলেছে। সবই সামরিক বিধি। টিক্কা খানের সামরিক বিধি বমন করে চলেছে রেডিওটা। কী করা যাবে, কী করা যাবে না, অ্যালার্ন হচ্ছে। আর বলা হচ্ছে, প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন। আজাদ রেডিওর নব ঘোরাতে থাকে। আকাশবাণী শোনা যায়।

এদের খবরটা শুনলে হয়। আকাশবাণীর ইংরেজি খবরে বলা হয় : ওয়েস্ট পাকিস্তান হ্যাজ অ্যাটাক্ড ইস্ট পাকিস্তান।

আবার গুলির শব্দ। সবাই চুপ করে আছে।

কিন্তু এরই মধ্যে হঠাৎ তাদের বাসার দরজায় কে যেন ধাক্কা দেয়। কে? এই ঘোর দুর্যোগের মধ্যে কে?

বাসার সবার নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাবে, এমন নিস্তব্ধতা।

আবার কড়া নাড়ার শব্দ।

আজাদ বলে, 'কে?' কিন্তু তার গলা থেকে শব্দ ঠিকমতো বেরুচ্ছে না। সে কেশে গলা পরিষ্কার করে নেয়। কে? সে এবার স্পষ্ট গলায় বলে।

মা ছুটে আসেন। ফিসফিস করে বলেন, 'আজাদ, তুই ওই ঘরে যা। আমি দেখছি।' মা জানালার বদ্ধ কপাটের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেন কে। বুঝতে পারেন না।

তারপর জানালাটা খুলে বারান্দায় তাকান। না কেউ না।

২৭শে মার্চ। আজ সকালে কারফিউ নাই। দুপুর থেকে আবার শুরু হবে। আজাদ আর বাশার বের হয়। রেললাইনের পথ ধরে ছুটে চলেছে হাজার হাজার মানুষ। নারী-পুরুষ, শিশু, আবালবৃদ্ধবনিতা। প্রত্যেকের হাতে সাধ্যমতো ব্যাগ, সুটকেস, পোটলা। কারো কোলে বাচ্চা। সবার চোখেমুখে ভয়। সবাই যেন এই মৃত্যুপুরী ছেড়ে পালিয়ে কোনো রকমে পেতে চাইছে একটুখানি জীবনের শরণ। একটা ছোট্ট ছেলে মাথায় একটা বড় ট্রাঙ্ক নিয়ে চলেছে। আজাদ আর বাশার কেউ কোনো কথা বলে না। তারা আরেকটু এগিয়ে যায়। আউটার সার্কুলার রোডে হোটেল দ্য প্যালেসের সামনে দেখতে পায় পড়ে আছে একটা লাশ। আজাদ চমকে ওঠে। কিন্তু এটা কিছুই নয়। আরো অনেক লাশ তাদের দেখতে হবে। তারা রাজারবাগের দিকে এগোয়। পথে পথে ছড়িয়ে আছে লাশ। গুলিবিদ্ধ শরীর থেকে বেরুনো রক্ত শুকিয়ে পড়ে আছে রাস্তায়। পুলিশ ব্যারাক থেকে এখনও ধোঁয়া উঠছে। কুকুরে টানাটানি করছে লাশ নিয়ে। কত যে লাশ পড়ে আছে ইতস্তত, ইয়ত্তা নাই।

আজাদ আর বাশার এতক্ষণ কেউ কোনো কথা বলেনি।

হঠাৎ বাশার রাস্তার ধারে বসে পড়ে।

আজাদ জিজ্ঞেস করে, 'কী হলো?'

বাশার একবার 'ওয়াক' করে ওঠে।

'খারাপ লাগছে?'

'হুঁ।'

আজাদ দেখতে পায়, বাশারের পুরোটা কপাল ঘামছে। বোধহয় তার পেটের ভেতরটা গুলিয়ে উঠছে। বমি করবে নাকি সে? কিন্তু সকালে তারা নাশতা করে বের হয়নি। দুজনেরই পেট খালি। বমি হবে না। শুধু পিত্ত উগড়ে উঠবে। কষ্ট হবে।

আজাদ একটা কাগজ কুড়িয়ে এনে বাশারের মাথায় বাতাস করে। সঙ্গীর বিবমিষা দেখে তারও বমি পাচ্ছে।

বাশারের চোখেমুখে একটু পানি ছিটাতে পারলে হয়তো ওর ভালো লাগত। ওই যে দূরে রাস্তার ধারে একটা পানির কল দেখা যাচ্ছে। আজাদ বলে, 'দাঁড়াও, তোমার জন্যে একটু পানি নিয়ে আসি। চোখেমুখে দেবে।'

পানির কলের কাছে সে যায় বটে, কিন্তু পানি সে নেবে কী করে? আঁজলা ভরে পানি নিলেও বাশারের কাছে পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যাবে না। সে পকেট থেকে রুমাল বের করে। ভিজিয়ে নেয় রুমালটা। তারপর বাশারের কাছে এসে ভেজা রুমাল দিয়ে বাশারের চোখ-মুখ-কান-ঘাড় মুছে দেয়। বাশারের খানিকটা আরাম লাগে। সে বলে, 'এখন ঠিক আছি। চলো বাসায় ফিরে যাই।'

তারা বাসায় ফিরে আসে। মা চিলাচিলি-শুরু করে দিয়েছেন, 'এই, তোরা কই গিয়েছিলি? বলে যাবি না? নাশতা না করে কেউ বাইরে যায়!'

দুপুরের আগে হঠাৎ তাদের বারান্দায় বুটের শব্দ। দরজায় নক। জায়েদ এগিয়ে গিয়েছিল। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখে : সর্বনাশ। দুইজন সৈন্য। মিলিটারি সদস্য। তাদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। সে প্রমাদ গোনে।

জায়েদ দৌড়ে ভেতরে আসে। আজাদ আর বাশার তখন রেডিওর নব ঘোরাচ্ছে। কোন রেডিও কী বলে, শোনা দরকার। আকাশবাণী, বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা, ঢাকা-সবই সে একের পর এক শুনছে। জায়েদ গিয়ে হাজির সেখানে-'দাদা দাদা।' জায়েদের কণ্ঠে ফিসফিসানি।

'কী হয়েছে?'

'দাদা', জায়েদ কথা থামিয়ে প্রথমে একটা শ্বাস নেয়, তারপর বলে, 'বাসাত মিলিটারি আইছে।'

'মিলিটারি?' আজাদ আর বাশার একই সঙ্গে বলে ওঠে। তাদের হতবিহ্বল দেখায়। তারা এখন কী করবে?

দরজা থেকে তখন শোনা যায়, 'আজাদ, আজাদ আছ নাকি?'

বাঙালির গলা। আজাদ এগিয়ে যায় বারান্দার দরজায়। 'কে?' সে কণ্ঠ উঁচিয়ে বলে।

'আমি সালেক। তোমার সেন্ট গ্রেগরির ফ্রেন্ড।'

আজাদ তাড়াতাড়ি দরজা খোলে। সালেক চৌধুরী তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এ বাসাতেও সে একবার এসেছে। আর্মিতে আছে। 'আসো, আসো।'
সালেক ভেতরে ঢোকে। সেনাবাহিনীর পোশাকে তাকে একটু অন্যরকম যে লাগছে না, তা নয়। তার সঙ্গে তার এক সহকর্মী হবে।
সালেক ঢুকেই বলে, 'দরজা বন্ধ করে দাও। ও আমার বন্ধু ক্যাপ্টেন মাহমুদ। মাহমুদ, এই হলো আজাদ। তোমাকে তো এর কথা বলেইছি। আজাদ, শোনো। ক্যান্টনমেন্টের অবস্থা খারাপ। আমরা পালিয়ে এসেছি। পালিয়ে চলে যাব। তুমি এক কাজ করো, আমাদের দুজনকে তোমার দু সেট কাপড় দাও। কারফিউ আরম্ভ হওয়ার আগেই ঢাকা ছাড়তে হবে।'
আজাদ বলে, 'বসো। দিচ্ছি।'
মা এগিয়ে আসেন। সব শোনেন। তার চোখেমুখে উদ্বেগ। তিনি বলেন, 'বাবারা, তোমরা কিছু খেয়েছ?'
সালেক বলে, 'খালাম্মা, খেতে হবে না। আগে ঢাকার বাইরে যেয়ে নিই।'
মা বলেন, 'বাবা, আমি ভাত তুলে দিয়েছি। ভাত খেয়ে তারপর যেও।'
সালেক বলে, 'সময় হবে না খালাম্মা।'
জায়েদ তখন পাশের ঘরের দরজার সামনে দিয়ে বারবার হাঁটাচলা করছে, আর বোঝার চেষ্টা করছে, কারা এল। পরে যখন বোঝে, এ তো সালেক ভাই, তখন সে ঢোকে এ ঘরে। টেবিলের ওপরে দুটো অস্ত্র রাখা। সেসবের দিকে তার অভিনিবেশ।
আজাদ তাদের দুজনকে প্যান্ট-শার্ট আর স্যান্ডেল দেয়। তারা কাপড় পাল্টে নেয়। অস্ত্র দুটো তারা নেয় একটা চটের বস্তায়। তারপর সালেক বলে, 'আজাদ উঠি রে।'
আজাদ বলে, 'কোন দিকে যাবা?'
সালেক বলে, 'জানি না। আলাহ ভরসা।'
মা আসেন। 'বাবা, আর পাঁচটা মিনিট বসো। ভাত হয়ে এসেছে।'
সালেক আর মাহমুদ ঘড়ি দেখে। 'না খালাম্মা। হাতে সময় আছে আর আধঘণ্টা। এর মধ্যে সদরঘাট দিয়ে নদী পার হয়ে যেতে চাই।'
'তাহলে বাবা একটু চিঁড়া ভিজিয়ে দিই। গুড় দিয়ে মেখে দিই। খেয়ে যাও।'
মা দৌড়ে চিঁড়া ভেজাতে যান। সালেক বলে, 'খালাম্মা। নাহ্। থাকুক, দেরি হয়ে যাবে। আমরা যাই।'
চিঁড়া ভেজানোই থাকে। সালেক আর মাহমুদ সিভিল ড্রেসে বেরিয়ে যায়। ঘরে পড়ে থাকে তাদের সামরিক পোশাক, বেল্ট, জুতা, টুপি।
মা সেগুলো একটা বস্তায় ভরে রান্নাঘরের পেছনে কাঠের স্তূপের আড়ালে রেখে আসেন।

জায়েদের চোখ পড়েছে বেল্ট দুটোর দিকে। এক ফাঁকে সে বেল্ট দুটো সরিয়ে নেবে, মনে মনে পরিকল্পনা আঁটে।
তবে এ পরিকল্পনা সে বাস্তবায়িত করতে পারে না। দুদিন পরই কারফিউয়ের বিরতিতে আম্মার নির্দেশে পুরোটা বস্তা মাথায় করে নিয়ে সে ফেলে দিয়ে আসে এফডিসির পুকুরে।
২৭শে মার্চ দুপুরের দিকে, কয়েক ঘণ্টার জন্যে কারফিউ তুলে নেওয়ার অবকাশে, জুয়েল এসে হাজির সৈয়দ আশরাফুল হকের বাসায়। ডোরবেল টেপে। বাসার লোকজন উঁকি দিয়ে দেখে, কে এল। জুয়েলকে দেখে দারোয়ান বলে, 'কে?'
জুয়েল বলে, 'আমি জুয়েল। বাবু আছে?'
সৈয়দ আশরাফুল এসে গেট খোলে।
'কী ব্যাপার?'
'শোনো নাই, মুশতাক ভাইরে মাইরা ফেলছে!'
'কোন মুশতাক?'
'তোমগো আজাদ বয়েজ ক্লাবের মুশতাক ভাই।'
'কও কী?'
আশরাফুলের মাথা চক্কর দিয়ে ওঠে। আজাদ বয়েজ ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ক্রীড়ানুরাগী মুশতাক ভাইকে মেরে ফেলেছে? সে ভয়ার্ত গলায় বলে, 'কেমনে?'
'ডিডিএসএর সামনে হের গুলি খাওয়া লাশ পইড়া আছে। হাত দুইটা নাকি উপরে ধরা। মনে হয় উর্দুতে কিছু একটা বুঝাইতে চাইছিল, পারে নাই। অনেকে দেখতে যাইতেছে। যাবা?'
'চলো।'
তারা দুজন বেরিয়ে পড়ে ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন কার্যালয়ের উদ্দেশে। আশরাফুলের সামনে লাশের বর্ণনা দেবার সময়ও জুয়েল বুঝতে পারেনি আসলে গুলি খেয়ে মৃত্যু ব্যাপারটা কী! কিন্তু ডিডিএসএ কার্যালয়ে গিয়ে যখন মুশতাক ভাইয়ের চিৎ হওয়া উন্মুক্ত শরীরটা গুলিবিদ্ধ আর রক্তাক্ত অবস্থায় সে দেখে, তখন একটা মানুষের এ রকম অন্যায় প্রতিকারহীন মৃত্যু যেন সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। লোকটার সঙ্গে তিন দিন আগেও তাদের দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে। এখন কীভাবে শুয়ে আছে দুদিনের বাসি লাশটা।
ঢাকার অনেক ক্রিকেটারকেই ক্রিকেট খেলতে উদ্বুদ্ধ করা, ক্রিকেটের বিষয়ে একাগ্র ও পরিশ্রমী হতে বলার কাজটা মুশতাক ভাই করে আসছেন দীর্ঘদিন ধরে।
সেই মুশতাক ভাইকে এভাবে মেরে ফেলা হবে? জুয়েলের চোয়ালটা শক্ত হয়ে ওঠে। সে কামড়ে ধরে নিচের ঠোঁট।

আর ভয়ে আশরাফুলের শরীর ওঠে গুলিয়ে।
হঠাৎ শোনা যায়, কে যেন ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল।
জুয়েল আর আশরাফুল লোকটার দিকে তাকায়। আজাদ বয়েজ ক্লাবের পিয়ন খয়বার। ওদিকে দেখা যাচ্ছে ক্রিকেটার রকিবুল হাসানও এসে গেছেন।

৩৪

আজাদ ধীরে ধীরে জানতে পারে, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সারি বেঁধে হত্যা করা হয়েছে ছাত্রদের, বাসায় গিয়ে গুলি করে খুন করা হয়েছে শিক্ষকদের, ছাত্রীহলে গিয়ে নারকীয় নির্যাতন করা হয়েছে মেয়েদের। তার হাতের মুঠো শক্ত হয়ে আসে। ক্রোধের আগুনে শরীর হয়ে ওঠে তপ্ত। তবে রাজনীতির সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকায় ঠিক কী করা উচিত সে বুঝে উঠতে পারে না। কিন্তু সে-সময়ই তার বন্ধুরা, পরবর্তীকালে যারা তার সহযোদ্ধা হবে, তাদের অনেকেই যুদ্ধের ময়দানের সন্ধানে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। শহীদুল্লাহ খান বাদল, আশফাকুস সামাদ, বদিউল আলম, মাসুদ ওমর-ঢাকা বিশ্ববিদালয়ের চার ছাত্র বেরিয়ে পড়ে যুদ্ধের সন্ধানে, তারা শুনতে পায় গাজিপুরে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্যরা লড়াই করছে পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে, সেখান থেকে তারা পিছু হটে ময়মনসিংহে যাবে, এটাই স্বাভাবিক, সুতরাং বাদল, আশফি, ওমর, বদি চার তরুণ কারফিউ তুলে নেওয়ার কয়েক ঘন্টার বিরতির মধ্যেই ঢাকা ছেড়ে ময়মনসিংহের পথে পা বাড়ায়। বাচ্চু, আসাদ এবং লক্ষাধিক ঢাকাবাসী ২৭শে মার্চে কারফিউ তুলে নেওয়ার ফাঁকে তাদের সংগৃহীত অস্ত্রশস্ত্রসহ বুড়িগঙ্গা পেরিয়ে আশ্রয় নেয় জিঞ্জিরায়। সেখানেই তারা প্রথম শুনতে পায় স্বাধীন বাংলা বিপবী বেতার কেন্দ্রের ঘোষণা, এম এ হান্নান, মেজর জিয়া, শমসের মবিন ও ক্যাপ্টেন ভুঁইয়ার কণ্ঠে স্বাধীনতার ঘোষণা, মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেই এখনও মনে করতে পারে, মেজর জিয়ার কণ্ঠস্বর তাদের অনুপ্রাণিত করেছিল খুবই, কারণ তারা আর্মি খুঁজছিল, বাঙালি আর্মি বিদ্রোহ করেছে শুনে তারা বুঝতে পেরেছিল যুদ্ধ সত্যই শুরু হয়ে গেছে। রেডিওর এ ঘোষণা ত্রিমোহনীতে শুনতে পায় শাহাদত চৌধুরী আর ফতেহ, যারা সেখানে গিয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রের খোঁজে, রেডিওতে কান পেতে এ ঘোষণা শুনে যেন জেগে ওঠে ত্রিমোহনী, উৎসব শুরু হয় সেখানে। ত্রিমোহনীতে তারা দেখা পায় রাজারবাগে যুদ্ধ করা চারজন পুলিশের। তাদের সমস্ত অস্তিত্ব তখন প্রতিরোধ আর প্রতিশোধের জন্যে উন্মুখ। তারাও খুঁজছে যুদ্ধক্ষেত্র। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দুই ট্রাক সৈন্য তারাবো পর্যন্ত এসে পড়লে সে খবর নিয়ে আসে ফতেহ চৌধুরী।
তবে যুদ্ধ ২৫শে মার্চ রাতেই শুরু হয়ে গিয়েছিল, রাজারবাগে পুলিশের প্রতিরোধে, পিলখানায় ইপিআরের নাছোড় সাহসিকতায়, নয়াবাজারের নাদির গুণ্ডার এলএমজির গুলিতে পাকিস্তানি সৈন্যদের ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া আর পিছু হটে যাওয়ার মধ্য দিয়ে, সারা দেশে বাঙালি সৈন্যদের বিদ্রোহ, আত্মত্যাগ আর প্রতিরোধে। গাজীপুরে ২য় বেঙ্গল, চট্টগ্রামে ৮ম বেঙ্গল, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৪র্থ বেঙ্গল বিদ্রোহ করে। লড়তে থাকে বীরের মতো। পাবনার ডিসি, মেহেরপুর কুষ্টিয়ার এসডিও, এসপি-এমনি করে অনেক জায়গায় বেসামরিক প্রশাসন আর জনগণ মিলেমিশে নিজ নিজ এলাকাকে দখল করে রেখে গড়ে তোলে প্রতিরোধ। রংপুর দিনাজপুরের মাটিও দখল করে রাখে সাধারণ মানুষ, বাঙালি সাঁওতাল, ওরাঁও আদিবাসী মিলেমিশে।
২৫শে মার্চ রাতে শুধু ঢাকায় নয়, সারাদেশে পাকিস্তানি মিলিটারি ব্যাপক গণহত্যা চালিয়ে তোপের মুখে চিরকালের জন্যে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল বাঙালির মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে। শুধু ২৫শে মার্চ রাতে নয়, ২রা এপ্রিল জিঞ্জিরায় যে গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল, তাকে এখনও বাচ্চু, আসাদ বা যে-কানো প্রত্যক্ষদর্শীর দোজখ দেখার দুঃসহ স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। প্রাণভয়ে ভীত আশ্রয়সন্ধানী প্রায় লাখখানেক ঢাকাবাসী আশ্রয় নিয়েছে বুড়িগঙ্গার ওপারে। তাদের কারো কারো কাছে দেশি অস্ত্র। একটা-দুটো বন্দুক। পুলিশ কিংবা ইপিআরের ফেলে যাওয়া থ্রি নট থ্রি। ভোরবেলা হঠাৎ পাকিস্তানি আর্মি লঞ্চ আর স্টিমারযোগে চলে আসে নদীর এপারে, অতর্কিতে, বাচ্চুরা টের পেয়ে পেছাতে পেছাতে সৈয়দপুরে সরে আসে, আর পেছনে তাকিয়ে দেখতে পায় আকাশে হেলিকপ্টার জেট উড়ছে, হাজার হাজার মানুষ পালাচ্ছে দিগ্বিদিক, আর আর্মিরা কী একটা পাউডার নাকি পাইপ দিয়ে ফুয়েল ছিটিয়ে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে, মানুষ পুড়ে যাচ্ছে আর ছুটে যাচ্ছে, ছুটন্ত মানুষ পুড়ছে, পুড়ন্ত মানুষ ছুটছে, ছুটন্ত মানুষ ফুটন্ত, জ্বলন্ত, হাজার হাজার ছুটন্ত অগ্নিকুণ্ড, আর চিৎকার, পুরোটা জনপদ পুড়ছে, আর গুলি, রিকোয়েললেস রাইফেল থেকে, আর হেলিকপটার জেট থেকে, ছুটন্ত মানুষ পড়ে যাচ্ছে, ধরাশায়ী হচ্ছে, হাজার হাজার মানুষ পড়ে গেল, মরে গেল, মরে গেল তো বেঁচে গেল, অন্তত ১০ হাজার মানুষ সেদিন মারা পড়েছে জিঞ্জিরায়-এই বিবরণ আজাদ জানতে পারবে, আর তার মনে হবে ট্রুম্যানের কথা, হ্যারি এস ট্রুম্যানের আত্মজীবনীর একটা বই তাকে পড়তে হয়েছে এমএ ক্লাসের জন্য, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ক্লাসে, ইয়ার অব ডিসিশনস, হিরোশিমায় যখন অ্যাটম বোমা ফেলা হয় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তখন বাইরে লাঞ্চ করছিলেন, বোমা ফেলার পরে তাকে জানানো হয় নিউক্লিয়ার

টেস্টের চেয়েও এবার ধ্বংস হয়েছে অনেক বেশি, ট্রুম্যান বলেছিলেন, ইতিহাসের সবচেয়ে বড় জিনিস হলো এটা। চলো, বাড়ি যাই। এই বোমা ২০ হাজার টন টিএনটির সমান শক্তিশালী। ও ধিং মৎবধঃষু সড়াবফ... ও ংধরফ ঃড় ঃযব ংধরষড়ৎং ধৎড়ঁহফ সব, ঃযরং রং ঃযব মৎবধঃবংঃ ঃযরহম রহ ঃযব যরংঃড়ৎু. ওঃং ঃরসব ভড়ৎ ঁং ঃড় মবঃ যড়সব. (আজাদের নিজের হাতের ৩.৪.৭০ তারিখে স্বাক্ষর করা এই বইটা রয়ে গেছে জায়েদের সংগ্রহে)। জিঞ্জিরার দিকে পালাতে গিয়েই সঙ্গীতজ্ঞ বারীণ মজুমদার আর ইলা মজুমদারের আঙুল থেকে এক সময় খুলে যায় তাদের বছর সাতেক বয়সী মেয়ে মধুমিতার হাতের মুঠো, তারা তাকে ডাকতেন মিতু বলে, তারপর মিতু মিতু বলে ইলা মজুমদার কত ডাকলেন, বারীণ মজুমদার কত ডাকলেন, তাদের ছোট ছেলে পার্থ কত ডাকল, মিতু আর ফিরে এল না। যে যায় সে আর ফিরে আসে না, কিন্তু মায়েরা প্রতীক্ষায় থাকে, তাদের প্রতীক্ষা দেশ স্বাধীন হওয়ার ১৪ বছর পরেও ফুরায় না।

৩৫

যুদ্ধের খোঁজে ঢাকার ছাত্ররা বেরিয়ে পড়ে অনেকেই, যেমন বাচ্চু পায়ে হেঁটে চলে যায় দাউদকান্দি হয়ে কুমিলা; সেখান থেকে শুনতে পায় যুদ্ধ হচ্ছে মিরেরসরাইয়ে, তারপর পায়ে হেঁটে চলে যায় চট্টগ্রাম, সেখান থেকে ফিরে আসে ঢাকায়, তারপর পেয়ে যায় ২ নম্বর সেক্টর থেকে পাঠানো বার্তা, খালেদ মোশাররফ গেরিলা অপারেশনের জন্যে ঢাকার ছাত্রদের চান, গোপনে ঢাকা ত্যাগ করে সীমান্তের ওপারে মেলাঘর যেতে থাকে ছাত্ররা। জুনের প্রথম সপ্তাহে মেজর খালেদ মতিনগর থেকে মাইল দশেক দূরে মেলাঘরে একটু ঘন জঙ্গলের মধ্যে স্থাপন করেন এই নতুন ক্যাম্প। তারও আগে অবশ্য ক্যাম্প হয়েছিল বক্সনগর। সেখান থেকে মতিনগর। সেখানে যোগ দেয় মানিক, ওমর, মাহবুব, আসাদ। বাস্কেটবল খেলোয়াড় কাজী কামাল মতলবে মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়ার বাড়ি হয়ে পৌঁছে যায় মতিনগর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে, ছয়-সাত জনের একটা দলের সদস্য হিসেবে। শহীদুলাহ খান বাদল, আশফাকুস সামাদ, মাসুদ ওমর এর আগেই পৌঁছে গেছে। পৌঁছে যায় শাহাদত চৌধুরী, যুদ্ধদিনে যাকে ডাকা হবে শাচৌ বলে। শাচৌ মেজর খালেদ মোশাররফের প্রিয় তরুণে পরিণত হবেন, আর শহীদুলাহ খান বাদল কাজ করে যাবে সেক্টর টু-র হেডকোয়ার্টার মতিনগরের গুরুত্বপূর্ণ এক স্টাফ হিসেবে, যতক্ষণ না তাকে যুদ্ধের শেষের দিকে এসে বাম সন্দেহে সরিয়ে নেওয়া হবে কলকাতায়।

প্রতিটা তরুণের নিজের ঘরদোর মা-বাবা ছেড়ে যুদ্ধে যাওয়ার আছে একেকটা স্মরণীয় গল্প।

বদিউল আলম ঢাকায় এক সময় বিখ্যাত বা কুখ্যাত ছিল এনএসএফ-এর নেতা হিসাবে। কিশোরগঞ্জের ছেলে বদি ছাত্র হিসাবে ছিল দারুণ মেধাবী। লম্বা, একটু ময়লাটে গায়ের রঙ। '৭১ সালে ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ থেকে সে ১৯৬৪ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় মানবিক বিভাগে মেধা তালিকায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেছিল। এই উজ্জ্বল পটভূমি নিয়েও বদি যে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার সমর্থক ও পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খানের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা এনএসএফে যোগ দিয়েছিল, তার কারণ খুব একটা রাজনৈতিক নয়। এদের যোগ দেওয়ার কথা ছিল ছাত্র ইউনিয়নেই, কিন্তু কী একটা কথা কাটাকাটি থেকে ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের কয়েক বন্ধু এনএসএফে ঢুকে পড়ে। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা থাকায় ক্যাম্পাসে তারা চলাফেরা করত দাপটের সঙ্গে। এই সময় জিন্নাহ হলের এনএসএফ নেতা বদি-সালেকের নাম উচ্চারিত হতো একই নিঃশ্বাসে, মধ্যখানে একটা উহ্য হাইফেনসমেত এবং ভয়ের সঙ্গেই। সৈয়দ আশরাফুল হকের মনে পড়ে, ক্রিকেটার হিসেবে আশরাফুলকে বদি একটু প্রশ্রয়ের চোখে দেখত, ক্যাম্পাসে দেখা হলে জিজ্ঞেস করত, 'কী আশরাফুল, কেমন আছ', এতেই আশরাফুল শাঘা অনুভব করত, 'দেখছস, কত বড় গুণ্ডা আমার খোঁজখবর নিতাছে।'

অন্যদিকে শহীদুলাহ খান বাদল ছিল এসএসসি আর এইচএসসি দু পরীক্ষাতেই প্রথম স্থান অধিকারকারী এক অবিশ্বাস্য তরুণ। সে যুক্ত ছিল বামপন্থী চিন্তা আর আদর্শের সঙ্গে। বদির সঙ্গে তার গোলযোগ ছিল প্রকাশ্য। অর্থনীতি বিভাগের নির্বাচনের সময় ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে এনএসএফের গণ্ডগোল বাধলে বাদল আর বদির দূরত্বও প্রায় শত্রুতায় পরিণত হয়। এর পরে ছাত্র ইউনিয়নের ছেলেরাও শরীরচর্চা ইত্যাদির দিকে মন দেয়। একদিন জিমন্যাসিয়ামে বাদলরা ব্যায়াম করছে, তারা পড়ে যায় বদি ও তার দলের সামনে, বদিরা ধাওয়া দেয় বাদলদের।

'৬৯-এর গণআন্দোলনের সময় থেকে বদিউল আলমরা এনএসএফে নিষ্ক্রিয় হতে থাকে। ডাকসুর জিএস নাজিম কামরান চৌধুরী এনএসএফের পক্ষ থেকে নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও গণআন্দোলন সমর্থন করেন এবং এরপর থেকে ছাত্রসমাজের স্বাধিকার তথা স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করতে থাকেন। বদিউল আলমরাও মনেপ্রাণে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সমর্থক হয়ে ওঠে।

২৫শে মার্চের গণহত্যাযজ্ঞ শুরুর পর ২৭শে মার্চ কারফিউ তুলে নেওয়া হলে বদি তার বন্ধু তৌহিদ সামাদকে নিয়ে হাজির হয় ধানমন্ডি ৫ নম্বরে শহীদুলাহ খান বাদলের ডেরায়। তৌহিদ সামাদের বাসা ছিল ৪ নম্বরে। বদিকে দেখে শহীদুলাহ খান বাদলের মনে নীরব প্রশ্ন জাগে : এই এনএসএফের গুণ্ডাটাকে কেন নিয়ে এসেছে তৌহিদ?

বদিউল বলে বাদলকে, 'লিসেন। ইউ কমিউনিস্ট। হয়্যার আর দি আর্মস। লেট্স গো অ্যান্ড ফাইট। নিশ্চয় যুদ্ধ হচ্ছে, নিশ্চয় আর্মস পাওয়া যাবে। চলো। যুদ্ধ করব।'

কিন্তু শহীদুলাহ খান বাদলের চোখমুখ থেকে বদিউল আলমের ব্যাপারে সন্দেহ দূরীভূত হয় না। বদিকে এড়িয়ে যায় বাদল। সে যায় মাসুদ ওমরের বাসায়, সঙ্গে আশফাকুস সামাদ, কী করা যায় এই নিয়ে আলোচনা করে তারা। সেখানে আবার এসে হাজির হয় বদি। অবাক হওয়া বাদলের মুখের দিকে তাকিয়ে বদি সন্দেহরেখা পড়ে ফেলে অন্ত র্যামীর মতো। তারপর সে তার পকেটে হাত দেয়। বের করে একটা ব্লেড। একটানে বদি নিজের হাত কেটে ফেলে খানিকটা। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোয় তার হাত থেকে। তারপর সে বাদলের হাত টেনে নিয়ে সামান্য কাটে। বাদলের কাটা জায়গা থেকে রক্ত বেরিয়ে এলে বদি নিজের রক্ত মিশিয়ে দেয় বাদলের রক্তের সঙ্গে। বলে, 'ফ্রম টুডে উই আর ব্লাড ব্রাদারস।'

শহীদুলাহ খান বাদল, মুক্তিযুদ্ধের ১৪ বছর পরেও, আজাদের মাকে দাফন করে ফিরে আসবার পরের দিনগুলোয়, সেইসব কথা মনে করে স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েন। তাঁর মনে পড়ে, এর পরে তার এতদিনকার প্রতিপক্ষ বদিউল আলমের সঙ্গে একই মোটরসাইকেলে চড়ে তারা ওই ২৭শে মার্চেই পুরোটা শহর প্রথমে চক্কর মারে। প্রত্যক্ষ করে শহরজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আগুন, ধোঁয়া, রক্ত, লাশের স্তূপ-পাকিস্তানিদের ভয়াবহ নৃশংসতার সাক্ষ্যগুলো। তারা যুদ্ধের সন্ধানে যায় মেজর খালেদ মোশাররফের শ্বশুরবাড়িতে, বাদলদের আত্মীয় হন এই মেজর। দূর থেকেই দেখতে পায় ইতিমধ্যে এ বাড়িতে হামলা চালিয়েছে পাকিস্তানি সৈন্যরা। সেখানে উপায়ান্তর করতে না পেরে বদি প্রস্তাব দেয় কিশোরগঞ্জের দিকে যাত্রার। একটা অনুমান হলো, ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহী বাঙালি সৈন্যদের পাওয়া যেতে পারে কিশোরগঞ্জে। বাদলের একটা আশা ছিল, কমিউনিস্টদের কতগুলো মুক্তাঞ্চল থাকে, সিলেটে এ রকম একটা মুক্তাঞ্চল আছে সুনীলদার। ওখানে পৌঁছা গেলে একটা উপায় হবেই।

বন্ধু তৌহিদ সামাদের কাছ থেকে টাকা ধার নেয় তারা, ৩০০ বা ৪০০ টাকা, তারপর কিশোরগঞ্জের উদ্দেশে ঢাকা ছাড়ে তারা চারজন-বদি, বাদল, আশফাকুস সামাদ আশফি আর মাসুদ ওমর।

যুদ্ধে কাজী কামালের যাওয়ার কথা ফতেহ চৌধুরীর সঙ্গে। নির্দিষ্ট দিন নির্দিষ্ট সময়ে একটু দেরি করে ফতেহ চৌধুরীর বাসায় পৌঁছায় কাজী কামাল। ফতেহ নয়, দেখা পায় তার ভাই শাহাদত চৌধুরীর। শাহাদত বলে, 'তুমি দেরি করে ফেলেছ। ওরা তো তোমার জন্যে ওয়েট করতে করতে শেষে চলে গেল। এখনও সদরঘাট যাও। দেখা পেতেও পারো। মতলবের লঞ্চে খোঁজো।'

কাজী কামাল বেরিয়ে যায় ঝড়ের বেগে। সদরঘাটে গিয়ে ঠিকই ধরা পায় সে ফতেহদের। ফতেহ তাকে বলে, 'আসছ, ভালো করছ। কিন্তু প্রত্যেকের ১৭০ টাকা লাগবে পথের খরচ আর হাতখরচ হিসাবে। তোমার টাকা আনছ!' কাজী কামালের মুখ শুকিয়ে যায়। সে তো টাকা আনেনি। যুদ্ধে যেতে যে টাকা লাগে, তা সে জানবে কী করে! 'আমি আইতাছি' বলে সে লঞ্চ থেকে নেমে যায়।

ফতেহ চিন্তায় পড়ে যায়। কাজী কি আবার টাকা জোগাড় করতে বাসায় ফিরে গেল নাকি? লঞ্চ যদি ছেড়ে দেয়? তাহলে তো তাদের কাজীকে ছেড়েই চলে যেতে হবে।

কাজী কামাল কিন্তু লঞ্চে ফিরে আসে মিনিট দশেকের মধ্যেই। তার হাতে তখন টাকা। সে টাকাটা ফতেহর হাতে তুলে দেয়। ফতে বিস্মিত। 'টাকা পেলে কই?' কাজী কামাল তার বাঁ হাতের কব্জি দেখায়। সেখানে ঘড়ির বেল্ট পরার শাদা দাগটা রয়ে গেছে, কিন্তু ঘড়িটা নাই। 'বুঝলা না, ফুটপাতে নাইমা ঘড়িটা বেইচা দিয়া আইলাম।' তার মুখে বিজয়ীর হাসি।

রুমী তার মা জাহানারা ইমামকে বলে, 'মা, আমি যুদ্ধে যাব।' জাহানারা ইমাম মুশকিলে পড়েন। তার ছেলের কী-বা এমন বয়স। কেবল আইএসসি পাস করে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে। আবার আমেরিকার ইলিনয় ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতেও সে ভর্তি হয়ে গেছে। ৫ মাস পরে ওখানে তার ক্লাস শুরু হবে। কদিন পরই তার আমেরিকার উদ্দেশে ফ্লাই করার কথা, সে কিনা বলছে যুদ্ধে যাবে। জাহানারা ইমামের মাতৃহৃদয় বলে, না, রুমী যুদ্ধে যাবে না। সে আমেরিকা যাবে পড়তে, নিরাপদে থাকতে, দেশে ফিরে এসে স্বাধীন দেশের সেবা করবে। অন্যদিকে তাঁর সচেতন দেশপ্রেমিক স্বার্থত্যাগী হৃদয় বলছে, এ শুধুই স্বার্থপরের মতো কথা। দেশের জন্যে দেশের ছেলে তো যুদ্ধে যাবেই। তুমি কেন তাকে আটকে রাখতে চাও। মা বলে? আর ছেলেরা মায়ের ছেলে নয়! তখন, জাহানারা ইমামের মনে হয়, অন্য ছেলেদের মতো যদি রুমী বিছানায় কোলবালিশ শুইয়ে রেখে চুপিসারে চলে যেত, তাঁকে আর এই যন্ত্রণা সহ্য করতে হতো না। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই তিনি ছেলেকে শিখিয়েছেন, মাকে লুকিয়ে কোনো কিছু করতে যেও না। যা করতে চাও, মাকে জানিয়ে কোরো। এখন? রুমী

বিতর্কে চ্যাম্পিয়ন, সে যুদ্ধে যাওয়ার সপক্ষে যুক্তি দেয়, সে যুক্তির তোড়ে হেরে যান মা, শেষে বলেন, 'যা, তোকে দেশের জন্যে কুরবানি করে দিলাম। যা তুই যুদ্ধে যা।'
মুক্তিযোদ্ধারা জানে, পরে বহুদিন রুমীর মা জাহানারা ইমাম তার এই উক্তির জন্য আফসোস করেছেন, অবোধ মাতৃহৃদয় বারবার দগ্ধ হয়েছে অনুশোচনায়, কেন তিনি কুরবানি কথাটা বলতে গেলেন, আলাহ বুঝি তার কুরবানি কথাটাই কবুল করে নিয়েছিলেন।

আর হাবিবুল আলমের মনে পড়ে যায় যে পাশবালিশ বিছানায় শুইয়ে রেখে এক ভোরে তিনিও পালিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের অজানা প্রান্তর আর অনিশ্চিত জীবনের উদ্দেশে।
এপ্রিলের ৭ বা ৮ তারিখ। আহমেদ জিয়া, আলমদেরই এক বন্ধু, আলমদের ইস্কাটনের বাসায় আসে। বলে, 'দোস্ত, একটু রাজশাহী হাউসে আসতে পারবি?'
'ক্যান রে?'
'আছে, ঘটনা আছে।' জিয়া কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলে, 'মেজর খালেদ মোশাররফ ডাকছে।'
'কই?'
'ফ্রন্টে। উনি তো ওনার ফোর বেঙ্গল নিয়া ২৭শে মার্চেই রিভোল্ট করছে। মুক্তিবাহিনীতে উনি ঢাকার ছাত্র চান। তুই যাবি কি যাবি না, এটা আলোচনা করব। আরো দুই-একজন আসবে। তুই আয়। তুই তো স্কাউট।'
হাবিবুল আলম বলে, 'মেজর খালেদ মোশাররফের নাম তো শুনি নাই। মেজর জিয়াউর রহমানের ঘোষণাটা শুনছি রেডিওতে। ওনার ঘোষণা শুনেই বুঝছি বাঙালি সৈন্যরা যুদ্ধ করতেছে। আমাদেরকেও যেতে হবে।'
'আয় বিকালে রাজশাহী হাউসে। চিনেছিস তো, রমনা থানার কাছে।'
'চিনি। লিচ্যাংয়ের বাসা তো?'
বিকালবেলা রাজশাহী হাউসে মিটিং। হাবিবুল আলমের অস্থির লাগে। সে কল্পনায় নিজেকে দেখতে পায় যুদ্ধের ময়দানে। কিন্তু কে এই মেজর খালেদ মোশাররফ? তাকে সে চেনে না। তার নাম শোনেনি। কিন্তু মেজর জিয়াউর রহমানের ঘোষণাটা তার কানে বাজছে।
বিকালবেলা হাবিব হাজির হয় রাজশাহী হাউসে। তারা ছাদে ওঠে। কাইয়ুম, জিয়া, লিচ্যাং আর হাবিব। লিচ্যাং-ও তাদের কমন বন্ধু। তার ভালো নাম ইরতিজা রেজা চৌধুরী। সে একটু শারীরিকভাবে আনফিট। সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বয়স কুড়ির কোঠায়। কেউ হয়তো ২১, কেউ ২২। চৈত্র মাস শেষ হয়ে আসছে। আজকের বিকালটা বেশ গুমোট। সবাই ঘামছে। তবে হঠাৎ করেই হাওয়া বইতে শুরু করে। বসন্তের বিখ্যাত বাতাস। কপালের ঘামে বুলিয়ে দেয় শীতল পরশ। তাদের আরাম লাগে।
জিয়া মুখ খোলে-'আমি মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর টু থেকে আসতেছি। ওখানে আমি ট্রেনিং নিচ্ছি। আমাকে পাঠাইছেন ক্যাপ্টেন হায়দার। আমার সাথে আসছে আশফি। আশফাকুস সামাদ। খালেদ ফোর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে রেগুলার আর্মি গঠন করছেন। তার সাথে যোগ দিছেন বর্ডারের ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্স। ঢাকা থাকবে খালেদ মোশাররফের আওতায়। এখন ঢাকার ছেলে দরকার। মেজর খালেদ মোশাররফ ক্যাপ্টেন হায়দারকে বলছেন, ঢাকায় ছাত্র পাঠাও। ঢাকা থেকে আরো আরো ছাত্রকে নিয়া আসো। আসলে ওনারা চাইছেন ঢাকায় গেরিলা অপারেশন শুরু করতে। যত তাড়াতাড়ি পারা যায়। এ জন্য ঢাকার ছাত্র দরকার। ক্যাপ্টেন হায়দারকে একবার দেখলেই তোদের পছন্দ হবে। যুদ্ধের শুরুতেই সিলেটে ক্যাপ্টেন হায়দারের হাতে গুলি লাগে। তার বাম হাতে পাস্টার আছে। সেই জন্য উনি ফ্রন্টে যেতে পারতেছেন না। হেডকোয়ার্টারে থেকে যুদ্ধের পরিকল্পনা করতেছেন। এখন বল তোরা, যাবি কি -না।'
অবশ্যই যেতে হবে। আলম ভাবে। না যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাওয়ার তার শ্রেষ্ঠ সময়। লিচ্যাং বলে, 'আমার কী হবে? আমিও তো যেতে চাই।'
হঠাৎ নীরবতা নেমে আসে ওই আড্ডায়। লিচ্যাং যেতে চায়। কিন্তু ও তো খানিকটা শারীরিক প্রতিবন্ধী। ওকে নেওয়া তো ঠিক হবে না।
জিয়াই নীরবতা ভঙ্গ করে। বলে, 'লিচ্যাং তুই ঢাকাতেই থাক। এখন যুদ্ধ মানে তো শুধু বন্দুক দিয়ে গুলি ছোড়া নয়। আরো নানাভাবে যুদ্ধ করা যায়। ঢাকায় যখন ফ্রিডম ফাইটাররা ঢুকবে, তুই তাদেরকে আশ্রয় দিবি। খবর দিবি। এই যে তোর বাসায় আজকে মিটিং হচ্ছে, এটাও তো মুক্তিযুদ্ধেই অংশ নেওয়া।'
পরদিন হাবিবুল আলমের বাসায় মুক্তিযোদ্ধা আহমেদ জিয়া আসে। কীভাবে তারা পাড়ি দেবে সীমান্ত, এ বিষয়ে শলা করতে। সঙ্গে আসে যমজ ভাই মুনির ও মিজান। ঠিক হয়, আলম খবর দেবে কাইয়ুমকে, কাইয়ুম শ্যামলকে, জিয়া নিজেই খবর দেবে মুনীর চৌধুরীর ছেলে ভাষণকে, আর তারা যাত্রা শুরু করবে পরদিন সকাল ৭টা থেকে সাড়ে ৭টার মধ্যে হরদেও গাস ফ্যাক্টরির কাছের পেট্রলপাম্প থেকে।
আগামীকাল যাত্রা। হাবিব আলম রাত্রিবেলা দু চোখের পাতাই এক করতে পারে না। তার বাসা থেকে সে বিদায় নেবে কী করে? আব্বা-আম্মাকে বলে বিদায় নেওয়ারপ্রশ্নই আসে না। সে হলো বাড়ির একমাত্র ছেলে। আর তার বোন আছে চারটা। বড়বোনের

বিয়ে হয়ে গেছে, তিনি থাকেন তিন সন্তানসহ খুলনায়, স্বামী পাকিস্তান নেভির অফিসার। এ বাসায় থাকে তিন বোন। তাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে বাসা থেকে বের হওয়াও মুশকিল। তার ওপর হাবিবুল আলম থাকে বাসার দোতলায়। কাঠের খাড়া সিঁড়ি দোতলা থেকে সোজা নেমে গেছে নিচতলার যে জায়গাটায়, সেখানে সারাক্ষণই কেউ না কেউ বসে থাকে, আসা-যাওয়া করে, কাজ করে।

হাবিব একটা ছোট্ট পিআইএ মার্কা ব্যাগ গুছিয়ে নিয়েছে। এটা সে ব্যবহার করেছিল স্কাউটের প্রতিনিধি হিসাবে গত ডিসেম্বরে তার অস্ট্রেলিয়া সফরের সময়।

ভোরের আজান হচ্ছে। হাবিবুল আলম বিছানা ছাড়ে। মশারি টানানোই থাকুক। সে পাশবালিশটাকে শুইয়ে দেয় বিছানায়। ঢেকে দেয় একটা চাদর দিয়ে। তারপর একটা চিঠি লেখে বাসার সবার উদ্দেশে। 'আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে যাচ্ছি। আমার জন্যে চিন্তা কোরো না। দোয়া কোরো।' চিঠিটা পড়ার টেবিলে রেখে একটা বই দিয়ে চাপা দেয় সে। তারপর কাঁধে ব্যাগটা ফেলে আস্তে করে দরজাটা বন্ধ করে বাইরে বারান্দায় আসে। একটা টিনের চালা পার হতে হবে। তারপর কাঠের ফ্রেম। সেখান থেকে একটা লাফ দিয়ে নিচতলায় নামা যাবে। তাহলেই কেবল সিঁড়িটা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব। একটা একটা করে পা বিড়ালের মতো সতর্কতায় ফেলে সে কার্নিশে চলে আসে। তারপর দোতলার মেঝেসমান উচ্চতা থেকে একটা লাফ দিয়ে এসে পড়ে দিলু রোডের সরু-গলিতে। মাটিতে পড়ে যায় সে, ওঠে, তারপর হাত ঝেড়ে রওনা হয় অজানার উদ্দেশে।

সীমান্ত পেরিয়ে তারা এসে পৌঁছায় মতিনগরে। সেক্টর টুর হেডকোয়ার্টারে। সেখান থেকে তাদের পাঠানো হয় কাঁঠালিয়া মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ শিবিরে। তারা যোগ দেয় ২ নম্বর পাটুনে। তার মানে এরই মধ্যে ১ নম্বর পাটুন গড়ে উঠেছে, যারা আগে এসেছে তারা তাতে যোগ দিয়েছে। ১ নম্বর পাটুনের কমান্ডার হলেন আজিজ। ছাত্রলীগের ঢাকা কলেজের ভিপি। ২ নম্বর পাটুনের কমান্ডার হয় জিয়া।

জিয়াসহ হাবিব আলমেরা সেকেন্ড পাটুনের সবুজ রঙের তাঁবুতে ঢোকে। দেখতে পায় আরো ৭/৮ জন সেখানে আছে। অর্থাৎ সব মিলে দাঁড়াল ১২/১৩ জন। তাঁবুর এক পাশের ঢাকনা খুলে রাখা হয়েছে। তবু তাঁবুর ভেতরটা গরম।

একদিন পরে, ২ নম্বর পাটুনের ছাত্রযোদ্ধাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন তখনকার কিংবদন্তি সেক্টর টু-র প্রধান মেজর খালেদ মোশাররফ। সঙ্গে আসেন ক্যাপ্টেন হায়দার, শহীদুলাহ খান বাদল প্রমুখ। খালেদ মোশাররফ লম্বা, ফরসা, তার পরনে নীল রঙের ট্রাউজার, গায়ে হলদে রঙের ফুলহাতা শার্ট, কোমরে পিস্তল। ছাত্রযোদ্ধাদের সামনে তিনি দেন এক সম্মোহনী ভাষণ। তিনি বলেন, 'পাকিস্তানি হানাদার শাসকদের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করব তিনভাবে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আর সামরিক ক্ষেত্রে। এ লড়াইয়ে ছাত্রদের ভূমিকা হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তোমাদের দিয়েই চলবে আমাদের গেরিলা ওয়ারফেয়ার অব সেক্টর টু। তোমরা যারা এসেছ, তারা মনে রেখো, একবার শুরু করলে ফিরে যাওয়ার কোনো পথ নেই, এখনও চলে যেতে পারো, পরে আর পারবে না, হয় জিততে হবে, নয়তো মরতে হবে। তবে মনে রেখো, স্বাধীন দেশের সরকার জীবিত গেরিলাদের চায় না, নো গভর্নমেনট ওয়ান্টস অ্যান অ্যালাইভ গেরিলা, নিতে পারে না, দেশ স্বাধীন হলে তোমাদের কী হবে আমি বলতে পারব না, তবে যদি তোমরা আত্মত্যাগ করো, যদি শহীদ হও, তাহলে সেটা হবে তোমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্যবহার, এই মৃত্যু হবে বীরের মৃত্যু, দেশের জন্য মৃত্যু, মাতৃভূমির জন্যে মৃত্যু, মায়ের জন্যে মৃত্যু।'

শাহাদত চৌধুরী ওরফে শাচৌকে যে মেজর খালেদ তাঁর কাছে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন, তার একটা কারণ ছিল। সেটা হলো শাচৌয়ের সঙ্গে ঢাকার বুদ্ধিজীবী মহলের স্বাভাবিক যোগাযোগ। শাচৌ, দেখা যাচ্ছে, ঢাকা গেলে সঙ্গে করে আনেন আলতাফ মাহমুদের সুর করা নতুন গান, আরো পরমাশ্চর্য, তিনি একবার সঙ্গে করে আনলেন দুটি কবিতা। সেই কবির নাম বলা বারণ, কিন্তু খালেদ মোশাররফকে বলতে তো মানা নাই। শামসুর রাহমান। শামসুর রাহমান রয়ে গেছেন অবরুদ্ধ বাংলাদেশে, কিন্তু গোপনে লিখে শাচৌয়ের হাতে পাঠিয়েছেন একজোড়া আশ্চর্য কবিতা। গোপনে সেই কবিতা বয়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে মেলাঘরের ক্যাম্পে খালেদের হাতে পৌঁছে দিলেন শাচৌ। সুলতানা কামাল পড়ে শোনাল কবিতা দুটো, খালেদসহ মুক্তিযোদ্ধাদের।

স্বাধীনতা তুমি
রবিঠাকুরের অজর কবিতা অবিনাশী গান
স্বাধীনতা তুমি কাজী নজরুল, ঝাঁকড়া চুলের বাবড়ি দোলানো
মহান পুরুষ সৃষ্টিসুখের উল্লাসে কাঁপা—

আর

তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা
তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতকাল ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়?
আর কতকাল দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন?

তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা
সকিনা বিবির কপাল ভাঙল
সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর।

কবিতা দুটো শুনে পুরো ক্যাম্প উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এর পরে শাচৌ আর আলম অবসর পেলে যেতেন কবি শামসুর রাহমানের বাড়ি। কবিও খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করতেন গেরিলাদের। এই গেরিলাদের দেখেই শামসুর রাহমান লেখেন তাঁর আরেকটা অসাধারণ কবিতা-গেরিলা। ওই কবিতাটা মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে নিয়ে গিয়েছিলেন শাচৌ, যখন পড়ে শোনানো হলো, আবেগে চোখ ভিজে এসেছিল অনেকেরই।

দেখতে কেমন তুমি? কী রকম পোশাক আশাক
পরে করো চলাফেরা? মাথায় আছে কি জটাজাল?
পেছনে দেখতে পারো জ্যোতিশ্চক্র সন্তের মতন?
টুপিতে পালক গুঁজে অথবা জবরজং ঢোলা
পাজামা কামিজ গায়ে মগডালে একা শিস দাও
পাখির মতন কিংবা চাখানায় বসো ছায়াচ্ছন্ন।
দেখতে কেমন তুমি?-অনেকেই প্রশ্ন করে, খোঁজে
কুলুজি তোমার আঁতিপাঁতি। তোমার সন্ধানে ঘোরে
ঝানু গুপ্তচর, সৈন্য, পাড়ায় পাড়ায়। তন্ন তন্ন
করে খোঁজে প্রতিঘর। পারলে নীলিমা চিরে বের
করত তোমাকে ওরা, দিত ডুব গহন পাতালে।

তুমি আর ভবিষ্যৎ যাচ্ছ হাত ধরে পরস্পর।

সর্বত্র তোমার পদধ্বনি শুনি, দুঃখ-তাড়ানিয়া;
তুমি তো আমার ভাই, হে নতুন, সন্তান আমার।

শাহাদত চৌধুরী আজ যুদ্ধের ১৪ বছর পরেও স্মরণ করতে পারেন, ভাই আর সন্তান বলে সম্বোধন করার এই শেষ পঙ্‌ক্তিটা তাদের শরীরে কী রকম বিদ্যুৎ খেলিয়ে দিয়েছিল।

ট্রেনিং শেষে হাবিবুল আলমের প্রথম ঢাকা আগমন আর ঢাকায় প্রথম অপারেশন ছিল মেজর নূরুল ইসলাম শিশুর স্ত্রী আর দু কন্যাকে ঢাকা থেকে মতিনগর নিয়ে যাওয়া। এ জন্যে নুরুল ইসলাম পুরস্কার হিসেবে হাবিবুল আলমকে দিতে চেয়েছেন একটা চায়নিজ এসএমজি আর কাজী কামালকে একটা চায়নিজ পিস্তল। এর আগে কাজী কামাল কাইয়ুমকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকায় এসে মেজর শাফায়াত জামিলের স্ত্রী ও দু পুত্রকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার সাফল্য দেখিয়েছে। এবার মেজর নুরুল ইসলাম শিশুর পরিবারকে নিতে কাজী কামালের ডাক পড়লে হাবিবও তার সঙ্গে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করে, কারণ হাবিব শিশুর বাসাটা আগে থেকেই চেনে। আর কাজী কামালকে হাবিবুল আলম আগে থেকেই চেনে বাস্কেটবল খেলোয়াড় হিসাবে, তাকে ডাকে কাজী ভাই বলে, হাবিবুল আলম নিজেও ফার্স্ট ডিভিশন লিগে হকি খেলে থাকে।
এই পিস্তলটা কাজী জিতে নিতে সক্ষম হয়, হাবিবও জিতে নেয় এসএমজিটা, মেজর নুরুল ইসলামের পরিবারকে তারা সীমান্তের ওপারে সঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে পারে সাফল্যের সঙ্গে। এই পিস্তলটার কথা ঢাকার মুক্তিযোদ্ধাদের বিশেষভাবে মনে পড়ে যায় এ জন্য যে, জুয়েলের খুব লোভ ছিল পিস্তলটার ওপর। আজাদদের বাসা থেকে ধরা পড়ার দিনও জুয়েল তার পাশে এই পিস্তলটা রেখেছিল। ওখান থেকেই কাজী কামাল পিস্তলটাকে হারায় আর হারায় আজাদকে, জুয়েলকে, বাশারকে।

৩৬

আজাদ যুদ্ধে যাওয়ার পরে, তার মাকে একাধিকবার বলেছিল, এটা তার খালাতো ভাইবোনদের মনে আছে এখনও যে আজাদ বলছে, 'মা, আমি কিন্তু রাজনীতি করি না, পলিটিক্স করতে আমি যুদ্ধে যাই নাই, আমি যুদ্ধে গেছি বাঙালির উপরে পাকিস্তানিদের অত্যাচার মানতে পারছি না বলে, রাজারবাগের পুলিশ ব্যারাকে ওরা যা করছে...।
২৫শে মার্চ রাতে রাজারবাগে কী ঘটেছিল, সেটা আজাদ আর বাশার কিছুটা নিজের চোখে দেখেছিল। আর এপ্রিল মে মাসে কী ঘটছে সেখানে, তার বিবরণ তারা পেয়েছিল এক পুলিশ সুবেদারের কাছ থেকে। এই পুলিশ সুবেদারের বাড়ি ছিল মাওয়ায়। আজাদরা তাকে ডাকত খলিল মামা বলে।
মা তাঁর কথা মাঝে মধ্যেই স্মরণ করতেন, 'খলিলটা যে আর আসে না। বেঁচে আছে, নাকি মারা গেছে কে জানে? আজাদ, একটু খোঁজ নিস তো। খলিল বেঁচে আছে নাকি?'

এপ্রিলের মাঝামাঝি পুলিশের সুবেদার খলিল একদিন আসেন আজাদদের বাসায়।
মা বলেন, 'আলাহ মালিক। তুমি বেঁচে আছ খলিল।'
'জি বুবু। হায়াত আছে। আপনাদের দোয়ায় বাঁইচা আছি।'
আজাদের সঙ্গেও তাঁর দেখা হয়। মা তাঁর জন্যে চাল চড়িয়ে দেন চুলায়।
মা বলেন, 'তোমার কোনো খবর পাই না। বড় দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। চারদিক থেকে কত দুঃসংবাদ আসছে।'
খলিল বলেন, "বুবু, কী দেখলাম এই জীবনে। দোজখ দেখা হইয়া গেছে। মার্চ মাসের ২৯ তারিখে কোতোয়ালি থানায় পোস্টিং হইল। আমরা আটজন। থানায় গিয়া দেখি, কী কবো বুবু, দেওয়ালে, মেঝেতে চাপ চাপ রক্ত, থানার দেওয়াল মনে করেন গুলির আঘাতে ঝাঁজরা হইয়া আছে। বুড়িগঙ্গার পাড়ে গিয়া খাড়াইলাম। খালি লাশ আর লাশ। নদীর পানি দেখা যায় না। মনে করেন পুকুরে বিষ দিলে যেমন মাছে পানি ঢাইকা থাকে, বুড়িগঙ্গায় খালি মরা মানুষ ভাসতেছে। একটা পুলিশের লাশ দেইখা আগায়া গেছি। দেখি, আমাদের পিআরএফের কনস্টেবল আবু তাহের। আমি চোখের পানি আটকাইতে পারি না। আরো বহু সিপাহির ক্ষত-বিক্ষত লাশ ভাসতেছে। আমি তাহেরের বডি ধরতে গেছি, বেহুঁশের মতো, পেছন থাইকা এক পাঞ্জাবি সোলজার চিলায়া উঠল, 'শুয়র কা বাচ্চা, তুমকো ভি পাকড়াতা হায়, কুত্তা কা বাচ্চা, তুমকো ভি সাথ মে গুলি করেগা।' আমি মনে মনে কই, আমি সাব ইন্সপেক্টর আর তুমি একজন সোলজার, আমার সাথে কুকুরের মতো ব্যবহার করতেছ, করো। আলাহ বিচার করবে।"
মা বলেন, 'মহুয়া, দ্যাখো তো, চুলায় ভাতের কী অবস্থা। আঁচটা একটু কমিয়ে দিও মা। হ্যাঁ ভাই, বলো।'
খলিল বলে চলেন, 'কোতোয়ালি থানার বরাবর সোজাসুজি গিয়া বুড়ীগঙ্গার লঞ্চঘাটটা আছে না, সেই পারে খাড়াইলাম। দেখলাম বুড়িগঙ্গার পাড়ে লাশ, খালি লাশ, পইচা-গইলা যাইতেছে, বেশুমার মানুষের লাশ ভাসতেছে। দেখলাম কত মানুষ মইরা ভাইসা আছে। বাচ্চা, বুড়া, ছেলে, মেয়ে। যতদূর চোখ যায়, দেখলাম বাদামতলি ঘাট থাইকা শ্যামবাজার ঘাট পর্যন্ত নদীর পাড়ে অগণিত মানুষের পচা-গলা লাশ। বুবু, ভাইগ্না এখানে আছে, কওয়া যায় না আবার না কইয়াও পারি না, অনেক উলঙ্গ মহিলার লাশ দেখলাম, পাকিস্তানিরা অত্যাচার কইরা মারছে, দেইখাই বোঝা যাইতেছে। ছোট ছোট মাসুম বাচ্চাদের মনে হইল আছাড় মাইরা খুন করছে। সদরঘাট টার্মিনালের শেডের মধ্যে ঢুইকা খালি রক্ত আর রক্ত দেখলাম...দেখলাম মানুষের তাজা রক্ত এই বুড়িগঙ্গা নদীর পাড়ে। বহু মানুষরে ধইরা আইনা টার্মিনালে জবাই করছে। বেটন আর বেয়নেট দিয়া খোঁচায়া মাইরা টাইনা হেঁচড়ায়া পানিতে ফেইলা দিছে। শেডের বাইরের খোলা জায়গাটায় গিয়া দেখি, কাক আর শকুনে ছাইয়া গেছে। সদরঘাট টার্মিনাল থাইকা পূর্ব দিকে পাক মিলিটারির সদর আউটপোস্টটা আছে না, সেই দিকে তাকাইলে দেখবেন নদীর পাড়ের সমস্ত বাড়িঘর ছাই কইরা ফেলছে। দেখলাম রাস্তার পাশে ঢাকা মিউনিসিপালিটির কয়েকটা ময়লা পরিষ্কার করার ট্রাক খাড়ায়া আছে, সুইপাররা হাত-পা ধইরা টাইনা হেঁচড়ায়া ট্রাকে লাশ উঠাইতেছে। কাপড়ের বাজারের চারদিকে রূপমহল সিনেমা হলের সামনে খালি লাশ। খ্রিষ্টান মিশনারি অফিসের সামনে, সদরঘাট বাসস্টপেজের চারদিকে, কলেজিয়েট হাইস্কুল, জগন্নাথ কলেজ, পগোজ হাইস্কুল, ঢাকা জজকোর্ট, পুরাতন স্টেট ব্যাংক বিল্ডিং, তারপরে ধরেন সদরঘাট গির্জা, নওয়াবপুর রোডের চারদিকে, ক্যাথলিক মিশনের বাইরে ভিতরে, আদালতের সামনে বহু মানুষের ডেড বডি পইড়া আছে।'
আজাদ মাথা নিচু করে সব শুনছে। মায়ের চোখ দিয়ে দরদর করে পানি পড়ছে।
মা ভাত বাড়েন। আজাদ আর খলিল একসঙ্গে ভাত খেতে বসে। খলিল এমনভাবে গোগ্রাসে খেতে থাকেন যে কতদিন তিনি খান না। আজাদ ভাতের থালায় ভাত নাড়েচাড়ে· কিন্তু ভাত তুলে মুখে দিতে পারে না। তার নাকে এসে লাগে লাশের গন্ধ।
আজাদের এই খলিল মামা পরে আবার আসেন তাদের বাসায়। বাশার ছিল সেদিন। আজাদ তাঁকে তাদের ঘরে নিয়ে আসে। বলে, 'খলিল মামা, কী অবস্থা বলেন তো।'
তিনি বলেন, 'বাশার সাহেব তো আবার সাংবাদিক, সাংবাদিক মানে হইল সাংঘাতিক। আমি তার সামনে কিছু বলব না।'
বাশার বলে, 'মামা, আমি এসব লিখব না। শুধু শুনে রাখি, দেশ যদি কোনো দিন স্বাধীন হয়, তখন লিখব।'
খলিল মামা বলেন, 'বাবা রে, রাজারবাগ পুলিশ লাইনে আছি। যা দেখতেছি, তা আলাহ কেমনে সহ্য করতেছে, বুঝতেছি না। পাঞ্জাবি সৈন্যরা ট্রাকে কইরা, জিপে কইরা ডেলি স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির ছাত্রীদের ধইরা আনে। ঢাকার নানান জায়গা থাইকা বাচ্চামেয়ে ইয়ং মেয়ে সুন্দরী মহিলাদের ধইরা আনে। হাতে বইখাতা দেইখাই বোঝা যায় স্টুডেন্ট। মিলিটারি জিপে ট্রাকে যখন মেয়েদের পুলিশ লাইনে আনা হয়, তখন পুলিশ লাইনে হৈচৈ পইড়া যায়। পাকিস্তানি পুলিশ জিভ চাটতে চাটতে ট্রাকের সামনে আইসা মেয়েদের টাইনা হেঁচড়ায়া নামায়া কাপড়-চোপড় ছিঁইড়া-খুঁইড়া উলঙ্গ কইরা আমাদের চোখের সামনেই মাটিতে ফেইলা কুত্তার মতো অত্যাচার করে। সারা দিন নির্বিচারে রেইপ করার পর বৈকালে পুলিশ হেডকোয়ার্টার বিল্ডিংয়ের উপর চুলের সাথে লম্বা লোহার রড বাইন্ধা রাখে। আবার রাতের বেলায় শুরু হয় অত্যাচার। গভীর রাতে

আমাদের কোয়ার্টারে মেয়েদের কান্না শুইনা সবাই ঘুম থাইকা জাইগা জাইগা উঠি।'
খলিল সাহেব কাঁদতে থাকেন।
আজাদ আর বাশার নীরব।
তারা বুঝতে পারে না, খলিল মামাকে তারা কীভাবে সান্ত্বনা দেবে? তাদেরকেই বা সান্ত্বনা দেয় কে? আজাদ ভেতরে ভেতরে ফুঁসতে থাকে। এই অত্যাচার মুখ বুজে যে সহ্য করে, সে কি মানুষ?

৩৭

আজাদকে যুদ্ধে এনেছিল কাজী কামাল উদ্দিন। তার বন্ধুরা, ক্রিকেট খেলার সঙ্গীরা যে অনেকেই আগরতলা গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে এসেছে, আজাদ জানত না।
বর্ষা এবার প্রলম্বিত হচ্ছে। একেক দিন বৃষ্টি শুরু হলে আর থামতেই চায় না। আর বৃষ্টি না হলে পড়ে গরম। সেটা আরো অসহ্য। আজাদদের মগবাজারের বাসার দু বাসা পরের বাসাটার সামনের বাগানে বেলিফুলের ঝাড়ে ফুল ফুটে থাকে। একেকটা রাতে তার ঘ্রাণ এসে নাকে লাগে আজাদের। আজাদের কেমন ঘোর ঘোর লাগে। বেলির গন্ধের সঙ্গে রাজারবাগে দেখা লাশের গন্ধ যেন মিশে যায়।
এক দুপুরে কাজী কামালের সঙ্গে দেখা আজাদের। ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের সামনে একটা সিগারেটের দোকানে। এটা আজাদের প্রিয় একটা সিগারেটের দোকান। ৩ টাকার সিগারেট কেনার জন্য আজাদ এখানে আসে ৩ টাকা বেবিট্যাক্সি ভাড়া দিয়ে হলেও।
কাজী কামালকে দেখেই আজাদ উলসিত, 'আরে কাজী, তুমি কই হারিয়ে গেলে। দেখা পাই না।'
কাজী কামাল সন্ত্রস্ত। পাগল কী বলে! এইভাবে প্রকাশ্য রাজপথে এই ধরনের কথা বলার মানে ধরা পড়ে যাওয়া। কাজী কামাল কথা ঘোরানোর জন্য বলে, 'এরামে চলো। তোমারে সব কইতেছি।'
এরাম রেস্তোরাঁ এবং বার। দিনের বেলাতেও খোলা থাকে। আজাদ আর কাজী কামাল সেখানে যায়। বারটা এখন ফাঁকা। একটা কোনায় তারা দুজন বসে পড়ে।
কাজী কামাল বলে, 'আজাদ। তোমার একটু হেল্প দরকার। আমি তো ট্রেনিং নিয়া আসছি। গেরিলা ট্রেনিং।'
আজাদ বলে, 'এটা তুমি কী করলা? আমাকে ফেলে রেখে একা একা চলে গেলা। তুমি ওঠো। যাও। তোমাকে আমি কিছুই খাওয়াব না।'
কাজী কামাল বলে, 'আরে পাগলামো কইরো না। তুমি এখানে থাইকাই যুদ্ধ করতে পার। হেল্প আস।'
আজাদ বলে, 'কী ধরনের হেল্প?'
'এবার আমরা অনেক অস্ত্রশস্ত্র আনছি। রাখার জায়গা নাই। আবার আমাদেরও থাকার জায়গা লাগে। হাইড আউট। তোমার বাসায় আমাদের জায়গা দিতে পার।'
'অফ কোর্স।'
'বুইঝা বলো। এখনই বলার দরকার নাই। তোমার মায়ের পারমিশন নাও। বাসায় বাইরের ছেলেরা থাকবে। অস্ত্রপাতি থাকবে। খালাম্মাকে না জানায়া এসব করা উচিত হবে না।'
'মা কিছু বলবে না। রাজি হয়েই আছে।'
'তবুও তুমি মারে জিগাও। রান্নাবান্না কইরা খাওয়াইতে তো হবে।'
'মা তো খাওয়ানোর লোক পেলে খুশি হয়।'
'আরে তুমি জিগাও তো। আমি তোমার বাসায় কালকা আসতেছি। জুয়েলকেও নিয়া আসব। সকাল ১০টায় বাসায় থাইকো।'
'জুয়েলও গিয়েছিল নাকি?'
'হ। আরো কে কে আছে আমগো লগে, দেখলে বেহুঁশ হইয়া যাবা। হা-হা-হা।'
দুজন খদ্দের এসে তাদের পাশের টেবিলে বসে। তারা আর আলাপ করতে পারে না। গেলাস শেষ করে উঠে পড়ে। আজাদ বিল মিটিয়ে দেয়।
আজাদ বাসায় যায়। মাকে বলে, 'মা শোনো, তোমার সাথে কথা আছে।'
মা রান্নাঘরে ছিলেন। তার কপালে ঘাম। তিনি আঁচল দিয়ে ঘাম মোছেন। হাতের হলুদ তার মুখে লেগে যায়। 'বল, কী বলবি, চুলায় রান্না।'
'বসো। বসে মন দিয়া শোনো।'
'বলে ফেল।'
'আগে বলো, না করবা না।'
'আরে তুই আগে বলে ফেল না।'
'মা, আমার কয়জন বন্ধুবান্ধব আমাদের বাড়িতে এসে থাকবে।'
'থাকবে থাকুক। এটা আবার জিজ্ঞেস করার কথা। বন্ধুগুলো কারা?'
'এই ধরো কাজী কামাল, জুয়েল।'
'কাজী, জুয়েল এরা অনেক দিন আমাদের বাসায় আসে না। আসতে বল। ওদের বাড়িতে কি অসুবিধা হয়েছে কোনো?'

আজাদ কণ্ঠস্বর নামিয়ে বলে, 'ওরা তো যুদ্ধ করছে। শুনছ না, ঢাকায় গেরিলা অপারেশন হচ্ছে। ওরাই করছে। তাই নিজের বাসায় থাকা নিরাপদ না। সাথে কিছু অস্ত্রশস্ত্রও থাকে তো।' আজাদ শেষের কথাটা বলে রাখে ইচ্ছা করেই। অস্ত্র রাখার অনুমতিটাও এই সুযোগে নিয়ে রাখা দরকার।

মা স্থির হয়ে যান খানিকক্ষণের জন্যে। তাঁর কপালে ঘামের বিন্দুগুলো শিশিরের মতো জমতে থাকে। এবার তিনি কী বলবেন?

একটামাত্র ছেলে তাঁর। এই ছেলেকে মানুষ করার জন্যেই যেন তিনি বেঁচে আছেন। ছেলে তাঁর এমএ পাস করেছে। এখন তার জীবন, তার নিজের জীবন। সত্য বটে, ছেলে তাঁর এখন আয়-রোজগার করবে, এখন মায়ের কষ্ট করে জমি আবাদ করার দিন শেষ, বীজ বোনা, নিড়ানি দেওয়া সব সমাপ্ত, এখন তাঁর ফসল ঘরে তোলার দিন। এখন সংসারে তাঁর লাগার কথা নবান্নের আনন্দের ঢেউ, নতুন ভাতের গন্ধের মতোই আনন্দের হিল্লোলে তাঁর ঘরে মৌ-মৌ করার কথা।

ইতিমধ্যেই তিনি ছেলের জন্যে একটা বউ দেখে রেখেছেন। আলাপ-আলোচনা কেবল শুরু হয়েছে। আজাদকে নিয়ে তিনি একদিন যাবেন মেয়ের বাসায়, বেড়াতে যাওয়ার ছলে দেখে আসবেন মেয়েকে।

এর মধ্যে এ কোন প্রস্তাব!

কিন্তু তিনি নাই-বা করেন কোন মুখে! জুয়েলের মাও তো ছেড়েছে জুয়েলকে, কাজী কামালের মা কাজী কামালকে! আর তা ছাড়া ২৫শে মার্চের পরে ঢাকা শহরের ওপরে পাকিস্তানি মিলিটারি কী অত্যাচার নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে, সে খবর কি তিনি পাচ্ছেন না! বিনা দোষে মারা পড়ছে হাজার হাজার মানুষ। রোজ মেয়েদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে ক্যান্টনমেন্টে, রাজারবাগ পুলিশ লাইনে, অত্যাচার করছে মেয়েদের ওপর। তার জুরাইনের পীরসাহেব বলেন, 'মেয়েদের ওপরে অত্যাচার যখন শুরু হয়েছে, পাকিস্তান আর্মি তখন পারবে না। আলাহতালা এই অত্যাচার সহ্য করবেন না।'

না। এই অত্যাচার চলতে দেওয়া যায় না। এটা অধর্ম। তাঁর অবশ্যই উচিত মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করা। রেডিওতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে একটা গান শোনা যায় : মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি... হ্যাঁ, একটা ফুলকে, একটা দেশকে, দেশের মানুষকে তো বাঁচাতে হবে, আর বাঁচাতে হলে যুদ্ধ তো করতেই হবে। আজাদের বন্ধুরা যুদ্ধ করছে, সারা বাংলার কত কত তরুণ-যুবক, কত কত মায়ের সন্তান যুদ্ধে গেছে, আর তার ছেলে যোদ্ধাদের সাহায্য করবে না?

তিনি কপালের ঘাম মুছে বলেন, 'নিয়ে আসিস তোর বন্ধুদের।'

আজাদ খুশি হয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে। বলে, 'মা, তোমার কপালে হলুদ লেগেছে, সুন্দর দেখাচ্ছে।'

কাজী কামাল আসে পরদিন সকাল ১০টায়। মা তার সামনে আসেন। বলেন, 'কেমন আছ বাবা। কী খাবে? আজাদ আমাকে বলে কামাল, জুয়েল এরা এসে বাসায় থাকবে। এ জন্য কি পারমিশন নিতে হয় নাকি! তোমরা আমার ছেলের মতো না? আসবে। যখন সুবিধা মনে করবে আসবে।'

জায়েদের মনে পড়ে, আজাদদের মগবাজারের বাসাটা ছিল একটা ছোটখাটো ক্যান্টনমেন্ট। প্রচুর অস্ত্র গোলাবারুদ আসত এ বাসায়। আবার এখান থেকে বিভিন্ন বাসায় সেসব চালান হয়েও যেত। সে নিজেও বস্তায় ভরে অস্ত্র নিয়ে গেছে আশপাশের বাসায়। দিলু রোডের হাবিবুল আলমের বাসায় যেমন।

তার এই বীরত্ব নিয়ে কৌতুক করত মর্নিং নিউজের সাংবাদিক আবুল বাশার। বলত, কিরে, ভয় পেয়েছিস নাকি! আয় তো, এদিকে আয়। জায়েদের প্যান্ট একটানে খুলে বলত, দেখি, প্যান্টের মধ্যে হেগে ফেলেছিস নাকি!'

জায়েদ খুবই বিরক্ত হতো। সে কত কষ্ট করে পিঠে বয়ে রেললাইন ধরে এগিয়ে গিয়ে দিলু রোডের পেছন দিয়ে ঢুকে অস্ত্র রেখে এল। আর তার সঙ্গে কিনা এই ইয়ারকি। বাশারের লুঙ্গিটা ধরে একটা টান দেবে নাকি সে!

দাদার বন্ধু। সে কিছু বলতেও সাহস পায় না।

আজাদের আরেক খালাতো ছোট ভাই টিসুর মনে পড়ে, একবার আজাদ ধরে নিয়ে এল এক পুরনো খবরের কাগজের ফেরিঅলাকে। তাকে নিয়ে গেল ঘরের মধ্যে। টিসুর ছিল কতগুলো পুরোনো বইখাতা, সেসব বিক্রি করার উদ্দেশ্যে সে ওই ঘরে গিয়ে দেখে ফেরিআলার ডালায় কাগজপত্রের নিচে সব আগ্নেয়াস্ত্র। ফেরিঅলাটাও আসলে এক মুক্তিযোদ্ধা। টিসুর আর বইখাতা বিক্রি করা হয় না।

আর সৈয়দ আশরাফুল হকের মনে পড়ে, যুদ্ধের সময় তাদের ইস্কাটনের বাড়িতে বদিউল আলম আর স্বপন ছিল দুই মাসের মতো। আশরাফুলের বাবা নান্না মিয়া কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতা ছিলেন বলে ধরেই নেওয়া হয়েছিল পাকিস্তানি সৈন্যদের সন্দেহের তালিকায় এই বাসা থাকবে না। এটা হতে পারে মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। যুদ্ধের মধ্যে একদিন কাজী কামাল উদ্দিন, জুয়েল, বদি তাদের বাসায় আসে। সঙ্গে আজাদও ছিল।

জুয়েল বলে, 'আমরা তো সব যুদ্ধে ইনভল্‌ভ্‌ড হয়ে গেছি। তুমি কী করবা?'

সৈয়দ আশরাফুল একই সঙ্গে ভয়ে কাঁপে, আবার বিস্ময়ে চোখের পাতা পিটপিট করতে থাকে, কারা কারা জড়িয়ে পড়ছে যুদ্ধের সঙ্গে, সব খেলোয়াড়, সব ভালো ছেলে, সে লক্ষ

করে, এই গেরিলারা নিজেদের মধ্যে সব সময় কথা বলে ইংরেজিতে... আর বদিকে দেখে তার বিস্ময় আরো ব্যাপক, বদি ভাই! এনএসএফের গুণ্ডা বদি ভাই, তিনিও ট্রেনিং নিয়ে এসেছেন!

সৈয়দ আশরাফুল জবাব দেয়, 'আপনাদের যা যা সাহায্য করন লাগে, করুম। বাট আই উইল নট গো টু ইন্ডিয়া...'

বদিউল আলম আর স্বপন-এই দুই যোদ্ধা আশরাফুল হকের বাড়িতে যখন ছিল, তখন বদির এক অসাধারণ গুণ পর্যবেক্ষণ করে আশরাফুল। আশরাফুলের এক বোন ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, তাঁর সংগ্রহে ছিল প্রচুর বই, দেশী-বিদেশী বই, বদি দুই মাসে পুরো লাইব্রেরির অর্ধেকটা পড়ে সাবাড় করে ফেলে। একটা বই হাতে নিয়ে সে ঘণ্টা তিন-চারেক একেবারে দুনিয়াদারির বাইরে চলে যেত, পড়া শেষ করে তারপর যেন ফিরে আসত মর্ত্যে।

সৈয়দ আশরাফুল হকের এও মনে পড়ে, একাত্তরে আজাদ ভাইদের বাসাটা ছিল একটা মুক্তিযোদ্ধা মেসের মতো। প্রায়ই বিনা নোটিসে আজাদের মুক্তিযোদ্ধা বন্ধুরা চলে আসত বাসায়। থাকার দরকার হলে থাকত, খাওয়ার দরকার না হলেও খেতে বাধ্য হতো। কারণ আজাদের মা না খাইয়ে ছাড়তেন না তাদের।

জুয়েল আর কাজী কামাল মাঝে মধ্যেই আজাদদের বাসায় আসে। রাতে থাকে। কোনো অপারেশন না থাকলে তাস খেলে। টিভি দেখে। আর আজাদের সঙ্গে গল্প করে।

জুয়েল বলে, 'দোস্তো, যখন তুই আর্মস হাতে নিবি, ফায়ার করবি, তখন কিন্তু ইরেকশন হয়। ঠিক কি না কাজী ভাই?'

কাজী কামাল স্বীকার করে, 'হয়।'

জুয়েল বলে, 'আজাদ, তুমি তো দোস্তো বুঝবা না। তুমি তো আর্মস নাড়ো নাই।'

আজাদ হাসে। 'কী কয়। আমাদের আর্মসের দোকান ছিল না? আমার টার্গেট তোদের চাইতে ভালো। আরে আমি যতগুলান পাখি শিকার করছি, আর কেউ করতে পারছে?'

জুয়েল হাসে। 'পাখি শিকার করা আর পাক আর্মি মারা আলাদা ব্যাপার। পাঞ্জাবি হইলেও তো মানুষ।'

আজাদ বলে, 'দ্যাখো। পাখি মারতে মায়া লাগে। পাঞ্জাবি মারতে আবার মায়া কী রে! ওরা কেমন করে মারছে!'

আজ মনে হয় তাদের গল্পে পেয়েছে। জুয়েল আর কাজী কামাল আজাদকে শোনাচ্ছে তাদের অপারেশনের কথা।

জুয়েল শোনায় তাদের ফার্মগেট অপারেশনের বিস্তারিত বিবরণ।

ধানমন্ডি ২৮-এর হাইড আউটে মিটিং। আলম, বদি, স্বপন, চুল্লু-ভাই ছাড়াও মিটিংয়ে ছিলেন শাহাদত চৌধুরী। ঠিক হলো ফার্মগেটের আর্মি চেকপোস্ট অ্যাটাক করা হবে। সবচেয়ে বেশি উৎসাহ বদির। এক সপ্তাহ ধরে রেকি করা হলো। তারপর আবার মিটিং। সে মিটিংয়ে ঠিক হলো ফার্মগেটের সঙ্গে সঙ্গে দারুল কাবাবেও আক্রমণ চালানো হবে। ওটাও একই ময়মনসিংহ রোডে। দুটো গ্রুপ গঠন করা হলো। ফার্মগেট অপারেশনে থাকবে বদি, আলম, জুয়েল, পুলু আর সামাদ ভাই। আহমেদ জিয়ার নেতৃত্বে চুল্লু-ভাই, গাজি থাকবে দারুল কাবাব ঘর অপারেশনে। ফার্মগেট অপারেশন শেষ হলে গ্রেনেড চার্জ করা হবে, এটাই হবে দারুল কাবাবে হামলা করার সংকেত।

সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে ফার্মগেটে মিলিটারি ক্যাম্পে হামলা করার সময় ঠিক হলো। ওই দিন বিকালে সবাই মিলিত হলো সামাদ ভাইয়ের মগবাজারের বাসায়। আলমের হাতে মেজর নুরুল ইসলাম শিশুর দেওয়া এসএমজি। অন্য সবার হাতে থাকে স্টেনগান। অপারেশন করতে দু-তিন মিনিট লাগার কথা। এর মধ্যে আলম একটা ঝামেলা করে ফেলে। তার সাব মেশিনগান পরিষ্কার করতে গিয়ে পরিষ্কার করার নিজস্ব উদ্ভাবিত পুল নলের ভেতরে আটকে যায়। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। সাড়ে ৬টা বাজে। সবাই উৎকণ্ঠিত। এসএমজি চালু না হলে আজকের অপারেশনই হবে না। শেষে কেরোসিন ঢেলে ভেতরে আটকে যাওয়া দড়ির গিঁটে আগুন লাগিয়ে ওটাকে জঞ্জালমুক্ত করা যায়।

নিয়ন সাইনের মালিক সামাদ ভাই গাড়ি চালাবেন। বদি আর আলম থাকবে সামনের সিটে। জানালার ধারে থাকবে আলম। পেছনের সিটে স্বপন, জুয়েল আর পুলু। এর আগে আলম, বদি, সামাদ ভাই ফার্মগেটে এলাকা অনেকবার রেকি করেছে। এমনকি সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় ওখানে পাকিস্তানি সৈন্যরা কে কী করে, তাও তারা জানে।

এখনও কিছু সময় বাকি আছে। জুয়েল স্বভাবমতো চুটকি বলতে শুরু করে। সামাদ ভাই মেটালিক সবুজ টয়োটা সেডান গাড়িটা শেষবারের মতো চেক করে নেন। ৭টা ১৫ মিনিট। সবাই তাদের পোশাক-আশাক পরিপাটি করে নেয়। কেশবিন্যাস করে। এর কারণ এলোমেলো পোশাকে গাড়িতে গেলে তাদের সন্দেহ করা হতে পারে। ঢাকার গেরিলারা সব সময় ভালো শার্ট, ভালো প্যান্ট পরে। ঠিক সাড়ে ৭টায় তারা গাড়িতে উঠে বসে। আলমের হাতে এসএমজি, অন্যদের হাতে স্টেন, এ ছাড়া জুয়েল আর পুলুর হাতে ফসফরাস গ্রেনেড। আরেকটা ইন্ডিয়ান পাইনঅ্যাপেল গ্রেনেড। দেখতে আনারসের মতো বলে এই নাম। ওপেনিং কম্যান্ড দেবে বদি। ফেরার কম্যান্ড দেবে স্বপন।

গাড়ি চলতে শুরু করেছে। মগবাজার থেকে ধীরে ধীরে এসে পড়ছে ময়মনসিংহ রোডে। রাস্তায় পাকিস্তানি আর্মির গাড়ি চলাচল করছে। শত্রুর গাড়ির কাছে আসতেই মুক্তিযোদ্ধাদের হাত আপনা-আপনিই অস্ত্রের গায়ে চলে যাচ্ছে। তারা ধীরে ধীরে দারুল

কাবাব পেরিয়ে ফার্মগেট মোড়ে যায়। ডান দিকেই তাদের লক্ষ্যবস্তু। আর্মি চেকপোস্ট। দুটো তাঁবু। দুজন সৈন্য নিজেদের মধ্যে গল্প করছে। আরেকজন সৈন্য একটা বেবিট্যাক্সি থামিয়ে এক যাত্রীকে তলাশি করছে। বাকি সৈন্যরা হয়তো তাঁবুতে রাতের খাবার খাচ্ছে, বা বিশ্রাম নিচ্ছে। তাদের গাড়ি ডানে ঘুরে তেজগাঁও সড়কে পড়ে। কিছুদূর গিয়ে সামাদ ভাই গাড়ি ঘুরিয়ে ফেলেন। তারপর গাড়ির হেডলাইট নিভিয়ে স্টার্ট বন্ধ করে গাড়ির নিজস্ব গতিজড়তায় গাড়িটাকে এনে দাঁড় করান হলিক্রস কলেজের গেটের কাছে। পানের দোকানে বিকিকিনি চলছে যথারীতি। সামাদ ভাই বলেন, 'আলাহ ভরসা।' পাঁচজন নেমে পড়ে। এক মিনিটের মধ্যে সবাই যার যার পজিশন নিয়ে ফেলে। দুজন সৈন্য এখনও গল্প করছে। তৃতীয় সৈন্যটিও তাদের কাছে এসে গল্প জুড়ে দেয়। গেরিলাদের বুক কাঁপছে। বদি নির্দেশ দেয় : 'ফায়ার।' আলম গুলি চালায় তিন সেন্ট্রিকে লক্ষ্য করে। সেন্ট্রিরা সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। আর বাকি চারজন গেরিলা একযোগে ব্রাশফায়ার করতে থাকে দুই তাঁবু লক্ষ্য করে। তিনজন প্রহরারত সৈন্যকে ধরাশায়ী করে আলমও তাক করে তাঁবু দুটো। রচিত হয় গুলির মালা। স্বপন নির্দেশ দেয় : 'রিট্রিট'। জুয়েল আর পুলু বোমা চার্জ করে। সবাই দৌড়ে এসে উঠে পড়ে গাড়ি। সামাদ ভাই গাড়িতে টান দেন। ময়মনসিংহ সড়ক ধরে গাড়ি এগিয়ে চলে। তখন সবার খেয়াল হয় গ্রেনেডটি বিস্ফোরিত হয়নি। দারুল কাবাব ঘরের অপারেশ ন তাই হতে পারে না।

জুয়েল তাদের এই অপারেশনের বিবরণ পেশ করে বিশদভাবে, রসিয়ে রসিয়ে।

আজাদ বলে, 'কয়জন মিলিটারি মারা গেল, বুঝলি কেমনে!'

জুয়েল বলে, '১২ জন সোলজার মারা গেছে। আমরা পরদিন গেলাম আশরাফুলের বাড়ি। ওইখানে আমগো বন্ধু হিউবার্ট রোজারিও সব কইল। অর বোন হলিক্রসের টিচার না? উনিই সব দেখছে। সারা রাত আর্মিরা লাশ লইতে আসতেও সাহস পায় নাই। ভোরবেলা আসছে। হিউবার্টের বোন ১২ বার বুকে কপালে ক্রস করছে। মানে ১২টা লাশ লইয়া গেছে। চিন্তা কর। এরা নাকি দুনিয়ার সবচাইতে সাহসী সোলজার। সারা রাত সৈন্যরা পইড়া থাকল, কেউ তো উন্ডেডও থাকতে পারে, আইসা দ্যাখ, হসপিটালে লইয়া যা, ঢাকা শহরের মধ্যে এই সাহসটা পাইল না। আরে নিউজ শুইনা নাকি ক্যান্টনমেন্টে সব সোলজারগো পিশাব পাইছে, একলগে এতজন বাথরুমে যাইব কেমনে, সব কাপড় নষ্ট কইরা ফেলাইছে, মুতের গন্ধে ক্যান্টনমেন্ট যাওয়া যাইতেছে না...'

শুনে আজাদ উত্তেজিত-'জুয়েল, যুদ্ধ যখন শেষ হবে, তোদেরকে অনেক অ্যাওয়ার্ড দেবে রে। শোন, আমিও যাব নেক্সট অপারেশনে। আমাকে তোরা অবশ্যই নিবি।'

'যেতে চাইলে যাবি। কিন্তু আম্মার পারমিশন লাগবে। আম্মার পারমিশন ছাড়া তরে নেওন যাইব না'-জুয়েল বলে। জুয়েল আজাদের মাকে আম্মা বলে, কারণ তার চাচাতো ভাই টগর আম্মা বলে ডাকে তাঁকে।

'মা ঠিক পারমিশন দিবে। ঘরে অস্ত্রশস্ত্র রাখতেছি। তাতে যখন আপত্তি করে নাই, তখন...'

সেই রাতেই ভাত খেতে খেতে আজাদ মাকে বলে, 'মা, এরা এরপর যেই অপারেশনে যাবে, আমি সেটাতে যেতে চাই। এত বড় জোয়ান ছেলে, ঘরে বসে থাকে, আর দেশের মানুষ মার খায়, এটা হতে পারে না।'

মা কথার জবাব দেন না।

'এই দ্যাখ মার অ্যাপ্রুভাল আছে। মা আপত্তি করল না'-আজাদ কায়দা করে।

মা বলেন, 'আমি কালকে তোকে ফাইনাল কথাটা বলব। আজকের রাতটা সবুর কর।'

'ঠিক আছে। কিন্তু দ্যাখো মা, না কোরো না।'

মা সারা রাত বিছানায় ছটফট করেন। কী বলবেন তিনি ছেলেকে। যুদ্ধে যাও! পরে যদি ছেলের কিছু হয়। এই ছেলে তাঁর বহু সাধনার ধন। তাঁর প্রথম সন্তানটা একটা মেয়ে। কানপুরেই জন্ম হয়েছিল মেয়েটার। চৌধুরী সাহেব মেয়ের নাম রেখেছিল বিন্দু। সেই মেয়ে এক বছর বয়সে মারা যায়। প্রথম সন্তান বিয়োগের কষ্ট যে কী কষ্ট! বহু রাত সাফিয়া বেগম কেঁদেছেন। মেয়েটা তাঁর কথা শিখেছিল। 'মা মা, দাদা দাদা' বলতে পারত। সুন্দর করে হাসত। চৌধুরী সাহেব বলতেন, ফেরেশতারা হাসাচ্ছে। বিন্দু তাঁর সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে ছিল। সেই মেয়ে বসন্ত হয়ে মারা গেল। সাফিয়া বেগমের মনে হলো সমস্ত জগৎই শূন্য। জীবনের কোনো মানে নাই। বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়া সমান কথা। বিন্দু মারা যাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর পেটে সন্তান এসে গেল। নতুন করে তিনি মাতৃত্বের স্বপ্ন বুনতে লাগলেন। জন্ম নিল আজাদ। তখন আজাদির স্বপ্নে পুরো ভারতই উত্তাল। তাই ছেলের নাম, চৌধুরী রাখলেন আজাদ। আজাদকে তিনি যত্ন করেছেন অনেকটা আদেখলার মতো করে। সারাক্ষণ কপালে টিপ পরিয়ে রেখেছেন, যেন কারো নজর না লাগে। মাজারে গিয়ে মানত করেছেন তার সুস্থতার জন্যে। আজাদের কোনো অসুখ-বিসুখ হলে তিনি পাগলের মতো করতেন। তাঁরা পাকিস্তানে চলে আসার পরে তাঁর শাশুড়ি এসবকে বাড়াবাড়ি বলে সমালোচনা করতেন। কিন্তু তাঁর কীই-বা করার ছিল। ছেলের অমঙ্গল-আশঙ্কায় সর্বদা তাঁর মন কুপিত হয়ে থাকত। আজাদের পরেও তাঁর কোলে একটা বাচ্চা এসেছিল। সেও তো বাঁচেনি। আজাদ তাঁর সর্বস্ব। তাকে বুকের মধ্যে আগলে না রেখে তিনি পারেন?

সেই ছেলে আজ কেমন ডাগরটি হয়েছে। মাশালা-স্বাস্থ্য-টাস্থ্য সুন্দর। ছেলের জন্য তিনি মেয়ে দেখে রেখেছেন। ছেলের বিয়ে দিতে পারলে তাঁর দায়িত্ব পালন সম্পূর্ণ হয়। পুত্রপালনের দায়িত্ব তিনি স্বেচ্ছায় একা কাঁধে তুলে নিয়েছেন। এই দায়িত্ব কঠিন। আজকে একটা কঠিন সিদ্ধান্ত তাঁকে নিতে হবে। এই সিদ্ধান্ত তিনি কী করে একা নেবেন? ছেলের বাবার সঙ্গে পরামর্শ করতে পারলে ভালো হতো। তা তিনি জীবন থাকতেও করবেন না। যে বাবা ছেলের মুখের দিকে তাকিয়েও স্থূল বাসনা থেকে নিজেকে নিরত রাখতে পারে না, সে আবার বাবা কিসের? সাফিয়া বেগম আজ সত্যি অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি।
কিন্তু দেশ যখন তাঁর ছেলেকে চাইছে, তখন মা হয়ে কি তিনি ছেলেকে আটকে রাখতে পারেন? বলতে পারেন, আমার একটামাত্র ছেলে, আর কেউ নাই ত্রিজগতে, আমার ছেলেকে ছাড় দাও। এই কথা বলার জন্যে কি তিনি ইস্কাটনের বাসা ছেড়েছিলেন? এই সুবিধা নেওয়ার জন্যে? না। ওটা ছিল তাঁর নিজস্ব সংগ্রাম। আজকে দেশ অন্যায় শাসনে জর্জরিত। সাফিয়া বেগম যতটুকু বোঝেন, রেডিও শুনে, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শুনে, ছেলেদের আলোচনা শুনে, বাসায় আগত লোকদের কথাবার্তা যতটুকু তার কানে আসে তা বিচার-বিশেষণ করে, আর পুলিশ সুবেদার খলিলের বয়ান শুনে, তাতে পাঞ্জাবিদের এই জুলুম মেনে নেওয়া যায় না, মেনে নেওয়া উচিত না। তিনি ছেলেকে মানুষ করেছেন কি নিজে ছেলের আয়-রোজগার আরাম করে ভোগ করবেন বলে! কক্ষনো নয়। এটা তিনি ছেলেকে চিঠিতেও লিখে জানিয়েছেন, ছেলেকে তিনি মানুষ করেছেন মানুষের যা কিছু কর্তব্য তাই করবে বলে। দেশ আর দশের কাজে লাগবে বলে।
অমঙ্গল-আশঙ্কায় আবার তাঁর বুক কেঁপে ওঠে, সমস্ত অন্তরাত্মা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে যায়। যদি ছেলের কিছু হয়! তিনি কল্পনা করার চেষ্টা করেন, কেউ এসে তাঁকে খবর দিচ্ছে যে তার ছেলের গায়ে গু লি লেগেছে, না, তিনি কল্পনা করতে পারেন না, অশ্রুর পাবন এসে তাঁর দু চোখ আর সমস্তভাবনা ভাসিয়ে নিয়ে যায়।
একজন কারো সঙ্গে পরামর্শ করতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু কার সঙ্গে! হঠাৎই মায়ের মনে পড়ে যায় জুরাইনের পীরসাহেবের কথা। বড় হুজুর আর তাঁর স্ত্রী দুজনই বড় ভালো মানুষ। তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করলেই তো চলে।
মা সকালবেলা রওনা দেন জুরাইন মাজার শরিফ অভিমুখে। পীর সাহেবের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, ছেলে যুদ্ধে যেতে চায়, তিনি কি অনুমতি দেবেন?

পীরসাহেব বলেন, 'ছেলেকে যেতে দাও। পাকিস্তানিরা বড় অন্যায় করতেছে। জুলুম করতেছে। আর তা ছাড়া, ছেলে বড় হলে তাকে আটকায়া রাখার চেষ্টা করে ফল নাই। তুমি না করলেও সে যুদ্ধে যাবেই।'
মায়ের মন থেকে সব দ্বিধা দূর হয়ে যায়। ফিরে এসে তিনি আজাদকে ডাকেন। বলেন, 'ঠিক আছে, তুই যুদ্ধে যেতে পারিস। আমার দোয়া থাকল।'
ছেলে মায়ের মুখের দিকে ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে থাকে। বোঝার চেষ্টা করে, মা কি অনুমতিটা রেগে দিচ্ছেন, নাকি আসলেই দিচ্ছেন।
'মা, তুমি কি অন্তর থেকে পারমিশন দিচ্ছ, নাকি রাগের মাথায়?'
'আরে রাগ করব ক্যান। দেশ স্বাধীন করতে হবে না?'
'থ্যাঙ্ক ইউ মা। আমি জানি তোমার মতো মা আর হয় না। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে একটা গান হয় না, আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি, তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী, ওগো মা... তুমি হলে সেই মা।'

৩৮

আজাদের সঙ্গে রুমীর দেখা হয়ে যায় ধানমন্ডির হাইডআউটেই। এটার কোড-নাম ২৮ নম্বর। এটা একটা ওষুধ কোম্পানির ছেড়ে যাওয়া অফিস। এখানে থাকেন শাচৌ আর আলম। কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা তখন একত্র হয়েছে। উলফত, হ্যারিস, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, কাজী কামাল, আলম আর রুমী। মেলাঘর থেকে নতুন অস্ত্র আসবে। আসবে আরো আরো বিস্ফোরক। ঢাকায় গেরিলাদের অভিযান এখন একটা নতুন মাত্রা পেয়েছে। ফার্মগেট অপারেশনেরপর গেরিলাদের মনোবল এখন তুঙ্গে। তারা এখন বড় অ্যাটাকে যেতে চায়। যদিও শাহাদত চৌধুরী বারবার সাবধান করে জানিয়ে দিচ্ছেন ক্যাপ্টেন হায়দারের উক্তি-গেরিলারা কিন্তু পাকিস্তানি মিলিটারির সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ করবে না, তারা হঠাৎ আক্রমণ করবে, লুকিয়ে যাবে জনারণ্যে। স্মরণ করিয়ে দেন মেজর খালেদ মোশাররফের রণকৌশল, আক্রমণ হবে তিন দিক থেকে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আর সামরিক।
কিন্তু গেরিলারা এখন সামরিক আক্রমণের জন্যে অস্থির।
আজাদ আসে। শাচৌয়ের কথা শোনে। কে এই ক্যাপ্টেন হায়দার। দেখতে কেমন তিনি। শোনা যায়, দাড়ি ছিল, এখন ক্লিন শেভ্ড। প্রথম দেখাতেই ভালো লেগে যায়। মেলাঘরে একবার যাওয়া দরকার। আর মেজর খালেদ মোশাররফ। ২ নম্বর সেক্টরের প্রধান।

তাকে তো ছেলেরা একেবারে হিরোর মতো দেখে। কিংবদন্তি যেন তিনি। শাহাদত চৌধুরী তো বলেন, প্রথম দেখার দিনটায় খালেদ মোশাররফকে তাঁর মনে হয়েছিল গ্রিক দেবতার মতো, বিকালবেলা তাঁকে প্রথম দেখেন শাচৌ, জিপ থেকে নামছেন গোমতী নদীর এমবারক্মেন্টে, পেছনে অস্তগামী সূর্যটা লাল আর গোল, সোনালি রঙের গ্রিক দেবতা নেমে এলেন...

শাচৌ অনেক কথা বলেন। বুঝিয়ে বলেন, ঢাকার যুদ্ধটা কনভেনশনাল যুদ্ধ নয়। এটা সাইকোলজিক্যাল যুদ্ধ। এই যুদ্ধে জয় বা মাটি দখল উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হলো,মানুষের মনোবল অক্ষুণ্ন রাখা।

পরিবেশটা গম্ভীর। এখানে জুয়েল থাকলে ভালো হতো। এখনই একটা কৌতুক বলে পরিবেশটা জমিয়ে তুলতে পারত।

'এই আজাদ তুমি?'

একটা জুনিয়র ছেলে তাকে তুমি করে বলছে ব্যাপার কী! ছেলেটা আবার দেখতে রুমীর মতো। 'হ্যাঁ। তুমি?'

'চিনতে পারছ না। আশ্চর্য তো! আমি রুমী!'

'রুমী! এই, তোমার কী চেহারা হয়েছে।'

'মেলাঘরে ট্রেনিং নিতে গেছলাম না। বোঝোই তো। আমার শরীরে কি ওই সব সহ্য হয়। এই, খালাম্মা কেমন আছেন?'

'আছেন ভালো। তোমার মা?'

'আছেন। মার সঙ্গে দেখা করতে বাসায় চলো। কাজী, জুয়েল ওরা থাকে তো মাঝে মধ্যে। আজকে আমার সঙ্গে চলো। তোমাকে একটা জিনিস দেব।'

'কী জিনিস?' রুমী জিজ্ঞেস করে।

'তুমি না গান ভালোবাসো। রেকর্ড শোনো। আমাদের বাসা থেকেও তো রেকর্ড ধার নিতা!'

'হ্যাঁ। তো?'

'একটা গান দেব তোমাকে।'

'রেকর্ড!'

'না রেকর্ডটা পাই নাই। গানের লিরিকটা পেয়েছি। আমি কপি করে রেখেছি। তোমাকেও দেব এখন।'

'কোন গান, বলো তো!'

'জর্জ হ্যারিসনের। কনসার্ট ফর বাংলা দেশ।'

'ও মাই গড। তুমি ওর রেকর্ড পেয়েছ?'

'রেকর্ড পাই নাই। জর্জ হ্যারিসনের গানের কপিটা পেয়েছি। বাংলা দেশ বাংলা দেশ।'

'চলো। এখনই যাই। শাহাদত ভাই, আমি একটু আজাদের বাসায় যেতে পারি?'

'কেন?'

'আগেই বলব না। আগে আনি, তারপরে আপনাদের সবাইকে দেব।'

'কী জিনিস?'

'জর্জ হ্যারিসনের গানের লিরিক। কনসার্ট ফর বাংলা দেশ।'

'বলো কি!' শাচৌ উত্তেজিত বোধ করেন।

শাচৌও খুব গান শোনেন। তবে গানের ব্যাপারে, সাহিত্যের ব্যাপারে তিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন না। তিনি মনে করেন, জনপ্রিয়তা আর শিল্পের উৎকর্ষ সমার্থক নয়। তার ঝোঁক ক্লাসিকের দিকে। যুদ্ধ আস্তে আস্তে তার মনোভাব পাল্টে দিচ্ছে, এটা তিনি লক্ষ করছেন। জনরুচির প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর বাড়ছে। হয়তো জনগণের কাছাকাছি থাকতে গিয়ে তাঁর এই পরিবর্তন। কনসার্ট ফর বাংলা দেশ সম্পর্কে তিনি জানেন। পহেলা আগস্ট এই কনসার্ট হয়েছে। আমেরিকায় মেডিসন স্কয়ার গার্ডেনে। জর্জ হ্যারিসন, পণ্ডিত রবিশঙ্কর, বব ডিলান, এরিখ ক্লাপটন। একেকজন দিকপাল। এরা সবাই মিলে খোদ আমেরিকায় করেছে এই কনসার্ট। হাজার হাজার তরুণ-তরুণী অংশ নিয়েছে এই কনসার্টে। ভয়েস অব আমেরিকা, বিবিসি, আকাশবাণী, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র- সর্বত্র ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে এই কনসার্টের খবর।

শাচৌ বলেন, 'এই, একটা কপি করে আমাকেও দিও তো।'

রুমী বেরিয়ে পড়ে আজাদের সঙ্গে। রিকশায় সহজেই চলে যাওয়া যায় মগবাজার। রেললাইনের ধারে বাসাটা।

মাকে ডাকে আজাদ-'মা দ্যাখো। কাকে এনেছি।'

মা মাথায় কাপড় দিতে দিতে এগিয়ে আসেন। 'কে?'

রুমী সালাম দেয়। মা সালামের জবাব দেন। আজাদ বলে, 'রুমী।'

মা বিস্মিত! রুমীর চেহারা এতটা রোদে পোড়া হলো কী করে! কুশল বিনিময় শেষ করে মা রুমীর জন্যে নাশতা আনতে যান। রুমী আর আজাদকে তার ব্যক্তিগত বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করে না। বরং তার উৎসাহ জর্জ হ্যারিসনের বাংলাদেশ গানটা নিয়ে।

আজাদ একটা বইয়ের ভেতর থেকে একটা কাগজ বের করে। সেই কাগজে সে কপি করে রেখেছে গানটা। তাকেও সে কাগজ-কলম এগিয়ে দেয়। রুমী কপি করার আগে গানটা একবার পড়ে নেয়।

My friends came to me

With sadness in his eyes
রুমী ভাবে, আজাদ কপি করতে একটু ভুল করেছে। ফ্রেন্ডস না হয়ে ফ্রেন্ড হলে তো গ্রামারটা ঠিক থাকে।)

He told me that he wanted help
Before his country dies

Although I couldn`t feel the pain
I knew I had to try
Now I am asking all of you
To help us save some lives

Bangla Desh, Bangla Desh
Where so many people
Are dying fast.
And it sure looks like a mess
I have never seen such distress.
I want you lend your hand
Try to understand
Relieve the people of Bangla Desh

Bangla Desh Bangla Desh
Such a great disaster
I don`t understand
But it sure looks like mess
I never known such distress
Please don`t turn away
I wanna hear you say
Relieve the people of Bangla Desh...

রুমী পড়ে। তার দু চোখে পানি এসে যায়। বলে, 'কত দূরে বসে একজন গায়ক বাংলাদেশের মানুষের জন্যে ভাবছে, লিখছে, গান করছে, ফান্ড কালেক্ট করছে, মানুষ যখন মানুষের জন্য করে, তখন কেমন লাগে, না!' সে কাগজকলম নিয়ে বসে পড়ে অনুলিপি করতে। আজাদও কপি করতে থাকে অন্য সহযোদ্ধাদের জন্যে।

মা বলেন, 'আজাদ, চা হয়েছে।'
আজাদ বলে, 'আসছি।' সেও কপি করতে থাকে। শাচৌকে দিতে হবে। জুয়েল, কাজী কামাল—ওরাও তো চাইবে এর কপি।

জাহানারা ইমাম ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছেন। বিকালবেলা। রুমী বলেছে, 'আম্মা, চলো তোমাকে এক বাসায় নিয়ে যাই। তোমার মন একদম ভালো হয়ে যাবে।'
'কোথায়?'
'আগে থেকে বলব না। সারপ্রাইজ।'
মগবাজার চৌমাথা থেকে তেজগাঁও ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার দিকে একটু এগিয়েই রেললাইন পার হয়ে গাড়ি খানিক সমনে গিয়ে ডানে একটা গলিতে ঢোকে। আরো একটুখানি গিয়ে আবার ডানে ঢুকে থামে একটা একতলা বাড়ির সামনে। ৩৯ বড় মগবাজার। দু ধাপ সিঁড়ি উঠেই ছোট্ট একটা বারান্দা-রেলিংঘেরা। এ কার বাসায় যে রুমী আনল তাকে-জাহানারা ইমাম ভাবেন। তিনি দেখতে পান, বারান্দায় চেয়ারে বসে আছে এক স্বাস্থ্যবান যুবক। উঠে দাঁড়িয়ে আদাব দেয় তাকে। রুমী বলে, 'মা, এ হলো আজাদ। একে তুমি এর ছোটবেলায় অনেক দেখেছ। আগে আমরা এদের বাসায় আসতাম। দাওয়াত খেতাম।'
জাহানারা ইমাম আজাদের মুখের দিকে ভালো করে তাকান। কিন্তু মনে করতে পারেন না। তিনি বারান্দা পেরিয়ে ভেতরে যান। আজাদের মা তার সামনে আসেন। 'আরে, এ যে সাফিয়া আপা।' জাহানারা ইমাম উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। আজাদের মাকে জড়িয়ে ধরেন। বলেন, 'কত দিন পরে আপনার সাথে দেখা হলো বলেন তো দশবারো বছর তো হবেই।'
আজাদের মা বলেন, 'তাই হবে।'
জাহানারা ইমামের মনে পড়ে, তিনি শুনেছিলেন বটে যে আজাদের আব্বা আরেকটা বিয়ে করেছে। তাই রাগ করে আজাদের মা ছেলেকে নিয়ে আলাদা হয়ে গেছেন।
আজাদের মা চা করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। জাহানারা ইমাম বলেন, 'আপনি বসুন, আপনার সাথে গল্প করি।'
আজাদের মা হাঁক ছাড়েন, 'কচি, একটু শুনে যেও। খালাম্মাকে কী খাওয়াবে।' তারপর জাহানারার দিকে চেয়ে বলেন, 'আমিও আজাদকে নিয়ে আলাদা হয়েছি, আমার

বোনটাও মারা গেছে, ওর ছেলেমেয়েদের নিজের কাছে রেখেছি। মাঝখানে কয়েক বছর অনেক কষ্ট করেছি আপা। এখন তো মনে করেন আজাদ এমএ পাস করেছে। দেশের পরিস্থিতি ভালো হলে ব্যবসাপাতি করবে। এখন তো ভালোই আছি ইনশাল্লাহ আপনাদের দোয়ায়।'

জাহানারা বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকেন সাফিয়ার দিকে। তাঁকে তাঁর বরাবরই মনে হয়েছে বাইরে নম্র মৃদুভাষিণী, আর ভেতরে ভেতরে দৃঢ়চেতা, কিন্তু তাই বলে এই মহিলা যে এতটা একরোখা, তা তো তিনি আগে বোঝেননি। এখন আজাদের মা অনেক শুকিয়ে গেছেন। আগে তাঁর ছিল স্বাস্থ্য-সুখী কান্তি। এখন পরনে সরুপাড় শাদা শাড়ি, গায়ে কোনো গয়না নাই, আগে ছিল শরীরভরা গয়না, দামি শাড়ি, মুখে পান আর মৃদু হাসি, আঁচলে চাবি। কী কনট্রাস্ট।

তবে আজাদ ছেলেটাকে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। সুন্দর হয়েছে ছেলেটা, স্বাস্থ্যবান। মায়ের মতোই মুখে সব সময় হাসি লেগে আছে।

রুমী আর আজাদ অন্য ঘরে গল্প করছে। এরই মধ্যে আরেকজন ছেলে আসে। লম্বা। ফরসা। রুমী মাকে ওইঘরে নিয়ে পরিচয় করিয়ে দেয় তার সঙ্গে, 'আম্মা, এনাকে চেন। কাজী কামাল উদ্দিন। উনি প্রভিন্সিয়াল বাস্কেটবল টিমের খেলোয়াড়। ন্যাশনাল টিমেও ডাক পেয়েছিলো। কাজী ভাই যান নাই। ওনার সাথে আমার দেখা হয়েছে মেলাঘরে, ট্রেনিং ক্যাম্পে। এখানেও কাজী ভাইয়ের অনেক নাম। হিরোইক ফাইটার।'

৩৯

আজাদের মায়ের মৃত্যুর পরে, জায়েদের কাছ থেকে ঠিকানা বুঝে নিয়ে, একদিন জুরাইনে যায় সৈয়দ আশরাফুল হক। গোরস্তানে গিয়ে জিয়ারত করে আসে মায়ের কবরটা। এখনও কবরটা পাকা করা হয়নি। তবে মোসাম্মৎ সাফিয়া বেগম, শহীদ আজাদের মা-এই পরিচয়-ফলকটা বাঁশের বেড়ার গায়ে লাগানো আছে। কবরস্তান থেকে বেরিয়ে ভিক্ষুকদের পাল্লায় পড়ে আশরাফুল হক। পকেট থেকে খুচরো টাকা বের করে বিলাতে থাকলে কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ভিক্ষুক-মিছিলের মধ্যখানে পড়ে যায় সে। শেষে অসহায়ের মতো দৌড়ে এসে গাড়িতে ওঠে।

গাড়িতে ফিরতে ফিরতে আশরাফুল হকের মনে পড়ে যায় বিগত দিনের নানা স্মৃতি।

একেকটা সফল অপারেশন করে ফিরত গেরিলারা, আর সেই বিজয়টাকে উদ্‌যাপন করত দুদিন ধরে। আশরাফুলদের বাসাতেও হয়েছে এ রকম আড্ডা। সবাই চলে আসত সেই ভোজসভায়। আজাদ আসত। রুমী আসত।

রুমীকে প্রথম দিন দেখে তো আশরাফুলের আকাশ থেকে পড়ার যোগাড়। এ তো একদম বাচ্চাছেলে। এ কি যুদ্ধ করবে? এও ট্রেনিং নিয়ে এসেছে মেলাঘর থেকে?

বদি আর রুমীর একটা বিষয়ে ছিল খুবই মিল। দুজনই ছিল রোমাঞ্চপ্রিয়। আবার দুজনেই ছিল মেধাবী। বিভিন্ন ঘটনা তারা তাত্ত্বিকভাবে বিশেষণ করত। একদিন বদি তাকে বলে তার ভক্স ওয়াগনে একটা লিফট্ দিতে। আশরাফুল বের হয় গাড়ি নিয়ে। সে গাড়ি চালাচ্ছে, যাত্রী বদি আর স্বপন। বদির কাছে কেবল একটা পিস্তল। ধানমন্ডি ২৮ নম্বরে রেকিট অ্যান্ড কোলম্যানের অফিসের সামনে গাড়ি দাঁড় করানো হয়। চুল্লু-ভাই দুটো বস্তা আনে। আশরাফুল বলে, 'এর মধ্যে কী?'

বদি বলে, 'ইউ গেজ।'

আশরাফুলের সমস্তটা শরীর কাঁপতে থাকে। বদি বলে, 'লেট্স মুভ।'

মিরপুর রোডে উঠতেই দেখা যায় সামনে চেকপোস্ট। আশরাফুলের কপালে ঘাম জমে। সে বোঝে, আজই শেষ। বদি কিন্তু নির্বিকার। সে বলে, 'ইফ দ্য বাস্টার্ডস স্টপ আস, আই উইল জাস্ট ফায়ার। অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু ডু ইয়োর ওন বিজনেস। তোরা কী করবি, তোরা বুইঝা নিস।'

শুনে আশরাফুলের সমস্তটা শরীর দুষ্টু ছেলের হাতে ধরা পড়া চড়ুইপাখির ছানার বুকের মতো কাঁপে।

গাড়ি চেকপোস্টের সামনে আসে। সৈন্যরা গাড়ি থামাতে বললে তারা থামায়। উর্দুতে কথাবার্তা হয়। তারা জানতে চায় তারা কী করে, কোথায় যাচ্ছে। সামান্য জিজ্ঞাসাবাদের পর সৈন্যরা গাড়ি চেক করার কষ্ট স্বীকার না করে হাত ইশারায় তাদের চলে যেতে বলে।

সেই দুপুরটাই তো আশরাফুলের জীবনের শেষ দুপুর হতে পারত। বদিরও হতে পারত। কিন্তু বদি ছিল নির্বিকার। মৃত্যুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলা খেলতে পছন্দ করত সে। তার ছিল অপরিসীম সাহস।

আশরাফুলের অত সাহস ছিল না। সে মনেপ্রাণে ছিল গেরিলাদের সঙ্গেই, কিন্তু যুদ্ধে সরাসরি যাওয়ার বা ট্রেনিং নিতে ভারত যাওয়ার কথা ভাবেনি। তবে তার বাবা যেহেতু কৃষক শ্রমিক পার্টি করতেন, পাকিস্তানিরা তাদের সন্দেহের দৃষ্টির বাইরে রাখত, সে কারণে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের অন্যতম আশ্রয়স্থল হিসাবে বেছে নিয়েছিল তাদের বাড়িটাকেও।

আর ঢাকার গেরিলারা নিজেদের মধ্যে কথা বলত ইংরেজিতে। তারা ভালো পোশাক পরত, সব সময় থাকত ধোপদুরস্ত, যাতে পথেঘাটে চলাচলের সময় কেউ তাদের গেরিলা বলে সন্দেহ না করে।

এই ইংরেজি বলা সচ্ছল তরুণ গেরিলাদের সঙ্গেই যোগ দিয়েছিল কমলাপুর রেলস্টেশনের কুলি সর্দার রশিদ। শাহাদত চৌধুরীর মতো অভিজাতপন্থী লোক তার সঙ্গে একই সিগারেট ভাগ করে খায়-এটা শুনে আশরাফুলের বিস্ময় আকাশ স্পর্শ করে।

৪০

আজকে আজাদের প্রথম অপারেশনে যাওয়া। দুপুরবেলা বাথরুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শেভ করতে করতে আজাদ মাকে বলে, 'মা, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। আজকে রাতে ফিরব না।'

মা বলেন, 'কোথায় যাচ্ছিস?'

আজাদ বলে, 'যাব একদিকে। দোয়া কোরো। ইনশালাহ কালকে ফিরে আসব।'

মা বলেন, 'একা যাবি?'

আজাদ বলে, 'না। কাজী, জুয়েল ওরাও যাবে। মা, আর কিছু জিজ্ঞেস কোরো না।'

মায়ের বুকটা ধক করে ওঠে। শরীরটা অবশ অবশ লাগে। তিনি বুঝতে পারেন, ছেলে আজকে এমন কোথাও যাবে, যেটা ঠিক সে বলতে চায় না। তিনিও আর বাড়তি কিছু জিজ্ঞেস করেন না।

শেভ করা হয়ে গেলে ছেলের মুখের দিকে তিনি তাকান। ছেলের ফরসা গাল। শেভ করার পরে সবুজ হয়ে আছে। তিনি বলেন, 'ভাত খেয়ে যাবে তো?'

আজাদ বলে, 'হুঁ।'

মা তাড়াতাড়ি করে ভাত বাড়েন। আজকে তরকারি তেমন ভালো নয়। যুদ্ধের কারণে আজাদের ব্যবসাপাতি বন্ধ। ঘরে টানাটানি চলছে। বাজার তেমন করে আর করা হয় না। ছেলে তাঁর কী খেয়ে যাবে? তিনি তাড়াতাড়ি একটা ডিম ভাজতে চলে যান। তখন তাঁর মনে হয়, ছেলের পরীক্ষার দিনে তিনি তাকে কিছুতেই ডিম খেতে দিতেন না, দেখতেও দিতেন না। আজ ছেলে তাঁর যে অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি হতে যাচ্ছে, তাতে তো ডিম খেতে অসুবিধা নাই। নিশ্চয় নাই।

আজাদেরও মনের মধ্যে উত্তেজনা। উত্তেজনা বেশি হলে তার বারবার পেশাব পায়। সে এরই মধ্যে দুবার জলবিয়োগ করে এসেছে। সে কোনো দিকে তাকাচ্ছে না। ঘাড় না ঘুরিয়ে সামনে নাকের দিকে তাকিয়ে থাকছে। ব্যাপারটা আর কারো চোখে ধরা পড়ছে না বটে, মায়ের চোখে ঠিকই পড়ছে। মা অবশ্য কিছুই বলছেন না।

আজাদের বাঁ চোখের পাতা লাফাতে শুরু করে দেয়। এটা কেন হচ্ছে? এর মানে কী?

আজাদ ভাত খেতে বসে। ভাতও সে খাচ্ছে মুখ নিচু করে। মা লক্ষ করেন, আজাদ ভাত মুখে নিয়ে চিবোচ্ছে না, গিলে ফেলছে, বারবার গেলাসে করে পানি খাচ্ছে। মা মুখটা হাসি হাসি করে বলেন, 'আস্তে আস্তে খাও বাবা, চিবিয়ে চিবিয়ে খাও। পানি পরে খেও।'

মা যখন সিরিয়াস হয়ে যান, তখন আজাদকে 'তুমি' করে বলেন।

ভাত খেয়ে উঠে আজাদ কাপড়-চোপড় গোছাতে থাকে। একটা ছোট্ট হাতব্যাগে দুটো ঘরে-পরার কাপড় নেয়। কাজটা করার সময় সে গুনগুন করে গান গাইতে থাকে, এলভিস প্রিসলির গান।

তারপর বোনদের ঘরে উঁকি দেয়। মহুয়ার একটা বাচ্চা হয়েছে। সে ঘরে যাওয়া যাবে কি না, কে জানে। দরজায় দাঁড়িয়ে সে গানের আওয়াজ বাড়িয়ে দিয়ে তারপর গলা খাঁকারি দেয়। তারপর বলে, 'মহুয়া, শরীর ঠিক আছে?'

'জি দাদা।'

'বাবুটা রাতে খুব কেঁদেছে মনে হলো?'

'জি দাদা। কী যে হইছিল।'

'কিরে কচি, তোর কী অবস্থা? রোজ দশটা করে অঙ্ক করতে বলেছিলাম, করেছিস?'

'জি দাদা।' কচি ভয়ে ভয়ে জবাব দেয়। দাদা যদি এখন খাতা আনতে বলে তাহলেই সে ধরা পড়ে যাবে।

দাদা তেমন কিছুই বলে না। সে বেঁচে যায়।

'জায়েদ কই?' আজাদ বলে।

মা বলেন, 'ও তো বাইরে গেছে।'

আজাদ বলে, 'ওকে বেশি বাইরে যেতে মানা কোরো।'

মা বলেন, 'ও তোকে মানে বেশি। তুই একদিন ভালো করে কড়া করে বুঝিয়ে বলিস।'

'আচ্ছা।' আজাদ তার ঘরে আসে আবার। জর্জ হ্যারিসনের গান লেখা কাগজটা সঙ্গে নেয়। সিগারেটের প্যাকেট, লাইটার ঠিক আছে কিনা পরখ করে। তারপর মায়ের সামনে এসে তাঁর মুখের দিকে তাকায়। এই প্রথম সে গত এক ঘণ্টায় মায়ের মুখের দিকে তাকাল। ঠোঁটটা কামড়ে ধরে মুখে একটা ঝাঁকি দিয়ে সে বলে, 'যাই তাহলে।'

মা বলেন, 'বাবা, যাই না, বলো আসি।'

আজাদ বলে, ‘আসি। দোয়া কোরো।’
মা বলেন, ‘সাবধানে থেকো। সাবধানে চোলো। বিসমিলাহ করে বের হয়ো। বিপদে লা ইলাহা ইলা-আন্তা সোবহানাকা পোড়ো। মাথা ঠাণ্ডা রেখো।’
আজাদ একটা বড় শ্বাস টেনে নিয়ে বলে, ‘ওকে ওকে।’
সে আর পেছনে তাকায় না। সোজা বের হয়ে বেবিট্যাক্সিস্ট্যান্ডের দিকে যায়।
মা তাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দেন। ছেলে অদৃশ্য হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে থাকেন তার চলে যাওয়ার দিকে।

কাজী কামালের নেতৃত্বে জনা-দশেক মুক্তিযোদ্ধা যাচ্ছে সিদ্ধিরগঞ্জে পাওয়ার স্টেশন কীভাবে উড়িয়ে দেওয়া যায়, সেটা সার্ভে করতে। মেজর খালেদ মোশাররফ কাজী কামালকে মেলাঘর থেকে অস্ত্রশস্ত্র আর লোকজন দিয়ে পাঠিয়েছেনই সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন উড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে। এটা করতে পারলে ঢাকা শহরের বেশির ভাগটা অন্ধকার হয়ে পড়বে। এর আগে দুবার যোদ্ধারা চেষ্টা করেছিল এটা উড়িয়ে দিতে, পারেনি। এবার কাজী কামালের দল বেশ ভারী। ১০ জনের গ্রুপ নিয়ে সে ঢুকেছে ঢাকায়। একটা সাড়ে তিন ইঞ্চি রকেট লাঞ্চারও আনা হয়েছে। ৮ টা রকেট শেল। ভীষণ ভারী। রকেট লাঞ্চার চালানোর জন্যে আর্টিলারির গানার দেওয়া হয়েছে। তার নাম ল্যান্স নায়েক নুরুল ইসলাম। আর আছে কানা ইব্রাহিম। এক চোখ কানা তার। কোনোভাবে যদি পাওয়ার স্টেশনেরভেতরে ঢোকা না যায়, বাজার থেকে শেল মারলে কী হয়! এই হলো মেলাঘরের পরামর্শ। অস্ত্রের মধ্যে আরো আছে দুটো এসএলআর, সঙ্গে আন্যার্গা লাঞ্চার। প্রত্যেকের জন্যে একটা করে স্টেনগান, চারটা ম্যাগাজিন, দুটো গ্রেনেড আর অসংখ্য বুলেট।
ভাদ্র মাস। আকাশে মেঘ। তাই একটা গুমোট ভাব। সন্ধ্যার পরে বাড্ডার ওপারের পিরুলিয়া গ্রামের হাইড আউট থেকে দুটো নৌকাযোগে গেরিলারা রওনা হয় সিদ্ধিরগঞ্জের দিকে। বেরুনোর আগে আজাদ বুকপকেট থেকে বের করে একবার দেখে নেয় জর্জ হ্যারিসনের গানের কপিটা। তারপর আবার সেটা রাখে যথাস্থানে। তারা দুটো নৌকায় ওঠে। একটা নৌকায় বদি, কাজী, জুয়েল, আরো দুজন। আরেকটা নৌকায় আজাদ, জিয়া, ইব্রাহিম, রুমী। নৌকা চলতে শুরু করলে বাতাস এসে গায়ে স্পর্শ রাখে, একটুখানি শীতল হয় শরীর। এখনও অন্ধকার তেমন ঘন হয়ে নামেনি। আজাদ উত্তেজিত। তার হাতে একটা স্টেনগান। বলা যায় না, হয়তো আজই তার শত্রুর দিকে গুলি ছোড়ার উদ্বোধন হতে পারে। উত্তেজনা গোপন করতে সে গান ধরেছে, তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে, আমরা কজন নায়ের মাঝি, হাল ধরেছি, শক্ত করে রে।

সামনের নৌকা থেকে তার গান শুনে জুয়েল বলে, ‘ঢেউয়ের সাগর নারে, এইটা আসলে ডোবা। গানটা হইব : ব্যাঙ-ডাকা এই রামপুরা বিল পাড়ি দিমু রে, আমর কয়জন কাউবয়...’
সামনে কাজী কামালদের নৌকা। সবাই যার যার স্টেনগান নৌকার পাটাতনে নামিয়ে রেখেছে। কারণ কেউ অস্ত্র দেখে ফেললে তাদের আসার উদ্দেশ্যই মাটি হয়ে যাবে। কিন্তু বদি কিছুতেই তার স্টেনগান নামিয়ে রাখবে না। সে রেখেছে তার কোলের ওপরে।
কাজী কামাল এই অপারেশনের কমান্ডার। সে বলে, ‘বদি, স্টেনটা নামায়া রাখো।’
বদি গম্ভীর গলায় বলে, ‘আপনেরা নামায়া রাখছেন রাখেন। আমারে কন ক্যান। আমি আসলে কি বুড়া আঙুল টাইনা ইনডেক্স দিয়া গুলি করব? নেভার। আই অ্যাম আ ফাইটার অ্যান্ড আই অ্যাম অলওয়েজ রেডি টু শুট...’
আজাদ বদির কথা শুনে অবাক। কাজী না এই অপারেশনের কমান্ডার। তার আদেশ কি বদির মেনে নেওয়া উচিত ছিল না।
দুই নৌকা ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে পাওয়ার স্টেশনের কাছাকাছি। সব নিস্তব্ধ। কেবল নৌকার ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। অন্ধকার ধীরে ধীরে বাড়ছে। আকাশে মেঘ থাকায় তারা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। তবে এখানে-ওখানে বিলের মধ্যে ঝোপের ওপরে জোনাকি দেখা যাচ্ছে। আর একটা কিটিকিটি শব্দও যেন আছে। ঝোপেঝাড়ে কি ঝিঁঝিও ডাকছে নাকি? এর মধ্যে আবার শেয়ালের ডাকও কানে আসে।
সামনের নৌকায় কাজী সিগারেট ধরায়। লাইটারের আলোয় হঠাৎ চমকে ওঠে আজাদ। কাজীর মুখে লাইটারের আলো পড়ায় ওর মুখটা কিছুক্ষণের জন্যে ভেসে ওঠে আজাদের চোখে। বন্ধুর মুখ দেখে সে খানিকটা স্বস্তি বোধ করে।
আজাদ বলে, ‘আমি কি একটা সিগারেট ধরাতে পারি?’
‘ও শিয়োর’ -জিয়া জবাব দেয়।
আজাদ একটা সিগারেট ধরায়। তার কাছে ব্যাপারটাকে বেশ রোমাঞ্চকর মনে হচ্ছে। নাজ বা গুলিস্তান সিনেমা হলে সে কত কত যুদ্ধ-চলচ্চিত্র দেখেছে। আজকে সে নিজেই এক যুদ্ধ-অভিযানের কুশীলব।
তাদের নৌকা দুটো এগিয়েই চলেছে। সবাই একদম চুপ। কারণ তারা প্রায় সিদ্ধিরগঞ্জের কাছাকাছি এসে পড়েছে। দূরে পাওয়ার স্টেশনের আলো দেখা যাচ্ছে। ওখানে আছে পাকিস্তানি সৈন্যদের সতর্ক প্রহরা। তাদের জন্যে এটা খুবই স্পর্শকাতর ও সংরক্ষিত এলাকা, সন্দেহ নাই।
ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। এতক্ষণে অন্ধকারের সঙ্গে চোখ খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে। অন্ধকারের মধ্যেও নিজেদের কে কোথায় বসে আছে, দেখা যাচ্ছে।

আজাদ একটা শ্বাস নেয় জোরে। সেই শ্বাস নেওয়ার শব্দটাও তার কানে প্রবলভাবে বাজে। সে কি ভয় পাচ্ছে?

হঠাৎই সামনে একটা নৌকার মতো নড়তে দেখা যায়। কী নৌকা, কাদের নৌকা, অন্ধকারে কিছু বোঝা যায় না। তবে তাদের মাঝি বাঙালি। সে হাঁক ছাড়ে, 'কে যায়!' রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করে সেই হাঁক প্রলম্বিত হয়ে বিলের ঢেউয়ে ঢেউয়ে যেন আছড়ে পড়ে।

আজাদ ভাবে, হয়তো কোনো সাধারণ নৌকা। বাঙালি কেউ যাচ্ছে। কাজী জবাব দেয়, 'সামনে যাই।'

কাজীর গলার স্বরটাকে যেন খানিকটা, মাঝির স্বরের তুলনায়ও এই পরিবেশে, আগন্তুকের মতো শোনায়।

ওই নৌকাটা কাছে আসতেই দেখা যায় : সর্বনাশ। ওই নৌকায় পাকিস্তানি মিলিটারি। একটা মুহূর্ত সময় শুধু। আজাদ এখন কী করবে? তার সামনে কাজীদের নৌকা। সে ফায়ার ওপেন করলে তো কাজীরা মারা পড়বে। তার নিজেকে দিশেহারা লাগে। বদি কারো নির্দেশের অপেক্ষা না করে স্টেন তুলে ব্রাশফায়ার করে। পুরো ম্যাগাজিন খালি করে দেয়। এই শান্ত নিরিবিলি অন্ধকারে অসাড় হয়ে শুয়ে থাকা বিলটার ওপরে আর মেঘভারে নিথর আকাশটার নিচের সমস্তস্তব্ধতা তখন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। প্রতিপক্ষ নৌকা থেকেও গুলি বর্ষিত হয়। অন্ধকারে ফুটে ওঠে আগুনের ফুলকি। বারুদের গন্ধ বাতাসের ভেজা গন্ধে এসে মেশে।

আজাদ ঠকঠক করে কাঁপে। সামনে শোনা যায় নৌকার ডুবে যাওয়ার শব্দ আর মানুষের আর্তনাদ। মানুষ সাঁতার কাটার চেষ্টা করছে, তাই জলে উঠছে আলোড়ন। আজাদ এরই মধ্যে নৌকার পাটাতনে রাখা অস্ত্র তুলে নিয়েছে। ফায়ার করার জন্যে সে প্রস্তুত। কিন্তু কমান্ডারের অর্ডার ছাড়া ফায়ার করাটা উচিত হবে না। সে চিৎকার করে অর্ডার চায়, 'কাজী, কাজী...'

কাজী তাড়াতাড়ি বলে, 'ডোন্ট ফায়ার, ডোন্ট ফায়ার।'

আজাদ বলে, 'ওকে। ওকে।'

কাজী বলে, 'এই, ওই নৌকা এদিকে আনো। এইটা ফুটা হইয়া গেছে। পানি উঠতেছে। কাম শার্প।'

আজাদদের নৌকা তাড়াতাড়ি সামনে যায়। এদিকে অন্ধকারে বদির গলা, 'হেল্প মি, আই অ্যাম গোয়িং টু বি ড্রাউন্ড।' টর্চের আলোয় দেখা যায় বদি পানিতে ভাসছে। ও বোধহয় পড়ে গিয়েছিল। ভাসমান বদিকে নৌকায় তোলা হয়। কাজীরাও নৌকা বদল করে উঠে পড়ে আজাদদেরটায়। ওরা এসে আজাদদের নৌকায় উঠতে না উঠতেই প্রথম নৌকাটা ডুবে যায়।

কাজী বলে, 'দেয়ার বোট হ্যাজ বিন টোটালি ডেস্ট্রয়েড। লেট্স রিট্রিট। স্পিডবোট নিয়া আবার অ্যাটাক করতে আইতে পারে।'

পাকিস্তানি সৈন্যদের নৌকাটা ডুবে গেছে। সৈন্যরা হয় গুলিবিদ্ধ অথবা নিমজ্জিত। চারদিক অন্ধকার।

একমাত্র নৌকাটি দ্রুত বাইতে বাইতে তারা ফিরে আসছে। দুই নৌকার মাঝি একই নৌকায়। তারা জোরে জোরে দাঁড় বাইছে।

জুয়েল বলে, 'আমার আঙুলে কী যেন হইছে রে।'

পেন্সিল টর্চ জ্বালিয়ে ভালো করে তাকিয়ে দেখা যায়, ডান হাতের তিনটা আঙুলগুলিতে জখম। রক্তে জায়গাটা একাকার। মনে হয় গুলি আঙুল ভেদ করে বেরিয়ে গেছে।

আজাদের শরীর কাঁপছে। উত্তেজনায়। জুয়েলের হাতে রক্ত দেখে সে বুঝতে পারে, তারা মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরছে।

দুই মাঝি নৌকা বাইছে। মনে হচ্ছে, তবুও নৌকার গতি বড় শথ। আজাদ আর জিয়া পানি সেচা থালা হাতে নিয়ে বৈঠা বাওয়ার কাজ করছে।

কাজী কামাল হ্যা-হ্যা করে হাসে। 'আজাদ, আওয়ার এলভিস প্রিসলি, ইজ রোয়িং দ্য বোট। দিস ইজ ফানি।'

আজাদ বলে, 'আরে আমি বিক্রমপুরের পোলা না? গ্রামে গিয়ে কত নৌকা বেয়েছি।' এবার নৌকা সত্যি দ্রুত এগোচ্ছে। অবশেষে বিলের শেষে ডাঙা দেখা যায়। আকাশে মেঘের ফাঁকে একটা চাঁদ দেখা যাচ্ছে। শাদা পেয়ালায় পানি নিয়ে রংমাখা তুলি ছেড়ে দিলে যেমন রঙগুলো ছড়াতে থাকে, চাঁদের ওপরে মেঘগুলোকে দেখা যাচ্ছে তেমনি। শেয়ালের ডাক কানে আসছে, কুকুরদের সম্মিলিত প্রতিবাদধ্বনিও। জোনাকি এখন অনেক।

ডাঙা এসে গেছে। নৌকা ঘাটে ভিড়লে সবাই নৌকা থেকে অবতীর্ণ হয়।

রাতটা পিরুলিয়া গ্রামের হাইড আউটেই কাটায় তারা। এটাও আজাদের জন্যে এক নতুন অভিজ্ঞতা। কাঁচা ঘর। প্রাকৃতিক শৌচাগার।

জুয়েলের দিকে তাকিয়ে আজাদের মায়া লাগতে শুরু করে। তার হাতের রক্তপাত বন্ধ হচ্ছে না। আহা বেচারা এর পরে ব্যাট করতে পারবে তো।

হারিকেনের আলোয় জুয়েলের রক্তকে মনে হচ্ছে খয়েরি।

এই হারিকেনের আলোতেই বদি একটা চটিবই মনোযোগ দিয়ে পড়ছে। কী বই? আজাদ এগিয়ে যায়। দেখে আলবেয়ার কামুর দি আউট সাইডার। বদির বই পড়ার বাতিকটা গেল না!
কাজী কামাল বেরিয়ে যায় ফার্স্ট এইডের জন্যে সরঞ্জাম জোগাড় করতে। আজাদ বলে, 'জুয়েল, ব্যথা করছে?'
জুয়েল বলে, 'হেভি আরাম লাগতেছে। দেশের জন্যে রক্ত দেওয়াও হইল, আবার জানটাও রাখা হইল। কইয়া বেড়াইতে পারুম, দেশের জন্যে যুদ্ধ কইরা আঙুল শহীদ হইছিল। হা-হা-হা।'
আজাদ জুয়েলের কথায় হাসতে পারে না। বোঝাই যাচ্ছে তার খুবই ব্যথা লাগছে। সে ব্যথা ভোলার জন্যে রসিকতা করার চেষ্টা করছে।
কাজী কামাল তুলা আর ডেটল জোগাড় করে আনে। জুয়েলের হাতে ফার্স্ট এইড দেওয়া হয়।

৪১

পরদিন সন্ধ্যাবেলা কাজী আর বদি জুয়েলকে নিয়ে আসে ডা. রশিদ উদ্দিনের চেম্বারে। কাজীর বন্ধু কুটু, ভালো নাম সাজ্জাদুল আলম, সে মেডিক্যাল কলেজে পড়ে, তার বাবা ডাক্তার, তিনি আবার ডা. রশিদের বন্ধু। সেই সূত্রে তাদের আগমন রশিদ উদ্দিনের চেম্বারে।
কুটু বলে, 'আংকেল। ওর হাতটা একটু দেখতেন যদি...'
'কী হয়েছে?'
ডাক্তারকে কি মিথ্যা বলা যায়? কাজী বলে, 'গুলি লাগছে।'
রশিদ উদ্দিন বলেন, 'এহ্। একেবারে থেঁতলে গেছে। হাড় ভেঙেছে কি না কে জানে! গুলি লাগল কী করে?'
'এই কেমন কইরা জানি লাগল আর-কি!' জুয়েল বলে।
ডা. রশিদ বলেন, 'আমার এখানে তো ও.টি. নাই। তোমরা এক কাজ করো। রাজারবাগে ডা. মতিনের ক্লিনিকে নিয়ে যাও। আমি আসছি।'
'রাজারবাগ!' কাজী কামাল ঢোক গেলে। 'ও তো বিপজ্জনক জায়গা!'
ডা. রশিদ উদ্দিন বুঝে ফেলেন। বলেন, 'ঠিক আছে। আমি আমার গাড়িতে করে নিয়ে যাচ্ছি।'

ডা. রশিদ তাঁর রেডক্রস চিহ্ন আঁকা গাড়িতে করে জুয়েলকে নিয়ে যান রাজারবাগে ডা. মতিনের ক্লিনিকে। ওখানে অপারেশন থিয়েটারে জুয়েলের হাতে তিনি ব্যান্ডেজ করে দেন। সেখান থেকে জুয়েলকে নিয়ে যাওয়া হয় দিলু রোডে হাবিবুল আলমের বাসায়। হাবিবুল আলমের তিন বোন জুয়েলের যত্নের ভার নেয়। বড় বোন আসমা তাকে ড্রেসিং করে দেয় নিয়মিত।
তবে ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসক ছিলেন ডা. আজিজুর রহমান। জুয়েলের হাতে আঙুলের অবস্থা খারাপ দেখে তাকে ডা. আজিজের এলিফ্যান্ট রোডের পলি ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হয়।
ডা. আজিজ আর তাঁর স্ত্রী ডা. সুলতানা জুয়েলের হাতের ব্যান্ডেজ খোলেন। আঙুলের অবস্থা দেখে আঁতকে ওঠেন। আজিজ বলেন, 'তিনটা আঙুল একসাথে ব্যান্ডেজ করেছে কেন! আর ব্যান্ডেজ এত বড়ই বা কেন।' তিনি তিনটা আঙুল আলাদা আলাদা করে ব্যান্ডেজ করে দেন।'
জুয়েল বলে, 'স্যার, দেশ স্বাধীন হলে আমি হব ন্যাশনাল ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন। আঙুল তিনটা রাইখেন।'
মিটিং বসেছে ২৮ নম্বরের হাইড আউটে। শাচৌ, বদি, আলম, কাজী উপস্থিত সেখানে। সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কি ওড়ানো যাবে না? মেজর খালেদ মোশাররফ, ক্যাপ্টেন হায়দার-এরা খুবই চান যে ওটা উড়ে যাক। কিন্তু কীভাবে!
আলম বলে, 'ওখানে আর্মিরা যেভাবে বাঙ্কার করে পজিশন নিয়ে সব সময় অ্যালার্ট থাকে, অ্যাটাক করে ওদেরকে সরানো যাবে না। তার চেয়ে গেরিলা ওয়ারফেয়ার করব গেরিলা কায়দায়। আমরা ওখানকার স্টাফদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। দুইজন কর্মচারীর সঙ্গে তো আমাদের যোগাযোগ আছেই। ওদেরকে ট্রেনিং দিয়ে ওদের হাতে এক্সপ্লোসিভ পাঠিয়ে দিয়ে ওদের দ্বারাই ওগুলো বাস্ট করানো হবে।'
আলম এক্সপ্লোসিভের ব্যাপারটা খুব ভালো বোঝে। সে বলে যায়, 'এখন ৮০/৯০ পাউন্ড পি.কে. (প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ) লাগবে। এতটা পি.কে. ভেতরে নিয়ে যাওয়া যাবে কী করে?'
অনেক আলোচনার পর ঠিক হয়, পাওয়ার স্টেশনের ইঞ্জিনিয়ারের জিপের দরজার ভেতরের দিকের হার্ডবোর্ড কভার খুলে পি.কে. নিয়ে যাওয়া হবে। একবারে ৮/১০ পাউন্ড পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যাবে।
যাক, সিদ্ধিরগঞ্জ বিষয়ে তবু একটা ফয়সালা হলো। কিন্তু বিশেষ ট্রেনিং নিয়ে এসে গেরিলারা কি শুধু বসে থাকবে? 'তা হবে না। চলো, একটা কিছু করি' -বদির উত্তেজনা সবচেয়ে বেশি।

কাজী কামাল বলে, 'খালি প্যাচাল না পাইড়া কিছু একটা অ্যাকশন করি। হাতে-পায়ে জং ধইরা যাইতেছে তো।'

ঠিক হয়, তারা আবার বেরিয়ে পড়বে। একসঙ্গে একই সময় দুটো গ্রুপে। একটা আলমের নেতৃত্বে। আরেকটা জিয়ার নেতৃত্বে। আলমের গ্রুপে থাকবে আলম, বদি, কাজী কামাল, রুমী আর স্বপন। দ্বিতীয় গ্রুপে হ্যারিস, মুখতার, জিয়া, আনু, চুলু-ভাই আর আজাদ।

বদি আর আলম মিলে ধানমন্ডি থেকে হাইজ্যাক করে একটা মাজদা গাড়ি। গাড়িটার কাগজপত্রে দেখা যায় গাড়ির মালিক মাহবুব আনাম। অন্যদিকে হ্যারিস আর মুখতার হাইজ্যাক করে ফিয়াট ৬০০ গাড়ি।

আজাদরা অপেক্ষা করছে ধানমন্ডির হাইড আউটে। বদি আর আলম গেছে এক গ্রুপের জন্যে গাড়ি হাইজ্যাক করতে। হ্যারিস আর মুখতার গেছে তাদের গ্রুপের জন্যে গাড়ি হাইজ্যাক করতে। বদি আর আলম চলে আসে আগে। তারা হাইজ্যাক করেছে একটা শাদা মাজদা। তাতে উঠে কাজী কামাল, রুমী, স্বপন বিদায় নেয়। আজাদ, আনু, চুলু-ভাই অপেক্ষা করছে হ্যারিস আর মুখতারের জন্যে। হ্যারিস আর মুখতার আসে ফিয়াট ৬০০ গাড়ি নিয়ে। তাতে উঠে পড়ে আজাদরা। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। রাস্তার লাইটগুলো জ্বলছে। হ্যারিসদের কাজ হলো রাজারবাগ পুলিশ লাইনের কাছে থাকা। আর আলমরা ধানমন্ডি এলাকায় চীনা কূটনীতিকের বাসার সামনে প্রহরারত সৈন্যদের ওপর হামলা করে ওদিকেই ১৮ নম্বর রোডে আরেকটা বাসায় শেখ মুজিব পরিবারকে নজরবন্দি রাখা প্রহরারত পুলিশ আর সৈন্যদের ওপর চড়াও হবে। তারপর এসে জিয়াদের সঙ্গে যোগ দেবে। তখন দুটো গ্রুপ একসঙ্গে আরো কিছু অভিযান পরিচালনা করবে। বেরুনোর আগে শাচৌ যখন জানতে চেয়েছেন এই অপারেশনের নাম কী, তখন আলম বলেছে, এর নাম অপারেশন আননোন ডেসটিনেশন।

আজাদদের গাড়ি চালাচ্ছে হ্যারিস। সে গাড়ি নিয়ে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের সামনে একটা চক্কর দেয়।

হ্যারিস বলে, 'কী করব। ইঞ্জিন গরম হয়ে যাচ্ছে। রেডিয়েটরে মনে হয় পানি নাই। মিটারে হট দেখাচ্ছে।'

জিয়া বলে, 'কোথাও থেকে পানি নিলে হবে?'

হ্যারিস বলে, 'হবে।'

মুখতার বলে, 'শাহজাহানপুরে চলেন। আমার চেনা পানের দোকান আছে। ওখান থাইকা পানি নেওন যাইব।'

হ্যারিস গাড়ি থামায় শাহজাহানপুরে, মুখতারের দেখিয়ে দেওয়া পানের দোকানের সামনে। স্টেন হাতে সবাই নামে। এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা যায়।

আজাদ একটা পান কেনে। দোকানদার কিছুতেই দাম নেবে না। বলে, 'স্যার মুক্তি গো কাছ থাইকা দাম লই না।' ইঞ্জিনে পানি ভরে নিয়ে ওরা আবার আসে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের গেটে। দুটো চক্কর দেয়। 'আরে, আলমদের কী হলো! ওরা আসে না কেন!'

জিয়া বলে, 'চল, আমরা নিজেরাই একটা অ্যাকশন করি। দারুল কাবাবের দিকে যাই।' কাকরাইলের মোড়ে আসতেই কয়েকজন বাঙালি পুলিশ বলে ওঠে, 'হল্ট।' ওরা গাড়ি থামায়। জিয়া ঘাড় বাড়িয়ে বলে, 'সরেন তো। আমরা বাঙালি পুলিশ মারি না।'

পুলিশও উঁকি দিয়ে দেখে, এদের হাতে যে অস্ত্র, তাতে বাড়াবাড়ি করা মানেই মৃত্যু। বলে, 'ওরে বাবা, মুক্তিবাহিনী।' তারা সরে এসে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে। যেন তারা কিছুই দেখেনি।

আজাদরা ময়মনসিংহ রোডে এসে পড়ে। চলে যায় দারুল কাবাবের দিকে। দারুল কাবাবের সামনে একটা আর্মির জিপ দাঁড় করানো। এটাকে আক্রমণ করা যায়। আজাদের হাত স্টেনগানে চলে যায়। জিয়া বলে, 'গাড়িটা ইউ টার্ন করে ঘুরিয়ে আন। তাহলে মগবাজার দিয়ে পালিয়ে যেতে সুবিধা হবে।' হ্যারিস গাড়িটাকে ইউ টার্ন করে ঘুরিয়ে আনে খানিকটা দূরে গিয়ে। ফিরে এসে দেখা যায়, আর্মির জিপটা চলে গেছে। তারা সোজা চলে আসে পিজি হাসপাতালের মোড়ে। সেখান থেকে এলিফ্যান্ট রোড হয়ে মিরপুর রোডে পড়তে যাবে। সামনে দেখা যায়, একটা আর্মির জিপ। হ্যারিস বলে, 'লেট্‌স অ্যাটাক দি জিপ।' জিয়া বলে, 'দাঁড়াও। পেছনে আলো নেভানো কতগুলো আর্মির ট্রাক আছে। মিরপুর রোডেও গাড়ি দাঁড় করিয়ে চেক হচ্ছে। হ্যারিস, গাড়ি ২ নম্বর দিয়ে সাতমসজিদ রোডে নাও।'

আজকের অপারেশনেও কোনো গুলি করতে না পেরে আজাদ হতাশ। ২৮ নম্বরে তারা তাদের হাইড আউটে যায়।

২৮ নম্বরে পরে যখন সবাই মিলিত হয়, তখন জিয়ারা আলমদেরকে বকাবকি করে তাদের সঙ্গে তারা কেন রাজারবাগে যোগ দেয়নি!

আলমরা তাদের অপারেশনের যে গল্প করে, তা শুনে আজাদের রোম খাড়া হয়ে যায়। এ যে সিনেমাকেও হার মানায়!

আলম বলে, "আমি মাজদার ড্রাইভিং সিটে বসলাম। আমার এসএমজিটা দিলাম বদিকে। বদি আমার বাঁ পাশে ফ্রন্ট সিটে বসল। পেছনে বাঁয়ে কাজী, মধ্যখানে রুমী আর ডান দিকে স্বপন। ২৮ নম্বর থেকে বেরিয়ে মাঠের কাছে চায়নিজ ডিপ্লোম্যাটের বাসার সামনে গেলাম। গিয়ে দেখি কোনো সেন্ট্রি নাই। ধানমণ্ডি ১৮ নম্বর রোডে পাকিস্ত

ানি আর্মির হোমরা-চোমরার বাড়ির সামনে গিয়ে দেখি সাত-আট জন সেন্ট্রি রাইফেল কাঁধে, তাদের জনা-দুয়েক দাঁড়িয়ে, বাকিরা বসে, সবাই গল্পগুজব হাসিঠাট্টায় মশগুল। আমি বললাম, 'ওকে ফ্রেন্ডস, জন্তুরা আমাদের হাতের নাগালে, আর ঠিক তিন মিনিট সময় আমাদের হাতে।'

সাতমসজিদ রোডে গিয়ে আমি গাড়ি ঘুরিয়ে নিলাম। এতে সুবিধাও হলো। আমাদের শত্রুরা আমাদের বাঁয়ে পড়ল। বদি আর কাজী তাদের বাঁয়ের জানালা ব্যবহার করতে পারবে। আমি স্বপন আর রুমীকে বললাম, 'তোমরা রাস্তা দ্যাখো। রুমী পেছনটা। স্বপন সামনেরটা।'

সেন্ট্রিদের খুব কাছে চলে আসলাম। মাজদার সুবিধা হলো শব্দ করে না। গাড়ি স্লো করে বললাম, ফায়ার। বদি পেট বরাবর, কাজী বুক বরাবর গুলির মালা রচনা করল তাদের স্টেনগান আর মেশিনগান দিয়ে। সৈন্যরা মুহূর্তে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। কোনো প্রতিরোধ করার ফুরসত পেল না। রুমী বলল, 'লেট্স কালেক্ট দ্য উইপন।' আমি বললাম, 'মাথা খারাপ নাকি। প্রতিটা সেকেন্ড মূল্যবান।' সেখান থেকে গাড়ি টান দিয়ে চীনা ডিপোম্যাটের বাসভবনে আবার গিয়ে দাঁড়ালাম কিন্তু কোনো শিকার পেলাম না। স্বপন আর রুমী বলল, 'এটা কি, আমাদের তো শুটিং প্রাকটিসই হলো না।' আমি আবার মিরপুর রোডে উঠলাম। যাচ্ছি নিউমার্কেটের দিকে। ৫ নম্বরের কাছে এসে দেখি, আর্মি চেকপোস্ট বসিয়েছে। দুটো ট্রাক আর একটা জিপ আমাদের দিকেই মুখ করে দাঁড়ানো। রাস্তায় দুজন সৈন্য শুয়ে পড়ে লাইট মেশিনগান নিয়ে পজিশন নিয়েছে। চার-পাঁচটা গাড়ি দাঁড় করিয়ে আর্মি চেক করছে। ভয়ে আমার কলজে শুকিয়ে এল। এখন আর থামিয়ে গাড়ি ঘোরানোরও সময় নাই। একমাত্র উপায় ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যাওয়া। আমি বললাম, 'বাঁচার একমাত্র উপায় হলো আমরা গাড়ি না থামিয়ে বাঁয়ে চলে যাব। স্বপন, এলএমজিম্যানকে সাবাড় করবা। বদি, কাজী, রাস্তার বায়ে দাঁড়ানো সৈন্যদের টার্গেট করবা। আমি গাড়ি বাঁয়ে ঘোরানোর সাথে সাথে ফায়ার করবা। আমি শুধু একবারই বলব, ফায়ার।'

আমি গাড়ি স্লো করে দাঁড়ানো গাড়িগুলো কাটিয়ে সামনে চলে গেলাম। তিনজন সেন্ট্রি হাত উঁচিয়ে বলল, 'হল্ট।' আমি হেডলাইট বন্ধ করে ডান দিকে যাওয়ার ইনডিকেটর জ্বালালাম। ডানে ঘোরানোর একটু ভানও করলাম। সেন্ট্রি চিৎকার করে বলল, 'হারামজাদা, কিধার যাতা হ্যায়, রোকো,' আমি এক্সেলেটরে চাপ দিয়ে গাড়ি বাঁয়ে ৫ নম্বরের দিকে নিতে নিতে বললাম, 'ফায়ার, ফায়ার।'

স্বপনের গুলি এলএমজিম্যানকে শেষ করে দিল নিশ্চয়। নইলে কোনো পাল্টা গুলি তো হলো না। একই সাথে বদি আর কাজীর গুলি শেষ করে দিল বাঁয়ের সৈন্যদের। আমার ঘাড়ের মধ্যে স্বপনের ছোড়া গুলির খালি কার্তুজ এসে পড়ল। গরমে ঘাড়ে ফোস্কা পড়ে গেল। আমি গাড়ি নিয়ে গ্রীন রোডে পড়লাম। ইনডিকেটরে বাঁ দিক দেখিয়ে গাড়ি ঘোরালাম ডান দিকে। মিরপুর রোডের দিকেই। হেডলাইট নেভানো। হঠাৎই রুমী বলল, 'লুক লুক, দেয়ার ইজ আ জিপ, দি বাস্টার্ডস আর ট্রায়িং টু ফলোয়িং আস।'

রুমীকে কোনো নির্দেশ দিতে হলো না। সে নিজেই স্টেনের বাঁট দিয়ে গাড়ির পেছনের কাচ ভেঙে ফেলল। তারপর স্টেন বাড়িয়ে টার্গেট করল জিপের ড্রাইভারকে। তার টার্গেট, উরেব্বাস। জিপটা গিয়ে একটা ল্যাম্পপোস্টের গায়ে ধাক্কা খেল। পেছনে তাকিয়ে রুমীরা দেখল আরো একটা জিপ আর দুটো ট্রাক গ্রীন রোড ধরে ফার্মগেটের দিকে যাচ্ছে। আমরা মিরপুর রোড ধরে এলিফ্যান্ট রোডের দিকে চলে এলাম।"

আলমের বর্ণনা শেষ হলো।

আজাদ আলমের মুখে সব শুনে তার বন্ধুদের সাফল্যে আর সাহসিকতায় মুগ্ধ। বলে, 'ইস্, আমি যে কবে নিজ হাতে পাক আর্মি মারতে পারব। তোরা ভাই হেভি দেখাচ্ছিস।'

৪২

হাবিবুল আলমদের দিলু রোডের বাসাতেই জুয়েল আহত হওয়ার পরের কটা দিন ছিল। ভালোই ছিল। হাবিবুল আলমের বাবা হাফিজুল আলম ইঞ্জিনিয়ার মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যেন মিলেমিশে গেছেন। তিনি নিজেও তাঁর হেরাল্ড ট্রাম্প গাড়িতে করে মুক্তিযোদ্ধাদের আনা-নেওয়া করেছেন। বাড়ির মেয়েরা-আসমা, রেশমা, শাহনাজ-এরাও একেকজন অস্ত্র-এক্সপার্টে পরিণত হয়েছে। রেশমা আর শাহনাজ অস্ত্রের ব্যারেল পরিষ্কার করা, ম্যাগাজিনে গুলি ভরার কাজ এমনভাবে করে যে মনে হয় এটাই তাদের প্রধান কাজ। শাহনাজ আবার শুধু ডান হাত দিয়েই অস্ত্র পরিষ্কার করার কাজটা করে। শাচৌ ব্যাপারটা লক্ষ করেন। আসলে শাহনাজ যখন ছোট, তখন কেমন করে যেন ওর বাঁ হাতে চোট লাগে। ডাক্তাররা ঠিকভাবে হাতটা জোড়া লাগাতে পারেননি বলে ওর বাঁ হাতের সব কটা আঙুল কাজ করে না। জুয়েল যখন তার জখম হওয়া ডান হাত নিয়ে ওই বাসায় যায়, তখন শাহনাজ বলে, 'জুয়েল ভাই, কী আর হবে, সবচেয়ে খারাপ হবে যদি আপনি আমার মতো একহাতি হয়ে যান। কিন্তু আমার দিকে দেখেন, আমি তো সব কাজই ঠিকমতো করছি।' তবে আসমা এ কথা শুনে একটু মন খারাপ করেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রী আসমা। আলমের বন্ধুরা, ছোট-বড় সবাই, তাকে ডাকে মেজপা বলে। কারণ সে আলমের মেজপা। সেপ্টেম্বরে যখন

আসমা সীমান্ত অতিক্রম করে চলে গিয়ে সেক্টর-টুর ফিল্ড হাসপাতালে যোগ দেবে, তখনও বড়-ছোট সব সৈনিক ও যোদ্ধারা তাকে ডাকবে মেজপা বলে। সে-ই জুয়েলের হাত নিয়মিত ড্রেসিং করে দেয়।

জুয়েলের ভালো নাম আবদুল হালিম চৌধুরী। তার বাবা আবদুল ওয়াজেদ চৌধুরী অ্যাকাউনটেন্ট পদে চাকরি করেন একটা বেসরকারি প্রাইভেট ফার্মে। জুয়েলরা চার বোন আর তিন ভাই। এর মধ্যে বড় ভাই মারা গেছে ছোটবেলাতেই। জুয়েলই এখন বড়। '৬৯ সালে সে জগন্নাথ কলেজ থেকে বিএসসি পাস করেছে। এখন চাকরি করে সাত্তার গ্যাস ওয়ার্কে এনালিস্ট কেমিস্ট হিসেবে। ইচ্ছা আছে, দেশ স্বাধীন হলে সে এই বিষয়ে ট্রেনিং নিতে বিদেশে যাবে। তবে তার আসল পরিচয় সে ক্রিকেটার। আজাদ বয়েজে খেলেছে। মোহামেডানে খেলেছে। আজাদ বয়েজ থেকে মোহামেডানে যাওয়ার পেছনেও কারণ ছিল। ১৯৬৭ সালে লন্ডন থেকে এমসিসি দল ঢাকায় খেলতে এলে যে টিম তাদের সঙ্গে খেলতে নেমেছিল, তাতে জুয়েলকে নেওয়া হয়নি। নির্বাচকমণ্ডলীর এই সিদ্ধান্তের পেছনে আজাদ বয়েজের কর্মকর্তাদের হাত আছে ভেবে রাগ করে জুয়েল মোহামেডানে যায়।

নিউজিল্যান্ড টিমের বিরুদ্ধে খেলার জন্যে অল পাকিস্তান দলের ক্যাম্পেও সে ডাক পেয়েছিল। চূড়ান্ত টিমে অবশ্য তার জায়গা হয় নাই। সে ট্রেনিং নিতে আগরতলা বর্ডার অতিক্রম করতে বাসা ছাড়ে ৩১শে মে। বাসার কাউকে কিছু বলে যায়নি।

জুয়েলের মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার পেছনে একটা বড় কারণ ছিল শহীদ ক্রিকেটার মুশতাকের লাশ দর্শন।

২৭শে মার্চ সৈয়দ আশরাফুল হক আর জুয়েল গিয়েছিল ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সামনে মুশতাকের মরদেহ দেখতে। মুশতাকের মরামুখটা জুয়েলের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। একটা মানুষ একটু আগেও ছিল মানুষ, তার কত আশা, কত স্বপ্ন, কত সার্থকতা, এই মুখটাই তো ক্রিকেট খেলত, জয়-পরাজয় নিয়ে কত হিসাব-নিকাশ, কত অধ্যবসায়, আর দ্যাখো এখন সে শুয়ে আছে সবকিছুর অন্য পারে। জুয়েল নীরবে শুধু মাথা নাড়ছিল, দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছিল নিচের ঠোঁট। তখনই সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, একটা কিছু করতে হবে, শুধু শুধু বিনা প্রতিরোধে লাশের কাফেলায় শুয়ে পড়ার কোনো মানে হয় না।

ফার্মগেট অপারেশনের পরে বাসার চার বোনের জন্যে জুয়েলের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দেয়। এ কারণে তাদেরকে সে পাঠিয়ে দিয়েছে গ্রামের বাড়ি বিক্রমপুরে। এখন অবশ্য সে ঝাড়া হাত-পা। মাঝখানে ঝামেলা হলো নিজের ডান হাতের আঙুল জখম হওয়ায়। তার প্রধান চিন্তা, সে কি আর ক্রিকেট খেলতে পারবে? তবে মুখে সে এই কথা কাউকে বলে না। নিজেও হাসিমুখ করে থাকে। সঙ্গীদেরও হাসায়।

ড্রেসিং করার সময় জুয়েল যেন ব্যথা টের না পায়, সেজন্য আসমা জুয়েলের সঙ্গে নানা গল্প করে। এর মধ্যে একটা হলো ক্রিকেট। জুয়েল ঢাকা শহরের ব্যাটিংয়ে তুফান বলে খ্যাত। সে ব্যাট করে ঝড়ের গতিতে। যতক্ষণ সে উইকেটে থাকে, ততক্ষণ রানের চাকা ঘোরে। শুধু ঘোরে না, বনবন করে ঘোরে।

আসমা জিজ্ঞেস করে, 'জুয়েল, রকিবুল হাসান তো অল পাকিস্তান টিমে চান্স পেয়েছে। তুমি পাবে না?'

জুয়েল কিন্তু স্বভাবে জন্মরসিক। 'আরে, আমারে এইবার নিউজিল্যান্ডের এগেইনস্টে নিল না বইলাই তো আমি অল পাকিস্তানই ভাইঙ্গা দিতেছি। দেশটা স্বাধীন হইলে আমরা বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম বানাব। এইটাতে আমি ঠিকই চান্স পাব, দেইখেন মেজপা।'

আসমা বলে, 'তা তো পাবেই। পাকিস্তান টিমেও চান্স পেতে।'

জুয়েল বলে, 'আরে আবার পাকিস্তান। পাকিস্তানকে বোল্ড কইরা দিতেছি। মিডল স্টাম্প আউট। উফ্। ব্যথা লাগে তো।'

আসমা পুরনো তুলাটা সরিয়ে একটা পরিষ্কার তুলা নেয়। জুয়েলের ক্ষতস্থান মুছে দেয় ডেটল-ভেজা তুলা দিয়ে। জুয়েলকে বলে, 'তোমার বাসা না টিকাটুলিতে। বেঙ্গল স্টুডিওর পাশে। নায়িকাদের দেখ না!'

জুয়েল বলে, 'গেটের সামনে পাবলিকে ভিড় কইরা থাকে। একদিন দেখি আজিম-সুজাতা ঢুকতেছে।'

জুয়েল আজিম-সুজাতার ঢোকার দৃশ্যটা মনে করতে না করতেই আসমার ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষ হয়ে আসে।

তো জুয়েল দিলু রোডে ভালোই ছিল। কিন্তু ওখানে একা একা আটকে থাকাটা কতক্ষণ সম্ভব? একটু সিগারেট খাওয়া, একটু কার্ড খেলা-এসব করতে ইচ্ছা করে কিনা! আজাদদের বাসা এদিক থেকে উত্তম।

২৯শে আগস্ট ১৯৭১।

দুপুরবেলা ইব্রাহিম সাবের আসে আজাদদের বাসায়। আজাদের মায়ের রান্না দুপুরে খাওয়াটা তার কাছে একটা দারুণ আনন্দের ব্যাপার বলে মনে হয়।

আজাদদের বাসায় যাতায়াতের রাস্তায় একটা দোকান। তাতে তিনজন যুবক বসে। তারা মাথা বের করে দেখছে কে যায় আজাদদের বাসায়। মনে হয় যেন ফলো করছে। সাবেরকে শুনিয়ে শুনিয়ে তাদের একজন বলে, 'ভৈরব ব্রিজটা পাহারা দিতেছে পাকিস্তানি আর্মিরা, ওই আর্মিগো অ্যাটাক করতে হইলে আমি সাহায্য করতে পারি।' শুনে

ইব্রাহিম সাবেরের সন্দেহ হয়, এরা আর্মির ইনফরমার নয় তো। আজাদদের বাসায় ঢুকে সাবের প্রথমেই আজাদকে বলে, 'দোস্তো, আজকের রাতটা তোরা এখানে থাকিস না।'

আজাদ বলে, 'কেন?'

'দোকানে দেখলাম...'

'আরে না। চোরের মন তো, তাই সবাইকে পুলিশ পুলিশ লাগে।' আজাদ হেসেই উড়িয়ে দেয় কথাটা। দুপুরের খাওয়াটা ভালোই হয় সাবেরের। খেয়েদেয়ে সে বেলাবেলি ফিরে যায় নিজের বাসায়।

জুয়েলের সঙ্গে আর দেখা হয় না সাবেরের। জুয়েল আবার আজকের দুপুরবেলাটা কাটাচ্ছে সৈয়দ আশরাফুল হকের বাসায়।

বিকালবেলা আজাদদের বাসায় কাজী কামাল, বাকি, হ্যারিস, হিউবার্ট রোজারিও - সবাই একসঙ্গে এসেছে। বাকি অনেকক্ষণ ছিল, রাত ৮টার দিকে চলে গেছে। হ্যারিস অবশ্য চলে গেছে খানিকক্ষণ পরই। রোজারিও ইদানীং প্রায়ই রাতে থাকে আজাদদের বাসায়। কিন্তু আজকে রাতে সে থাকবে না। তার মাকে দেখতে নাকি যেতেই হবে। সেও রওনা হয়ে গেছে সন্ধ্যা হওয়ার আগেই। বিকালেই জায়েদ একবার ঢোকে আজাদের ঘরে, আড্ডার মধ্যে রসভঙ্গ করে বলে, 'দাদা, কামরুজ্জামানরে চিনো না। ওই বেটা তো আর্মির দালাল। আজকা কিন্তু খানিক আগে ওই বেটা আইসা বাসার সামনে থাইকা ঘুইরা গেছে। আমার কেমুন সন্দেহ হয়। আইজকা রাইতে এই বাসায় থাকাটা নিরাপদ না।'

'আরে রাখ তো। কামরুজ্জামান। কামরুজ্জামানরে কামান বানায়া দেব। কত কামরুজ্জামান আসল গেল। ওই এমনি ঘোরে। ইস্কাটনের বাসায় তো কাজ করে।' আজাদ পাত্তাই দেয় না জায়েদের কথায়।

'আরে না। ওই বেটা আর্মির ইনফরমার। সবাই জানে'-জায়েদ ঘাড় গোজ করে বলে।

'তরে কইছে সবাই জানে। আজাইরা কথা বলিস না তো ভাগ।' আজাদ তাকে হাত নেড়ে কেটে পড়ার সংকেত দেয়। জায়েদ বেরিয়ে যায়।

জুয়েল চলে আসে আশরাফুল হকদের বাসা থেকে। আশরাফুল তাকে নিষেধ করে, 'যাস না। থাইকা যা।'

জুয়েল বলে, 'আজাদগো বাসায় রাইতে কার্ড খেলা যাইব। আর তা ছাড়া আম্মা আমারে না দেখলে চিন্তা করব।'

জুয়েল আর টগর আবার চাচাতো ভাই। টগররা যেহেতু সাফিয়া বেগমকে আম্মা বলে ডাকে, জুয়েলও তাই ডাকে তাঁকে।

জুয়েল গায়ে শার্ট চাপাতে চাপাতে বলে, 'বদি থাকলে থাকন যাইত এইহানেই।'

আশরাফুল বলে, 'হ, বদি ভাইয়ের ব্যাপারটা বুঝলাম না। দুই দিন ধইরা গায়েব। কই না কই আছে।'

'যাই রে।' জুয়েল বেরিয়ে যায়।

আশরাফুলদের ইস্কাটনের বাসা থেকে আজাদদের মগবাজারের বাসা খুবই কাছে। গলি দিয়ে গলি দিয়েই সহজে জুয়েল পৌঁছে যায় সেখানে।

ওই সময় আড্ডা জমে ওঠে খুব আজাদদের বাসায়।

আজাদ বলে, 'কাজী, শাহাদত ভাই মেলাঘরে গেছে না?'

কাজী কামাল বলে, 'গেছে। আলমও সাথে গেছে।'

'মেজর খালেদ মোশাররফ আর ক্যাপ্টেন হায়দার যখন জিজ্ঞেস করবে, সিদ্ধিরগঞ্জে কী করলা, কী জবাব দেবে!' আজাদ ফোঁড়ন কাটে।

'আছে, জবাব আছে। সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশনের ব্যাপারে একটা প্লান করা হইছে। ওই স্টেশনের দুই কর্মচারী ইব্রাহিম আর শামসুল হককে ট্রেনিং দেওয়া হইতেছে। ট্রেনিং চলতেছে ধানমন্ডি ২ নম্বরের একটা আর্ট গ্যালারিতে। চিনছ তো বাসাটা। ভাস্কর আবদুলাহ খালিদ যেইখানে বসে। ট্রেনিং চলতেছে। এই ধরো টাইম পেন্সিল ব্যবহার করা। পি.কে. ফিট করা। এইসব। ওই গ্যালারিতে তো এখন কেউ যায় না। কেউ বুঝব না'-কাজী কামাল জবাব দেয়।

জুয়েল বলে, 'ওই দুইজনকে তো তোরা খরচের খাতায় ধইরা রাখছস। যদি পাওয়ার স্টেশন উড়ে তাইলেও অগো পাকিস্তানি আর্মি ছাড়ব না।'

কাজী কামাল বলে, 'অরাও জাইনা-শুইনাই আইছে। সাহস আছে। তবে অগো ঢাকার কোনো হাইডআউট, কোনো গেরিলার নাম-ঠিকানা জানানো হয় নাই। খালি আলম, শাচৌ এই রকম একজন-দুইজনের নাম জানে। কওয়া যায় না, সাবধানের মাইর নাই।'

আজাদ বলে, 'তাইলে তো তোর মুখরক্ষা।'

কাজী কামাল বলে, 'ক্যান। ঢাকা শহরটা যে কাঁপায়া দিলাম, মাউড়াগুলানের যে হাঁটুকাঁপা রোগ শুরু হইছে, তার কী হইব। এইটার একটা এপ্রিসিয়েশন দিব না!'

তা অবশ্য দেওয়াই উচিত। ঢাকার চারটা পাওয়ার স্টেশনের দুটো উড়ে গেছে। আলমের দল পিজির পাশে এলিফ্যান্ট রোডের স্টেশন ওড়াতে গিয়ে কাউন্টার অ্যাটাকে পড়ে গিয়ে লড়াই করে বেরিয়ে এসেছে। পাওয়ার স্টেশন ওড়ানোর পরিকল্পনা ব্যর্থ হলেও খালেদ মোশাররফ সবচেয়ে খুশি হন এটার জন্যেই। কারণ পৃথিবীর বহু কাগজে বাংলাদেশ খবর হয়ে আসে : ঢাকায় গেরিলারা স্ট্রিট ফাইটে নেমে পড়েছে। এ ছাড়া স্ট্রিট ফাইট হয়েছে গ্রিন রোডে, উড়ে গেছে ফার্মগেটের আর্মিক্যাম্প। আজিজের দল গ্রিন রোডে

উড়িয়ে দিয়েছে আর্মিবহর। ঢাকার ছেলেরা এখন তুচ্ছ মনে করছে সবকিছুকে। ঢাকাবাসীর মনোবল ফিরে এসেছে। ভয়টা এখন পাকিস্তানি আর্মির। এসব খবর তো খালেদ মোশাররফের অজানা নয়।

এখন রাত ৮টার পরে জমে উঠেছে তাস খেলা। আজাদ, জুয়েল, কাজী কামাল আর সেকেন্দার। জয়েন সেক্রেটারির ছেলে সেকেন্দার এসেছিল টিভি দেখতে। তাসের টানে সে বসে পড়েছে।

মর্নিং নিউজের রিপোর্টার বাশার আসে রাত ৯টার পরে। এসেই এই ঘরে উঁকি দেয়। 'কী ভাই, কেমন চলছে।'

জুয়েল বলে, 'বাশার, তোমাদের মর্নিং নিউজ ফিউজ হইয়া গেছে। বাল্বটা বদলাও।'

বাশার শার্ট খুলতে খুলতে বলে, 'বুঝলাম না।'

জুয়েল বলে, 'তোমরা তো রাজাকারেরও অধম হইয়া গেছ। এত মিথ্যা কথা লেখো কেমনে!'

বাশার বলে, 'পিছন দিয়া বন্দুকের নলা ঢুকায়া দিলে মুখ দিয়া আপনি যা চাইবেন তা-ই বাইর করতে পারবেন।'

জুয়েল বলে, 'মর্নিং নিউজরে একটু নাইট নিউজ বানাইয়া দিতে হইব। দুইটা পাইন অ্যাপেল গড়ায়া দিলেই তো বোঝা যাইব পেন ইজ মাইটার দ্যান সোর্ড, উইকার দ্যান গান।'

'পাইন অ্যাপেল মানে কী? বাশার কও তো!' আজাদ বলে।

'আনারস যে না এটা বুঝি'-বাশার উত্তর দেয়।

'হ্যান্ড গ্রেনেডের নিকনেম-আজাদ জানিয়ে দেয়।'

কাজী কামাল কোনো কথা বলছে না। সে একমনে তার হাতে পাওয়া তাসগুলো পর্যবেক্ষণ করে ক্রমানুসারে সাজিয়ে নিচ্ছে।

জুয়েলের ডান হাতে ব্যান্ডেজ। অন্য হাত দিয়েই সে চমৎকার তাস বাটতে পারে, ধরতে পারে।

আজাদ বলে, 'তুই তো জুয়েল একটা জিনিয়াস। ওয়ান্ডারফুল বয়। এক হাতে কেমন করে শাফল করছিস!'

জুয়েল বলে, 'আরে আমি তো ভাবতেছি এক হাতে ব্যাট চালাব।'

তখন ঘরে নীরবতা নেমে আসে। এত ভালো একটা ক্রিকেটারের তিনটা আঙুল মোটামুটি থেঁতলে গেছে। সে কি আর এ জীবনে ক্রিকেট খেলতে পারবে!

জায়েদ আসে ঘরে। সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘরে ঢোকা মুশকিল। বলে, 'দাদা, ওঠেন। খেলায় বিরতি দ্যান। আম্মা ভাত নিয়া বইসা আছে।'

আজাদ বলে, 'আরেক দান। এই, তোরা খেয়েছিস?'

জায়েদ বলে, 'খাইছি।'

আজাদ বলে, 'টগর, চঞ্চল, কচি, মহুয়া, টিসু-সবাই খেয়েছে?'

'হ।'

'মনোয়ার দুলাভাই খেয়েছে?'

'জি খাইছে।'

তারা আরেক দানের নাম করে তিন-দান খেলে ফেলে। তখন ও-র থেকে মায়ের গলা ভেসে আসে, 'আজাদ, খাবি না তোরা?'

আজাদ বলে, 'মা ডাকছে। এইবার উঠতেই হয়। এই ওঠো।'

খাবার টেবিলটা ছোট। একসঙ্গে ছয়জনের বেশি বসা যায় না। বড় টেবিল যে ফেলা হবে, তার জায়গাই বা কোথায়! বাসাটাই তো ছোট। আগে, ইস্কাটনের বাসায় তাদের ডাইনিং টেবিলে একসঙ্গে ১০ জন বসতে পারত। সেসব দিনের জন্যে সাফিয়া বেগমের মনে কি একটা ছোট্ট গোপন আফসোস রয়ে গেছে? সাফিয়া বেগম তা স্বীকার করবেন না। যুদ্ধ বেধে যাওয়ার পর আজাদও আর টাকা-পয়সা দিতে পারছে না। গয়না বিক্রি করতে হচ্ছে। এখন ঘরের আত্মীয়স্বজন বাদ দিয়েও বাসায় রোজই আজাদের বন্ধুবান্ধব ভিড় করে থাকে। তারা খায়দায়। গাদাগাদি করে এখানেই শোয়। আজাদের মায়ের এটাই ভালো লাগে। লোকজন খাওয়ানোটা তাঁর প্রিয় একটা শখ। আর নিজের ছেলের বন্ধুবান্ধবদের তদারকি করতে পারা, আদর-যত্ন করতে পারাটায় এক ধরনের তৃপ্তি পাওয়া যায়। কলজের মধ্যে এক ধরনের আরাম লাগে।

গতকাল যেমন তিনি মালিবাগ থেকে দাওয়াত করে এনেছেন তার বোন মাবিয়ার মেয়ে দুলু, মেয়ের জামাই মনোয়ার হোসেনকে। তাদের ছোট্ট মেয়ে লীনাটা কেমন ঘুরছে সবার কোলে কোলে। এত রাত হলো, মেয়েটার চোখে ঘুম নাই। রাতের বেলা জন্মালে বাচ্চারা রাতে জেগে থাকে। দুলুর বোন ফুলুও এসেছে বেড়াতে, তারও সঙ্গে আছে তার ছোট্ট মেয়ে বিভা।

টেবিলে পেট বিছিয়ে ভাত-তরকারি বেড়ে আজাদের মা অপেক্ষা করছেন। জুয়েল, আজাদ, কাজী কামাল, সেকেন্দার আসে। বেসিনের কলটা নষ্ট। তিনি একটা গামলা দিয়েছেন টেবিলে। বলেন, 'সবাই গামলায় হাত ধুয়ে নাও।' তিনি পানি এগিয়ে দেন। গামলাটা একজনের সামনে থেকে নিয়ে ধরেন আরেকজনের সামনে। শুধু জুয়েলের হাত ধোয়ার দরকার পড়ে না। তার ডান হাতের তিন আঙুলে ব্যান্ডেজ। সে বাকি দু আঙুলে চামচ দিয়ে তুলে খাবে। মা বলেন, 'বাশার কই বাশার? তুমিও আসো। খেয়ে নাও। ঠান্ডা হয়ে গেলে আর ভালো লাগবে না।' বাশার আসে।

'কী হয়? টিভিতে শাহনাজ বেগমের গান হয় নাকি!' আজাদ বাশারকে খেপানোর চেষ্টা করে।
রান্না হয়েছে গরুর মাংস, আলুভর্তা, পটলভাজা, লাউশাক আর ডাল।
এত অল্প তরকারি দিয়ে ভাত দিতেও সাফিয়ার লজ্জা লজ্জা লাগে। কিন্তু কিছুই করার নাই। একে তো আয় বুঝে ব্যয় করতে হয়, তার ওপর মাছ খাওয়া বন্ধ। দেশের সব নদীতে এখন শুধু মানুষের লাশ ভাসে। মানুষের লাশ ঠুকরে খেয়ে খেয়ে মাছগুলো হচ্ছেও বেশ নধরকান্তি। মাছ খেলে কলেরা না হয়েই যায় না। তাই মাছ খাওয়া সবাই বন্ধ করে দিয়েছে। তার ওপর গতকাল মনোয়ার জামাইয়ের আগমন উপলক্ষে ভালো খাবারের আয়োজন ছিল।
সবাই খেতে বসেছে। জুয়েল ছেলেটা সব সময় রসিকতা করতে পছন্দ করে। সে বলে, 'আম্মা, আপনি নিজে রানছেন!'
'হ্যাঁ বাবা।'
'আর কত দিন কষ্ট করবেন আম্মা। আজাদরে একটা বিয়াশাদি দ্যান। বউয়ের হাতের সেবাযত্ন খান।'
'দ্যাখো, তোমরা পাত্রী দ্যাখো। বিয়ে তো দিতেই হবে।' মা যে একটা মেয়ে ঠিক করে রেখেছেন, এটা আর বলেন না।
'তা আম্মা যৌতুক হিসাবে কী নিবেন? ডিম্যান্ড কী?'
'না না। ছেলে বিক্রি করতে পারব না।'
'না। এই যুদ্ধের বাজারে এই কথা কইবেনই না। আপনার ডিম্যান্ড না থাকতে পারে। আমাদের আছে। ছেলেকে একটা অন্তত এলএমজি আর চারটা ম্যাগাজিন আর ২ হাজার রাউন্ডগুলি দিতে হইব।'
বাশার বলে, 'একেবারে ট্যাঙ্ক ডিম্যান্ড করো। ট্যাঙ্ক চাইলে পিস্তল পেতেও পারো।'
খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সবাই ওঠে। মা গামছা পর্যন্ত এগিয়ে দেন।
তারা সবাই আবার আজাদের ঘরে গিয়ে ঢোকে। মা বলেন, 'পানের অভ্যাস থাকলে বলো। পান দিতে পারি।'
বাশার বলে, 'দ্যান। যার লাগে সে খাবে।'
তারা ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে আবার আজাদের ঘরে আসে।
বাশার বলে, 'ঘরে সিগারেট আছে? রাতে লাগবে না? আজাদ চলো, সিগারেট আনি!'
আজাদ বলে, 'জায়েদরে দিয়া আনাই।'
বাশার বলে, 'আরে চলো না। তোমার সাথে কথা আছে।'

আজাদ আর বাশার ঘর থেকে বের হয়। এরই মধ্যে রাস্তাঘাট সব ফাঁকা হয়ে পড়েছে। হওয়ারই কথা। গেরিলারা প্রায় প্রতিদিনই ঢাকার নানা জায়গায় নানা অপারেশন চালাচ্ছে। গাড়ির চাকার নিচে ছোট ছোট মাইন পুঁতে গাড়ির চাকা সশব্দে বার্স্ট করা থেকে শুরু করে একেবারে সুসজ্জিত আর্মি শিবিরে হামলা করা পর্যন্ত। আর মিলিটারিও হয়ে পড়েছে পাগলা কুকুরের মতো। কখন যে কাকে ধরে নিয়ে যাবে, তার ঠিক নাই। তার ওপর কারফিউ।
বাশার বলে, 'শোনো, মিলি নাকি দেশে ফিরেছে।'
মিলির কথায় আজাদের বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে। হাত-পা অবশ হয়ে যায়। সে অতি কষ্টে স্বাভাবিক থাকার ভঙ্গি করে বলে, 'তাতে আমার কী!'
'আছে। তোমারও কিছু আছে। মিলির আসলে বিয়ে হয়নি। তোমার কাছ থেকে দূরে রাখার জন্য মিথ্যা কথা বলেছিল।'
'বলো কি!'
'দেশে এসেছে'-বাশার একটু ভাবগম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করে।
'তুমি কেমন করে জানলা!'
'জানলাম। খবরের কাগজে চাকরি করি। সব খবরই রাখতে হয়। তবে আরেকটা অসমর্থিত সূত্রের খবর, মিলির ডিভোর্স হয়ে গেছে।'
'তার মানে বিয়া হইছিল।'
'হ্যাঁ। তার ইচ্ছার এগেইনস্টে।'
'তুমি এটা কী শোনাচ্ছ। আমার তো হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসতেছে। বাট আই জাস্ট ক্যাননট বিলিভ দিস নিউজ অ্যাটঅল।'
'ওকে। উই ক্যান চেক ইট।'
'পুরানা পল্টনে বাসা। চেক তো করাই যায়। তুমি যাবা। তোমার সাথে তো আর কোনো সমস্যা নাই।'
'ঠিক আছে যাব।'
'তুমি আমারটা খোঁজখবর করো। আমি তোমারটা দেখছি। তোমাকে আর কষ্ট করে পাত্রী খুঁজতে হবে না। পাত্রী আমাদের বাসা থেকেই বের করে ফেলব।'
বাশার লজ্জা পায়। গলির ভেতরে একটা হোটেলের মধ্যে একটামাত্র দোকান আছে। দোকানটা বাইরে থেকে বন্ধই থাকে। তবে টুক টুক করে টোকা দিলে একটা ছোট্ট জানালা খুলে যায়। টাকা দিলে সিগারেট বেরোয়। এখানেই কেবল রাত্রিবেলা সিগারেট পাওয়া যায়। বেনসন অ্যান্ড হেজেস-এর প্যাকেট কেনে আজাদ।

সিগারেট জ্বালিয়ে টানতে টানতে ফিরে আসে। রাস্তায় শুধু কুকুর। গলির মুখটা অন্ধকার। আকাশে পোয়াখানেক চাঁদও দেখা যাচ্ছে। নিজেকে কেমন তুচ্ছ, সামান্য লাগে আজাদের। সে আরো জোরে সিগারেটে টান দেয়। মনে হচ্ছে সিগারেটের মুখের আগুন নটুকুকে সে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিতে চায়। অন্ধকারে প্রতিটা টানে তার মুখে লাল আভা পড়ে।

মহুয়া, কচি, দুলু, ফুলু, আজাদের খালাতো বোনেরা, আর আজাদের মা এক ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মহুয়ার কোলের কাছে তার অল্পদিন আগে জন্ম নেওয়া মেয়ে। দুলু, ফুলুর সঙ্গেও তাদের ছোট বাচ্চারা। এর মধ্যে বালিকা কচির ঘুম ভেঙে যায় কিসের যেন শব্দে। সে দেখতে পায়, ঘরে আলো। আর আলোর মধ্যে সে দেখতে পায়, চোখে সুরমা, ফরসা, যেন চাঁদের আলো দিয়ে তার দেহ গড়া, লম্বা, স্বাস্থ্যবান এক যুবক, যেন রাজপুত্র, বিছানার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। সে মহুয়াকে ধাক্কা দেয়, বলে, 'বুজি দ্যাখো, কী সুন্দর' সে বুঝতে পারে না সে স্বপ্ন দেখছে নাকি এই দৃশ্য বাস্তবে ঘটছে। মহুয়ার ঘুম ভেঙে যায়, সে ঘরের মধ্যে মিলিটারি দেখে ভয়ে কুঁকড়ে যায় আর কচির মুখ চেপে ধরে। তারও আগে নিঃশব্দ আততায়ীর মতো পাকিস্তানি সৈন্যরা এসে ৩৯ মগবাজারের বাসাটা, হাজি মনিরুদ্দিন ভিলা, ঘিরে ফেলে। তারা দরজায় সজোরে ধাক্কা দিতে থাকে। তখন আজাদের ঘরে জুয়েল বিছানায় শোয়া। কাজী কামালের পিস্তলটা, যেটা মেজর নুরুল ইসলাম শিশু তাকে দিয়েছিল, জুয়েলের কাছে। এটার প্রতি তার লোভ ছিল। বিকালেই কাজী কামাল বলেছে, 'থাকুক, পিস্তলটা তোর কাছেই থাকুক।' সেটাকে সে বিছানার ওপরেই রেখে শুয়েছিল। নিচে পাটিতে বসে তাস খেলছে কাজী কামাল, আজাদ, সেকেন্দার আর বাশার। ভাদ্রের মাসের রাত, ভাপসা গরম। কাজী কামালের পরনে একটা লুঙ্গি মাত্র, শরীরে আর কিছু নাই। মাথার ওপরে ফ্যান ঘুরছে। আজাদের খালাতো ভাইরা, জায়েদ, টগর, চঞ্চল, টিসু আর খালাতো দুলাভাই মনোয়ার হোসেন শুয়েছে আরেক ঘরে। দরজায় আঘাতটা বেড়েই চলেছে। আজাদরা তখন হকচকিত। জায়েদের ঘুম ভেঙে যায়। সে ভাবে, শব্দ হয় কেন? মাথা তুলে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে দাদাদের রুমে এখনও আলো জ্বলছে। দরজায় আবার প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা। জায়েদ বিছানা ছাড়ে। দাদারা জেগে আছে, দরজা খোলে না কেন? উঠে জানালার পর্দাটা ফাঁক করে জায়েদ, তখন তার বয়স সতেরোর মতো, বাইরে তাকায়, দেখতে পায়, সাক্ষাৎ সর্বনাশ বাইরে দাঁড়িয়ে। জায়েদ কী করবে বুঝতে পারে না। পাশের ঘরে যায়, দেখে আম্মা সবাইকে নিয়ে কই লুকাবেন কী করবেন বুঝতে পারছেন না। আর জুয়েলের পিস্তলটা আলুর বস্তার পেছনে ফেলা হচ্ছে। জায়েদের একটা গোপন দরজা আছে, মেথরদের আসার চোরা রাস্তা। ওই রাস্তা দিয়ে সে অনেকবার অস্ত্র নিয়ে পৌঁছে দিয়েছে আলমদের দিলু রোডের বাড়িতে। ওই দরজা খুলে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে সে পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু সামনে যমদূতের মতো খাড়া হয়ে আছে পাকিস্তানি আর্মি। হ্যান্ডস আপ। জায়েদ হাত উঁচু করে। দরজা খোলা পেয়ে জায়েদকে বন্দুকের মুখে ঠেলে ভেতরে নিয়ে আসে সৈন্যরা। এসে সামনের দরজা খুলে দেয়। একে একে ঢুকে যায় বেশ কজন। একজন কমান্ডো ধরনের। তার বুকে লেখা : মেজর সরফরাজ। একজনের বুকে লেখা : ক্যাপ্টেন বুখারি। ক্যাপ্টেন বুখারির হাতে স্টেনগান।

সৈন্যরা এসেই বলে, 'আজাদ কোন হ্যায়।'

কেউ স্বীকার করে না।

আজাদকে ওরা জিজ্ঞাসা করে, 'তুমারা নাম কিয়া?'

আজাদ বলে, 'মাগফার আহমেদ চৌধুরী হ্যায়।'

কম্যান্ডো ধরনের লোকটা বলে, 'তুম আজাদ হ্যায়।'

'মে আজাদ নেহি হ্যায়।'

'শালা মাদারচোত, তুম নাম কিউ নিদানা হ্যায়।' সে আজাদের ঘাড়ে প্রচণ্ড জোরে একটা ঘুসি মারে।

ইতিমধ্যে অন্য ঘর থেকে টগর, চঞ্চল, মনোয়ারকেও এনে একপাশে লাইনে দাঁড় করানো হয়েছে। মোট আটজন বাঙালি বিভিন্ন বয়সের পুরুষ এখানে বলির পাঁঠার মতো লাইনে দাঁড়িয়ে আছে, কাজী কামাল খেয়াল করে। আজাদ, জুয়েল, বাশার, সেকেন্দার, মনোয়ার হোসেন, জায়েদ, টগর, চঞ্চল। কাজী কামালের মনে হয়, তাকে ল্যান্স নায়েক নুরুল ইসলাম সব সময় বলেছে, 'স্যার, দুইজন সেন্ট্রি দাঁড় করায়া রাখেন। এইভাবে সেন্ট্রি ছাড়া আপনারা থাকেন। কোন দিন জানি বিপদে পড়েন।' ইস্, দুইজন গার্ড যদি বাইরে দাঁড় করানো থাকত, পজিশন নেওয়ার সময় পেলে ওদের গুলি করেই উড়িয়ে দেওয়া যেত। এভাবে বিনা চ্যালেঞ্জে মরতে হতো না।

'আর্মস কিধার হ্যায়?' বুখারি নির্দেশ দিচ্ছে। স্টিলের একটা আলমারি আছে ঘরে। আজাদের মা আঁচল থেকে চাবি খুলে দিলে একজন সৈন্য আলমারি খোলে। সবাই আগ্রহভরে অস্ত্র খুঁজছে।

হঠাৎই ক্যাপ্টেন বুখারি লক্ষ করে, একটা ছেলের হাতের আঙুলে ব্যান্ডেজ দেখা যায়। সে জুয়েলের জখমি জায়গাটা চেপে ধর বলে, 'বাস্টার্ড, হয়ার আর দি আর্মস?'

ব্যথায় জুয়েল 'ও মাগো' বলে কুঁকিয়ে ওঠে। কাজী কামালের মাথায় রক্ত উঠে যায়। সে নিজের ডান হাতের দিকে তাকিয়ে দেখে, আয়ুরেখা বড় আর স্পষ্ট। তার মানে এখানে তার মরণ নাই। সে হঠাৎই মেজরের হাতের স্টেনগানটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে দু হাতে

স্টেন ধরে ফেলে। মুহূর্তের মধ্যে এ কাণ্ড ঘটে যায়। স্টেনের দখল কে নেবে এই নিয়ে টানাটানি হতে থাকে। ট্রিগারে কাজীর হাত। গুলি বেরুতে থাকে। রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে যায় গুলির শব্দে। কাজীর পরনের একমাত্র বস্ত্র লুঙ্গিটা ধস্তাধস্তিতে যায় খুলে। ক্যাপ্টেন আর কাজী দুজনেই খাটে পড়ে গেলে খাট ভেঙে পড়ে যায় মেঝেতে। ক্যাপ্টেন আহত হয়ে মেঝেতে গড়ায়। স্টিলের আলমারির সামনের সৈন্যটা গুলিবিদ্ধ হয় আর পড়ে যায়। ওপাশে মেজর সরফরাজ ফায়ার ওপেন করলে জায়েদ আর টগর গুলিবিদ্ধ হয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে। কাজী জানে এখানে ধরা পড়ার মানে হলো মৃত্যু। সে সোজা খোলা দরজা দিয়ে বাইরে আসে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ কাজী গেট দিয়ে বাইরে যায়। বাইরে বাউন্ডারি দেয়ালের কাছে দুপাশে দুজন সৈন্য দাঁড়িয়ে। চাঁদের আলোয় এক নগ্ন লম্বা ফরসা যুবককে দেখে তারা মুহূর্তের জন্য বিভ্রান্ত হয় হয়তো। নইলে কেন তারা তাকে চার্জ করেনি, ১৪ বছর পরও কাজী সেটা অনুমান করতে পারে না। কাজী একদৌড়ে বেরিয়ে রেললাইন ধরে সোজা দিলু রোডে চলে যায়।

রক্তে ভেসে যাচ্ছে মেঝে। জায়েদ আর টগর বুঝি মারাই গেছে। তিনজন মিলিটারিও রক্তাক্ত। আরো মিলিটারি প্রবেশ করে ঘরে। তারা আজাদ, জুয়েল, বাশার, মনোয়ার, সেকেন্দার আর চঞ্চলকে ধরে নিয়ে প্রচণ্ড মার দিতে দিতে গাড়ির দিকে চলে যায়। আজাদের মুখ দিয়ে রক্ত ঝরতে তাকে, বাশারের হাত ভেঙে যায়, জুয়েলেরও নাকমুখ দিয়ে রক্ত ঝরে।

আজাদের মা দেখেন তাঁর চোখের সামনে থেকে তাঁর ছেলে চলে যাচ্ছে। তিনি কেঁদে ফেলেন। আর্তনাদের সুরে বলেন, 'আজাদ, তুই চলে গেলে আমি কাকে নিয়ে থাকব।' আজাদ বলে, 'আলাহ আলাহ করো মা।' আরেক দফা মার তার ঘাড়ে এসে পড়লে সে সেটা সহ্য করে শেষবারের মতো তার মায়ের দিকে তাকায়।

চঞ্চল তখন খুবই ছোট। নিতান্তই বালক। তাকে কেন আর্মি ধরে নিয়ে গাড়িতে তুলছে। সে তো যুদ্ধ করেনি। কোনো পক্ষ-বিপক্ষ বোঝেও না। সৈন্যরা তার পেটে ঘুসি মারছে আর বলছে, 'বাতাও, হাতিয়ার কিধার হ্যায়', সে চিৎকার করে বলছে, 'হাম বেকসুর হ্যায়, হাম বেগু না (নিষ্পাপ) হ্যায়।' আজাদের মা দৌড়ে যান গাড়ির কাছে, ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে আসেন চঞ্চলকে।

গুলিবিদ্ধ, আহত অথবা নিহত তিন পাকিস্তানি সৈন্যকে ওরা একটা গাড়িতে তোলে। বন্দি সবাইকে গাড়িতে তুলে নিয়ে পাকসেনারা বিদায় হলে হঠাৎ করেই পুরো পাড়া নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে।

টগরের আজও মনে পড়ে, ঘটনার ১৪ বছর পরও, যখন গুলি এসে লাগল তার পেটে, তার মনে হচ্ছিল, যেন লক্ষ লক্ষ বেড ঢুকে যাচ্ছে পেটের ভেতরে, এত যন্ত্রণা, আর মনে হচ্ছে, তার বুকের ভেতরটা মরুভূমি হয়ে গেছে, তার পানি চাই, এত তৃষ্ণা যেন কলসের পরে কলস পানি খেলেও তার পিপাসা মিটবে না, সে চিৎকার করছে, 'আম্মা পানি, আম্মা পানি...' তখন লক্ষ লক্ষ পাখি ছেয়ে ফেলে তার আকাশটা, তারা একযোগে মুখর হয়ে ওঠে পানি পানি বলে, আর আজাদের মা এসে ঢোকেন ঘরে।

তিনি আজাদের ঘরের মেঝের দিকে তাকিয়ে দেখেন শুধু রক্ত আর রক্ত। যেন রক্তের পুকুরে ভেসে আছে জায়েদ আর টগর। তারই মধ্যে রক্তের মধ্যে বসে আপন মনে খেলছে মনোয়ার হোসেন ও দুলুর ছোট্ট মেয়ে লীনা, যে কিনা কেবল হামাগুড়ি দিতে শিখেছে। কে কার দিকে খেয়াল করে, এ এমন এক দুর্যোগময় মুহূর্ত। আজাদের মা দৌড়ে জগ নিয়ে আসেন। পানি ঢালেন টগরের মুখে। টগর পানি খেয়ে বলে, 'পানি, আম্মা পানি...' আর পাখিরা ডেকে ওঠে আম্মা পানি, আম্মা পানি, বলে...

জায়েদ বেঁচে আছে, নাকি মারা গেছে কে জানে! টগরের লক্ষণও তো সুবিধার মনে হচ্ছে না, এও বুঝি মারা যাবে। আজাদের মা ধপাস করে পড়ে যান, জ্ঞান হারান। তাঁর ভাগ্নিরা তাঁর মাথায় পানি ঢেলে তাঁকে সুস্থ করে তুললে তিনি উঠে কর্তব্য স্থির করেন।

টগর আর জায়েদকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। তিনি পাশের বাসায় গিয়ে হাজির হন, যেখানে টেলিফোন আছে। পাশের বাসায় থাকতেন একজন মাড়োয়ারি মহিলা। মা মাড়োয়ারির বাসার দরজায় ধাক্কা দেন। কিন্তু মহিলা দরজা খোলে না। মা জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখেন মহিলা কোরআন শরিফ নিয়ে বসেছে। তিনি আরেকবার ধাক্কা দেন। মহিলা কোরান শরিফ থেকে মুখ তোলে না। মা জানালার ধারে দাঁড়িয়েই থাকেন। মহিলা কোরআন শরিফ পড়েই চলেন। মহূর্ত মুহূর্ত করে ঘণ্টা চলে যায়। মহিলা কোরআন শরিফ থেকে চোখ সরায় না। আজাদের মাও জানালা থেকে সরেন না। ফজরের আজানের ধ্বনি শোনা যায়। মহিলা মুখ তোলে। আজাদের মা বলেন, 'বুবু দরজা খোলেন। একটা ফোন করব।'

তখন একা বাসায় তিনটা মেয়ে, তার মধ্যে কচি ভাবে, তার স্বপ্নের রাজপুত্ররা ঘরে ঢুকে এ কোন রক্তের খেলা খেলে গেল। তাহলে ওরা কি রাজপুত্র ছিল না, ছিল রাজপুত্রের ছদ্মবেশে দুষ্ট রাক্ষস!

৪৩

কাজী কামাল দৌড়াচ্ছে। রেললাইন ধরে। বড় রাস্তা পেরিয়ে সে ঢুকে পড়ে দিলু রোডের দিকে। সোজা চলে যায় হাবিবুল আলমদের বাসায়। আলমদের নিচতলার জানালার কাচে টুক টুক করে শব্দ করে। ঘুম ভেঙে যায় আসমার। সে জানালার কাছে এসে জানতে চায়, 'কে?' কাজী কামাল, সম্পূর্ণ জন্মদিনের পোশাকপরা, বলে, 'একটা লুঙ্গি দ্যান আগে। অবস্থা খারাপ। আজাদের বাসা আর্মি রেইড করছে। আমি স্টেন কাইড়া নিয়া গুলি কইরা পালায়া আসছি।' আসমা তাকে একটা পেটিকোট জানালা দিয়ে ছুড়ে দেয়। তারপর তারা দরজা খোলে। কাজী বলে রেশমাকে, 'একটা হাতিয়ার দাও। আর তোমরা সবাই পালাও। এই বাড়িতেও আর্মি শিয়োর আসবে।'

হাফিজুল আলম, আলমের বাবা, বলেন, 'কাজী, তুমি পালাও। এখন আর অস্ত্র নেওয়ার দরকার নাই। আর আমরা দেখি নিজেরা কী করতে পারি।' কাজীকে ওরা ধাক্কা দিয়ে পেছনের দেয়াল পার করিয়ে দেন। হাফিজুল আলমকেও তাঁর মেয়েরা পাশের বাড়ির দেয়ালের ওপারে ঠেলে পাঠায়। কাজী ইস্কাটনের রাস্তায় আসতেই দেখে দুটো ট্রাক আর একটা জিপ দিলু রোডে আলমের বাড়ির দিকেই যাচ্ছে। কাজী পাশের ড্রেনের মধ্যে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে। জায়গাটা অন্ধকার। তাকে হয়তো দেখা যাবে না। কনভয় পাশ দিয়ে পার হয়ে যায়। গাড়ির শব্দের চেয়ে কাজীর বুকের শব্দ যেন আরো জোরে জোরে বাজে। সেখান থেকে সে যায় সৈয়দ আশরাফুল হকের বাড়িতে। দরজায় নক করে। আশরাফুলের ঘুম ভেঙে যায়। সে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলে, 'কে?'

'বাবু, শেষ শেষ, সব শেষ...' কাজী কামালের গলা। আশরাফুল দেখতে পায় গেটের লাইটের আলোয় খালিগা, পেটিকোট পরা কাজীকে।

সে দরজা খোলে। 'কী হইছে?'

'আজাদগো বাড়ি রেইড দিছে। আলমগো বাড়িও ঘেরাও দেওয়া শেষ। সব শেষ। সব শেষ...' কাজী কাঁপছে।

আশরাফুল তাকে নিয়ে লুকিয়ে রাখে গ্যারাজের ওপরে ড্রাইভারদের থাকবার জায়গায়, বলে, 'এইখানে বইসা থাকো। খাড়াও, তোমারে শার্ট-প্যান্ট আইনা দেই।'

পরে সেই জায়গাটাও নিরাপদ মনে না হওয়ায় কাজী বেরিয়ে পড়ে-এখন যেখানে সোহাগ কমিউনিটি সেন্টার সেখানে-আশরাফুলের বড় ভাইয়ের বাসার উদ্দেশে। তখন ভোর ৫টা। আশরাফুল তার এই চলে যাওয়ার দৃশ্যটা আর কোনো দিন ভুলতে পারবে না। আশরাফুলের দেওয়া শার্ট-প্যান্ট পরে কাজী কামাল দরজা খুলে বেরিয়ে যায়, পেছনে তাকিয়ে হ্যা-হ্যা করে হাসে আর হাত নাড়ে, 'টাটা টাটা, যাইগা...টাটা...'

সৈন্যরা আলমদের বাসায় ঢুকে প্রথমেই জানতে চায় রান্নাঘর কোথায়, রান্নাঘরের মেঝের নিচে গোপন কুঠুরিতে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ লুকানো ছিল। শাবল দিয়ে মেঝে ভেঙে তারা এইসব অস্ত্র উদ্ধার করে। আর বাসায় বেড়াতে আসা আলমের চাচা আর চাচাতো ভাইকে ধরে নিয়ে যায়।

২৯শে আগস্টের সকাল ১১টার দিকে বদি ধরা পড়ে ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল জালাল উদ্দিনের বাসা থেকে। প্রিন্সিপ্যালের ছেলে ফরিদ ছিল বদির বন্ধু। প্রচণ্ড মারের মুখে বদি বলে দেয় সামাদ ভাই আর চুলু-ভাইয়ের নাম। বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে ধরা পড়েন সামাদ ভাই। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অমানুষিক নির্যাতন আর জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়েন সামাদ ভাই, আলতাফ মাহমুদের বাসা চিনিয়ে দিতে সৈন্যরা তাকেই বাধ্য করে সহ্যাতীত নির্যাতনের মুখে।

৩০শে আগস্টের ভোর। রাজারবাগের বাসায় শিমুল বিল্লাহর মা তখনও ফজরের নামাজ শেষে জায়নামাজে বসে তসবিহ গুনছেন। শিমুল বিল্লাহ, তখন কিশোরী, সকালের রেওয়াজ করছে। শিমুল দেখতে পায়, তাদের বাড়ি ঘিরে ফেলেছে পাকিস্তানি সৈন্যরা। সে দৌড়ে তার মায়ের কাছে যায়, মা মোনাজাত করছেন। পাকসেনারা নেটের দরজা ভেঙে ফেলে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে। তাদের একজন শিমুলের বুক বরাবর অস্ত্র উঁচিয়ে ধরলে শিমুল তারস্বরে চিৎকার করে ওঠে, আর বাড়ির চারদিকে এক দল কাক কা কা রবে ডেকে উঠে পাখার ঝাপ্টায় আকাশ মাতায়। সৈন্যরা ধাতবস্বরে বলে ওঠে, 'মিউজিক ডিরেক্টর সাব কৌন হ্যায়? কিধার হ্যায়?' তখন, চাল ধোয়া পানির মতো ভোরের পবিত্র আলো সত্তায় মেখে দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসেন আলতাফ মাহমুদ : 'আমি।'

'হয়্যার আর দি আর্মস অ্যান্ড এম্যুনিশেনস? হাতিয়ার কিধার হ্যায়?'

আলতাফ মাহমুদ বুঝতে পারেন, তারা সবকিছু জেনেই এসেছে। তিনি বুঝতে পারেন, এ বাড়ির আর সবাইকে বাঁচাতে হলে সবকিছুর দায়দায়িত্ব তাঁকেই নিতে হবে, যা কিছু তিনি একজীবনে আর একাত্তরের মার্চের পরে করেছেন। তিনি সুর দিয়েছেন আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি গানে, যুক্ত ছিলেন বাম রাজনীতির সঙ্গে, তিনি ২৫ মার্চের রাতে প্রত্যক্ষ করেছেন কীভাবে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা পুলিশ ব্যারাকে হামলা চালিয়েছে, আগুন লাগিয়েছে, বাঙালি পুলিশ কীভাবে পাক-আক্রমণ প্রতিরোধ করতে চেয়েছে শুধু রাইফেল দিয়ে, বাঙালি পুলিশেরা পজিশন নিয়েছিল তাদের আর পড়শিদের বাসার ছাদেও, ভোরে টিকতে না পেরে চলে গেছে অস্ত্র আর ইউনিফর্ম ফেলে, সেই অস্ত্র আলতাফ মাহমুদ তুলে দিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে। শাহাদত চৌধুরী মেলাঘর থেকে জুলাইয়ে এসেছে তাঁর কাছে, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জন্য গান

রেকর্ড করে তার টেপ নিয়ে যাওয়ার জন্যে, তাঁর কাছে এসেছে মুক্তিযোদ্ধা গাজী দস্তগীর, ঢাকায় মেলাঘর থেকে খালেদ মোশাররফ আর হায়দার যে ১৭ জনকে পাঠিয়েছিলেন হাবিবুল আলমের নেতৃত্বে , তাদেরই একজন এই দস্তগীর। সামাদ ভাই অনেকবার এসেছে তাঁর কাছে। শাচৌ পূর্বপরিচিত আলতাফ মাহমুদের, যুদ্ধের মধ্যে একদিন রাস্তা থেকে আলতাফ মাহমুদ ধরে আনেন শাচৌ আর আলমকে। তিনি নিজেই যুক্ত হয়ে পড়েন মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে। তাঁর বাড়ি হয়ে ওঠে ঢাকার যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের আরেকটা দুর্গ। ফতেহ আর বাকেরও এসেছে। অস্ত্র রাখতে হবে, এ প্রস্তাব শুনে আলতাফ মাহমুদ নিজে গাড়ি চালিয়ে গাড়ির বুটে করে নিয়ে এসেছেন দু ট্রাঙ্ক অস্ত্র, সেগুলো পুঁতে রাখা হয়েছে তাঁদের পড়শির বাসার পেছনের লেবুগাছটার নিচে আঙিনায়, মুক্তিযোদ্ধাদের দেখলেই তিনি খুশি হতেন, বলতেন, 'আমার যা সাহায্য লাগবে তোমরা আমাকে বলবে, আমি অবশ্যই করব।'

তিনি পাকিস্তানি সৈন্যদের বলেন, 'তোমরা কেন এসেছ, আমি বুঝতে পারছি। আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। এসো। এই গাছের নিচে আছে দুটো ট্রাঙ্ক।'

সৈন্যরা তাঁর হাতেই তুলে দেয় কোদাল, একা আলতাফ মাহমুদ খুঁড়তে থাকেন মাটি, কিন্তু তিনি ক্লান্তি বা অনিচ্ছা বোধ করছিলেন, একজন সৈন্য রাইফেলের বাঁট দিয়ে তার মুখে আঘাত করে, তার একটা দাঁত ভেঙে মাটিতে পড়ে যায়, তিনি আবার খুঁড়ে চলেন উঠোন, একজন পাকিস্তানি সৈন্য বেয়নেট চার্জ করলে আলতাফ মাহমুদের কপালের চামড়া কেটে গিয়ে তার চোখের ওপরে ঝুলতে থাকে।

দুই ট্রাঙ্ক অস্ত্র উদ্ধার করে আলতাফ মাহমুদ, তাঁর শ্যালক নুহেল, খনু, লিনু, দিনু বিলাহ আর আগের রাতে বেড়াতে এসে কারফিউয়ের ফাঁদে আটকে পড়া মুক্তিযোদ্ধা-শিল্পী আবুল বারক আলভীকে, আর যন্ত্রশিল্পী হাফিজকে, আরো দুজন পড়শিকে ধরে নিয়ে গাড়িতে তোলে মিলিটারিরা, তখন প্রতিবাদে ভীষণ কান্না জুড়ে দেয় আলতাফ মাহমুদের চার বছরের কন্যা শাওন। বাড়ির চারপাশের গাছাছালির ডাল থেকে কাকগুলো আকাশে চক্কর দিতে থাকে আর কা কা রবে পুনর্বার ডেকে ওঠে তারস্বরে।

একই রাতে, ২১টা বাসায় হানা দেয় পাকিস্তানি মিলিটারি। বদি আর সামাদ ভাইয়ের গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে ২৯শে আগস্ট বিকালেই মুক্তিযোদ্ধা উলফত চক্কর মেরে ঘুরতে থাকে বিভিন্ন হাইড আউটে, সে বেবিট্যাক্সিতে চড়ে যায় শাহাদত চৌধুরীদের ৩০ হাটখোলার বাসায়, শাচৌ বাড়ি নাই, গতকালই চলে গেছেন মেলাঘর, তাঁর ভাই মুক্তিযোদ্ধা ফতেহকে উলফত পেয়ে যায় গেটের কাছেই, দ্রুত তাকে জানিয়ে দেয় দুঃসংবাদ, রেইড আসন্ন। এই বাড়িটা মুক্তিযোদ্ধাদের একটা অন্যতম আশ্রয়স্থল, একটা দুর্গ, শাচৌ ফতেহর তিন বোন মারিয়াম, ঝিমলি আর ডানা আর তাঁদের বাবা-মা অস্ত্রশস্ত্র রাখা, মুক্তিযোদ্ধাদের দেখভাল করার কাজটা এমনভাবে করতেন যে তাঁরা নিজেরাই হয়ে উঠেছিলেন একেকজন নীরব মুক্তিযোদ্ধা। উলফতের কাছে খবর পেয়ে তার আনা বেবিট্যাক্সিতে চড়েই ফতেহ আর তিন বোন চলে যায় তাদের আরেক বোনের বাসায়। শাহাদত আর ফতেহ চৌধুরীর বাবা অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ আব্দুল হক চৌধুরীর অভ্যাস ছিল রাত ১২টা পর্যন্ত কোরআন শরিফ পাঠ, সেদিন তিনি আর জায়নামাজ থেকে ওঠেন না। পাকিস্তানি আর্মি তাঁর বাসায় হানা দেয় রাত ২টায়। তারা তাঁর কাছে তাঁর পরিচয় জানতে চায়। চৌধুরী সাহেব জানান, তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ। তখন আর্মি অফিসার তাঁকে স্যালুট করে। জিজ্ঞেস করে, 'আপনার ছেলেরা কোথায়?'

তিনি বলেন, 'জানি না।'

'তারা কি ভারতে গেছে?'

'যেতেও পারে।'

'যুদ্ধে গেছে?'

'আমার জানামতে গ্রামে গেছে থাকতে। তবে যুদ্ধে গেলে যেতেও পারে। আমি তাদের সিকিউরিটি দিতে পারব না, তাই তাদের আটকে রাখতেও পারি না।'

অফিসারটি বিস্মিত হয়ে চৌধুরী সাহেবের দিকে তাকিয়ে থাকেন, তারপর বলেন, 'আপনার কথা আমি আমার ওপরের অফিসারকে জানাব।'

আর রাত ২টায় বাসা ঘেরাও করে কাউকে না পেয়ে বাড়ির জামাতা করাচি থেকে বেড়াতে আসা বেলায়েত হোসেন চৌধুরীকে ধরে নিয়ে যায় পাকবাহিনী।

ধানমন্ডি ২৮-এর আশ্রয়স্থলটাও তলাশির আওতায় পড়ে, কাউকে না পেয়ে মালি জামানকে প্রচণ্ড মারধর করে আর্মিরা। রাত ২টায় হানা দেয় চুলু-ভাইয়ের ভাই এএসএইচকে সাদেকের বাসায়, ধরে নিয়ে যায় চুলু-ভাইকে, কিন্তু ওয়ারড্রবের ভেতরে কাপড়ের আড়ালে রাখা অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করতে পারে না। ফতেহ আলী চৌধুরী বোনদের বড় বোনের বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে যায় এলিফ্যান্ট রোডে জাহানারা ইমামের বাসার খোঁজে, কিন্তু সে বাসাটা চিনত না বলে খুঁজে না পেয়ে ফিরে যায়, আর রাত ২টায় চারদিক থেকে কণিকা নামের বাসাটা ঘিরে ফেলে আর্মিরা, ধরে নিয়ে যায় রুমী, জামী, তাদের বাবা শরীফ ইমাম, কাজিন মাসুম, বন্ধু হাফিজকে। স্বপনের বাড়ি ঘেরাও হওয়ার সময় টের পেয়ে স্বপন বাড়ির পেছনের গোয়ালে ঢুকে পড়ে গরুর পেছনে আশ্রয় নিলে কোনোমতে বেঁচে যায়। মেলাঘরের আরেক গেরিলা উলফতকে না পেয়ে তার বাড়ি থেকে পাকসেনারা ধরে নিয়ে যায় তার বাবা আজিজুস সামাদকে।

এইসব খবর নিয়ে ফতেহ, তার ভাই ডাক্তারির ছাত্র মোরশেদ আর তার ইডেন কলেজের অধ্যাপিকা সহমুক্তিযোদ্ধা জাকিয়া চলে যায় সীমান্ত পেরিয়ে মেলাঘরে।
সেখানে আলম আর শাচৌ ইতিমধ্যে পদোন্নতি পাওয়া লে. কর্নেল খালেদ মোশাররফ আর মেজর হায়দারকে শোনাচ্ছে ঢাকায় সেক্টর টু-র গেরিলা ওয়ারফেয়ারের সাফল্যের একেকটা অভিযানকাহিনী, তাঁদের দুজনই দারুণ খুশি এই সাফল্যে, এবং তাঁরা রাজি ঢাকার গেরিলাদের হাতে আরো ভারী অস্ত্র আর গোলাবারুদ দিতে, তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে শহীদুল্লাহ খান বাদল, পরিকল্পনা হচ্ছে আর কী কী করা যায় ঢাকায়।
একটা সিগারেট ধরাবেন বলে শাচৌ বেরিয়ে আসেন তাঁবু থেকে, তার মাথায় চিন্তা, ৬ই সেপ্টেম্বরের আগেই ঢাকায় পৌঁছতে হবে। সিগারেট ধরিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছাড়তেই তিনি ধোঁয়ার কুন্ডলীর ভেতর দিয়ে সামনে দেখতে পান, পাহাড় থেকে নেমে আসছে ফতেহ। আরে, ফতেহ এখানে কেন? ওর তো ঢাকার অ্যাকশনে থাকার কথা।
ফতেহ বলে, 'সব শেষ হয়ে গেছে।'
এই বিয়োগান্ত খবর শুনে খালেদ মোশাররফ আর হায়দার থমকে থাকেন, তারপর খালেদ মোশাররফের চাউনির বাইরে চলে যান হায়দার, ঢুকে পড়েন নিজের তাঁবুতে, দাঁড়িয়ে থাকে বিপন্ন বাদল, আর যে-মেজর হায়দারকে কেউ কোনো দিনও এক ফোঁটা জল ফেলতে দেখেনি, সেই শক্ত যোদ্ধাটি সোজা বিছানায় চলে যান, বালিশ চাপা দেন মুখে, তারপর হাউমাউ করে কাঁদতে থাকেন : মাই বয়েজ, মাই বয়েজ...,
পুরো মেলাঘরে নেমে আসে শোকের ছায়া।

৪৪

আজাদের মা টেলিফোন করেন অ্যাম্বুলেন্সের জন্য। কিন্তু কোনো অ্যাম্বুলেন্স আসে না। রক্তাক্ত দেহ নিয়ে পড়ে আছে দুটো ছোট মানুষ : জায়েদ আর টগর। তিনি একা একা রিকশা নিয়ে যান হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালের সামনে। ভাড়া করে আনেন ট্যাক্সি। ট্যাক্সিঅলাকে বলেন, 'বাবা, দুইটা ছোট ছোট ছেলের গুলি লাগছে। একটু ধরতে হইব।' ট্যাক্সিচালক, আজাদের মা, মহুয়া-অতিকষ্টে ধরে জায়েদ আর টগরকে গাড়িতে তোলে। মা বলেন, 'ঢাকা মেডিকালে চলো।' ট্যাক্সিঅলা বলে, 'ঢাকা মেডিক্যালে আর্মি গিজগিজ করে, ওইখানে গুলি খাওয়া রোগী নিয়া গেলে ওরা গায়েব কইরা ফেলব। এর চায়া হলি ফ্যামিলিতে লন।'
'তাই চলো।'
টগর আর জায়েদকে হলি ফ্যামিলিতে ভর্তি করানো হয়। তারা অজ্ঞান অবস্থায় শুয়ে থাকে হাসপাতালের বিছানায়। আজাদের মায়ের দিনগুলো যে তখন কী করে কাটছে! দুটো ভাগ্নে, তারা তার ছেলের মতোই, হাসপাতালে, বাঁচে কি মরে ঠিক নাই। তাদের জন্য ওষুধপাতি, রক্ত জোগাড় করা, হাসপাতালে দৌড়াদৌড়ি করা-এসব তাঁকে করতে হচ্ছে। ওদিকে তাঁর নিজের ছেলে ধরা পড়েছে আর্মিদের হাতে। একই সঙ্গে ধরা পড়েছে ভাগ্নিজামাই, আর তাঁর ছেলের তিনজন বন্ধু। একা একটা মানুষ তিনি কী করবেন, কোথায় যাবেন। এক ফাঁকে প্রথম সুযোগে তিনি তাঁর বাসায় গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখা অস্ত্রশস্ত্রগুলো সরিয়ে ফেলেন হাঁড়ির মধ্যে ভরে, ভাগ্নে টিসুর মাথায় চাপিয়ে দিয়ে। আর তখনই মেডিক্যাল ছাত্র সাজ্জাদুল আলম কুটু স্টেথোস্কোপ ঝুলিয়ে আসে জুয়েলের হাতের ক্ষত ড্রেসিং করে দেবে বলে, সাফিয়া বেগম মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করেন। চারদিকে গোয়েন্দা আর পাকিস্তানিদের চর গিজগিজ করছে। এই নির্দোষ ছেলেটা না আবার ধরা পড়ে। তিনি তাকে ডেকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যান, আর বলেন, 'বাবা, আমার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না বলেই তোমাকে খবর দিয়ে আনিয়েছি, আমার ব্লাড প্রেসারটা মেপে দ্যাখো তো...' গোয়েন্দারা তাকিয়ে দেখে কুটু সাফিয়া বেগমের ব্লাড প্রেসার মাপছে, আর হাতে ব্লাড প্রেসার মাপক যন্ত্রের কাপড় পেঁচানো অবস্থায় আজাদের মা বিড়বিড় করে বলে চলেন, 'বাবা, তুমি তাড়াতাড়ি সটকে পড়ো, জানো না, রাতে ওদের সবাইকে ধরে নিয়ে গেছে আর্মিরা...'

৪৫

আজাদদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয় তেজগাঁও বিমানবন্দরের উল্টোদিকে ড্রাম ফ্যাক্টরির কাছে এমপি হোস্টেলে। রুমী, জামী, তাদের বাবা শরীফ ইমাম, বন্ধু হাফিজ প্রমুখকে ধরে বাইরে রাস্তায় জিপের সামনে এনে হেডলাইট জ্বালানো হয়, তখন কেউ একজন রুমীকে শনাক্ত করে। হতে পারে সেই কেউ একজনটা বদি, হতে পারে সামাদ ভাই, হতে পারে অন্য কোনো ইনফরমার। রুমীকে শনাক্ত করার পর তাকে আলাদা করে জিপে তোলা হয়। চুল্লুকে চোখ বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু স্বপনের বাড়ির সামনে গিয়ে আর্মিরা যে 'স্বপন ভাগ গিয়া' বলেছিল, এটা চুল্লু শুনতে পায়।
এখন রাত কত হবে, আজাদ জানে না। সময়ের হিসাব এখন তাদের কাছে গৌণ হয়ে গেছে। তাকে একটা ঘরে আলাদা করে নেওয়া হয়েছে। ধরা পড়ার পর থেকেই তার ওপরে মারটা বেশি পড়ছে। তাদের বাড়িতে পাকিস্তান আর্মির যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তারই রেশ ধরে তার ওপর দিয়েই ঝড়টা যাচ্ছে বেশি। পিটিয়ে তার মুখ ক্ষতবিক্ষত

করে ফেলা হয়েছে। সমস্ত শরীরে ব্যথা। ওইঘরে যখন সবাই মিলে এক জায়গায় ছিল, তখন থেকেই শুরু হয়েছে মারধর। বুকে পেটে মুখে লাথি। ঘুসি। বেত, চাবুক, লাঠি দিয়ে বেধড়ক পিটুনি। বিশেষ করে গিঁটে গিঁটে, কনুইয়ে, হাঁটুতে, কব্জিতে মার। চারদিকে বাঙালির আর্তনাদ, চিৎকার। গোঙানি।

এরপর আজাদকে একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। এঘরে একজন বসে আছে। অফিসার। নেমপেল্টে লেখা নাম : ক্যাপ্টেন হেজাজি।

'তুম আজাদ হ্যায়।'

আজাদ বলে, 'নেহি, হাম মাগফার হ্যায়।'

সঙ্গে সঙ্গে হান্টারের বাড়ি এসে পড়ে গায়ে, পিঠে, ঘাড়ে, মাথায়।

'ফের ঝুট বলতা হ্যায়!'

এরপর একজনকে আনা হয়। তার মুখ কাপড়ে ঢাকা। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'এ আজাদ?'

মুখ-ঢাকা মাথা নেড়ে বোঝায়, হ্যাঁ। এ-ই আজাদ।

আবার শুরু হয় জেরা।

'তুমি ইন্ডিয়া কবে গেছ?'

'যাই নাই।'

'কোন জায়গায় ট্রেনিং নিয়েছ?'

'নেই নাই।'

আবার মার। মারতে মারতে মেঝেতে ফেলে দেওয়া হয় আজাদকে। তারপর জেরাকারী বুটসহ উঠে পড়ে তার গায়ে পায়ে মাথায়! প্রথম প্রথম এই মার অসহ্য লাগে। তারপর একটা সময় আর কোনো বোধশক্তি থাকে না। ব্যথাও লাগে না। আজাদ পড়েই থাকে মেঝেতে। খানিকক্ষণ বিরতি দেয় জওয়ানটা।

আজাদের চোখ বন্ধ। সে প্রায় সংজ্ঞাহীন। পানি এনে ছিটানো হয় তার চোখেমুখে। আবার চোখ মেলতেই আজাদকে বসানো হয় মেঝেতে।

'কোন কোন অপারেশনে গিয়েছিলে?'

'যাই নাই।'

'আর কে কে মুক্তিযোদ্ধা আছে তোমার সাথে?'

'জানি না।'

আবার মার। প্রচণ্ড। কিন্তু আশ্চর্য, কিছুই টের পাচ্ছে না আজাদ।

'শোনো। সব স্বীকার করো। বন্ধুদের নাম বলে দাও। অস্ত্র কোথায় লুকিয়ে রেখেছ, বলে দাও। তাহলে কথা দিচ্ছি, তোমাকে ছেড়ে দেব।'

'আমি কিছু জানি না। আমি নির্দোষ।'

'জানো না? তোমার বন্ধুরাই তোমার কথা বলেছে। তোমার বাসা দেখিয়ে দিয়েছে। তোমাকে চিনিয়ে দিয়েছে। যে সব স্বীকার করছে, তাকে আমরা ছেড়ে দেব। তাহলে তুমি কেন বোকার মতো মরবে। স্বীকার করো।'

'আমি কিছু জানি না। তোমরা ভুল করছ!'

আবার প্রচণ্ড জোরে মার। দড়ির মতো করে পাকানো তার দিয়ে। হাত চলে যায় অজান্তেই, পিঠে। হাতের আঙুলে গিয়ে পড়ে চাবুক। আঙুল থেঁতলে যায়। নখগুলো মনে হয় খুলে খুলে পড়বে।

আজাদ 'ওরে বাবা রে ওরে মা রে' বলে কেঁদে ওঠে। তখন তার নিজেরই বিস্ময় লাগে। যে বাবাকে সে দুই চোখে দেখতে পারে না, যে বাবাকে সে স্বেচ্ছায় ছেড়ে এসেছে, যার ওপরে তার অনেক রাগ, তাকে কেন তার মহান মায়ের সঙ্গে এক করে ডাকল।

তার ওপর দিয়ে মারের ঝড় বয়ে যাচ্ছে। যাক। আজাদ এসব কথা মনে করবে না। সে অন্য কিছু ভাববে। সে তার মাকে ভাববে। তার মায়ের মুখ মনে করবে। তার মা দেখতে খুব সুন্দর। তার সব সময়ই মায়ের মুখটা মিষ্টি লেগেছে। তার মায়ের মুখে সব সময় হাসি লেগেই থাকে। এটাই সে সুখে-দুখে দেখে এসেছে। সে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে। সে শুধু তার মায়ের মুখটা মানসচোখে ফুটিয়ে তুলতে চায়। এই তো তার মা। সেই ঠোঁট, সেই মুখ। সেই পান-খাওয়া লাল ঠোঁট। মা তার মিটিমিটি হাসছে। সেদিন কেন সে জানে না, হঠাৎ করেই দরজার চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে বলেছে, 'মা, তুমি কিন্তু আমাকে কোনো দিনও মারো নাই, আশ্চর্য, না! এমন মা বাংলাদেশে আছে, যে মা তার সন্তানকে কোনো দিনও মারে নাই! আমার মা আছেন। তিনি তাঁর সন্তানকে কোনো দিনও মারেন নাই। কিন্তু বিনিময়ে মাকে সে কী দিয়েছে! শুধুই অবাধ্যতা! মাকে জড়িয়ে ধরে সে কোনো দিনও বলেনি, মা, আমি তোমাকে ভালোবাসি। অনেক ছেলের সঙ্গেই মায়ের এ রকম সম্পর্ক আছে। তার মায়ের সঙ্গে তার নাই। কিন্তু মা কি তার বোঝে না, এই জগতে মা ছাড়া তার আর কেউ নাই। সে তো ইচ্ছা করলে বাবার কাছে চলে যেতে পারত। তার ছোটমা তাকে নানাভাবে আদর করতে চেয়েছেন। কিন্তু সে তো সেই আদর, সেই প্রাচুর্য ভোগ করবে বলে মাকে ফেলে চলে যায়নি। বা, ফেলেই বা চলে যেতে হবে কেন, সে তো মাকেও বলতে পারত, মা পাগলামো করে না, কতজনই তো দ্বিতীয় বিয়ে করে, তাদের সবার প্রথম স্ত্রী কি সংসার ছেড়ে চলে গেছে! করাচিতে তার হোস্টেলের তিন রুমমেটের বাবাই তো দ্বিতীয়বার সৎকার্য করেছিল, সে চিঠি লিখে সেটা জানিয়েওছিল। সে তো বলতে পারত, চলো মা, বাবার সঙ্গে একটা আপসরফা করে নিই। কোনো দিন বলেনি তো! বলবার কথাও ভাবেনি। বাবার সঙ্গে তার তো কোনো গোলযোগ হয়নি। বাবা তাকে

আদরই করতেন। কিন্তু সে বাবাকে ছেড়েছে শুধু তার মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে। বাবাকে ছাড়া মানে তো শুধু বাবাকে ছাড়া নয়, আরাম-আয়েশ অর্থ-প্রতিপত্তি গাড়ি-বাড়ি, সম্পত্তির উত্তরাধিকারের মোহ—সব ছাড়া। সে ছেড়েছে তো সব। প্রথম প্রথম অসুবিধা হয়েছে। কিন্তু মেনে কি সে নেয়নি? 'মা, এর মধ্য দিয়েই আমার বলা হয়ে গেছে যে আমি তোমাকে ভালোবাসি। মা, তুমি কি তা বুঝেছ। মা, যদি আমি আর ছাড়া না পাই, তাহলে তোমার আর কী থাকবে মা? আমি জানি, তুমি শুধু আমাকেই মানুষ করতে চেয়েছ। আর তার বিনিময়ে আমার কাছ থেকে কিছুই প্রত্যাশা তুমি করো না। এটা তুমি চিঠিতেও লিখেছিলে। কিন্তু আমি তো তোমার পাশে থাকতে চাই। না, তোমার ভালোবাসার প্রতিদান দেওয়ার জন্যে নয়, তোমাকে খুব ভালোবাসি বলে।'

প্রথম রাতের নির্যাতনে আজাদের মুখ থেকে কোনো কথাই আদায় করা যায় না।

সময় কীভাবে, কোথা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, আজাদ টের পায় না। এক সময় দেখতে পায়-বদি, রুমী, চুল্লু-ভাই, সামাদ ভাই, আলতাফ মাহমুদ, আবুল বারক আলভী, বাশার, জুয়েল, সেকেন্দার, মনোয়ার দুলাভাই, আলতাফ মাহমুদের শ্যালকেরা, রুমীর বাবা, ভাই, আরো অনেকের সঙ্গে সেও একই ঘরে। তার কী রকম একটা অভয় অভয় লাগে। একই সঙ্গে এতগুলো পরিচিত, অভিন্ন-লক্ষ্য মানুষ, সতীর্থ মানুষ।

আলতাফ মাহমুদ শিখিয়ে দেন তাঁর শ্যালকদের, আলভীকে, একই সঙ্গে ধরা পড়া তাঁর দুই পড়শিকে, 'তোমরা বলবে তোমরা কিছু জানো না। যা জানার আমিই জানি।'

রুমী শিখিয়ে দেয় তার বাবাকে, ভাইকে, বন্ধুকে, 'তোমরা কিছু জানো না। বলবে, ছেলে কোথায় কী করে বেড়ায় আমরা জানি না। ব্যস।'

গাদাগাদি করে বসে আছে সবাই। পানির পিপাসায় সবার অবস্থা খারাপ। পানি পানি করে চিৎকার করে ওঠে একজন। তখন সবার মনে পড়ে, সবাই বড় তৃষ্ণার্ত। একজন সেন্ট্রি দরজার ওপারে। কিন্তু তার কানে এই আবেদন পৌঁছুচ্ছে বলে মনে হয় না। ঘরের ভেতরেই একটা পানির কল আছে। কেউ দেখেনি। একজনের চোখে পড়ে। তখন সবাই এক এক করে উপুড় হয়ে আঁজলা ভরে পানি খায়। প্রত্যেকের চেহারা বিধ্বস্ত। আলতাফ মাহমুদের গেঞ্জিভরা রক্তের দাগ। আবুল বারক আলভীর নখ মারের চোটে খুলে খুলে যাচ্ছে। যারা আগে মার খেয়েছে, তাদের গা ফেটে বেরুনো রক্ত শুকিয়ে আরো বীভৎস দেখাচ্ছে। বাশারের হাত ভাঙা। বোঝাই যাচ্ছে যে ওটা ভেঙে গেছে মাঝ বরাবর। বাশারের মুখে আঁজলা ভরে পানি দেয় আজাদ।

আজাদকে ধরা হয়েছে গতকাল রাত ১২টার পরে। এখন সন্ধ্যা। প্রায় ১৮ ঘণ্টা হয়ে গেছে তাদেরকে কিছুই খেতে দেওয়া হয়নি।

জাহানারা ইমাম সারা দিন চেষ্টা করেছেন ফোনে, আর্মি এক্সচেঞ্জে। তিনি ক্যাপ্টেন কাইয়ুমকে চাইছেন। কিন্তু ক্যাপ্টেন কাইয়ুমকে কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে না। এই ক্যাপ্টেন গত রাতে তাদের বাসায় রেইডের নেতৃত্বে ছিলেন। আর এ বাসায় এসেছিল সুবেদার সফিন গুল। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে জাহানারা ইমাম সুবেদার সফিন গুলকে পেয়ে যান। এই সুবেদার বলে গিয়েছিল, 'এক ঘণ্টা পরে ইন্টারোগেশন শেষে সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হবে।'

জাহানারা বলেন, 'কী এত ইন্টারোগেশন। ওদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে না কেন? ওরা কেমন আছে? আমি কি ওদের কারো সাথে কথা বলতে পারি?'

সফিনগুল জামীকে ডেকে দেন।

জামী সংক্ষেপে সারে। 'হ্যালো, ভালো আছি। আমাদের ছেড়ে দেবে।'

'তোরা খেয়েছিস কিছু?'

'না।'

'দে তো, সুবেদার সাহেবকে ফোনটা দে।'

জাহানারা মিনতি করে আল্লার দোহাই পেড়ে সুবেদারকে অনুরোধ করেন ওদের কিছু খেতে দিতে।

এই সুবেদার, নাকি অন্য কেউ, আবুল বারক আলভী বহুদিন তার কথা ভুলতে পারবে না যে, তাদের মেস থেকে হাতে বেলা রুটি আর চিনি এনে দিয়েছিল খেতে। তাকে আলভীর মনে হয়েছিল সাক্ষাৎ দেবদূত। তবে প্রত্যেকের মুখে প্রহারের ক্ষত থাকায় কেউই কিছু খেতে পারেনি।

ওরা যখন এক ঘরে, কখনও খানসেনারা আসে, দলে দলে বা জোড়ায় জোড়ায়, ইচ্ছামতো পেটাতে থাকে ওদের, যেন ওরা খেলার সামগ্রী, বা বক্সিং প্রাকটিস করার বস্তা।

রাত ১১টার পরে রুমীকে বাদ দিয়ে সবাইকে রমনা থানায় আনা হয়।

রমনা থানায় দুটো সেল। দুটো লাইন করা হয়েছে।

আবুল বারক আলভী, তখন সবে আর্ট কলেজ থেকে পাস করে বেরিয়েছে, তাকে দেখতে বালকের মতো দেখায়, মেলাঘর থেকে এসেছে, ভাবে, 'আমাকে আলতাফ মাহমুদের ফ্যামিলির সঙ্গে দাঁড়াতে হবে।' সে নিজে থেকে গিয়ে আলতাফ মাহমুদের পরিবারের লাইনে ভিড়ে যায়। আর মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয়, তার নাম সে বলবে সৈয়দ আবুল বারক। আলতাফ মাহমুদের বাসায় এসেছে নিতান্তই আত্মীয় হিসাবে, বেড়াতে, সে তার শ্বশুরপক্ষের আত্মীয়।

সৈন্যরা এক এক করে ডেকে ডেকে নাম এন্ট্রি করছে, আলভী তার নামের প্রথম অংশ বলে, বাকিটা আর বলে না। সবাইকে সেলে ঢোকানো সাঙ্গ করে সৈন্যরা চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে এতক্ষণ সেলে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকা আগে থেকে ঢোকানো আসামীরা জেগে ওঠে। তাদের কেউ হয়তো চোর, কেউবা পকেটমার। তারা জানে রোজ রাতে মুক্তিরা আসে, তারা দিনের বেলা তাদের আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে নোভালজিন ট্যাবলেট, আয়োডেক্স এসব নিয়ে রেখে দিয়েছে। তারা সবাই মুক্তিদের সেবায় লেগে যায়। আজাদের সারা গায়ে আয়োডেক্স লাগায় একজন। বলে, 'ভাইজান, আমি পকেট মারার কেসে ধরা পড়ছি, অনেক মাইর খাইছি, হাটুরা মাইর, আপনাগো মতো মাইর খাই নাই।' বাশারের হাতে রুমাল বেঁধে দেয় একজন।

নিজের গামছা খুলে পুরোটা মেঝে মুছে দেয় কেউ। তারা শিখিয়ে দেয় মার থেকে বাঁচার উপায়, বলে, 'প্রথমে দু-এক ঘা মাইর খাওনের সাথে সাথে অজ্ঞান হওনের ভান কইরা পইড়া যাইবেন, চোখ উল্টায়া রাখবেন, দেখবেন তাইলে মাইর থামায়া চোখেমুখে পানি ছিটাইব।'

ভাত আর তরকারি আসে কিছু। দু চামচ করে ভাত, একটু করে নিরামিষ তরকারি। বন্দিরা খায়। তারপর হাজতিরা পুলিশকে টাকা-পয়সা দিয়ে এদের জন্যে পান আর সিগারেট জোগাড় করে।

অল্প ভাত। সবাই ভাগাভাগি করে খায়। আজাদ গিয়েছিল হাতমুখ ধুতে। এসে দেখে ভাত ফুরিয়ে গেছে। তার রেজেকে ভাত নাই! কী আর করা! সে পান মুখে দেয়। তার মা খুব পান পছন্দ করে। কী জানি, মা এখন কী করছে!

৪৬

আজাদের মায়ের সময়গুলো যে কীভাবে কেটে যাচ্ছে, আলাহ জানে। জায়েদ আর টগরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি করলেই তো আর ঝামেলা শেষ হয়ে যায় না। কাগজে ছাপা হয়েছে সংবাদ, ঢাকায় পুলিশ আর সেনাবাহিনীর অভিযান, দুষ্কৃতকারী গ্রেফতার, প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার, দেশপ্রেমিক নাগরিকদের কাছ থেকে গোপন খবর পেয়ে সেনাবাহিনী এই মহান সাফল্য দেখিয়েছে। গুলিবিদ্ধ দুজন দুষ্কৃতকারী হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে অচেতন হয়ে আছে। এই খবর কাগজে প্রকাশিত হওয়ার পর মিলিটারি চলে আসে হলি ফ্যামিলিতে। এদের মধ্যে একজন ক্যাপ্টেন ইমতি। তারা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বলে, এই রোগী দুজনকে তাদের চাই। হলি ফ্যামিলি কর্তৃপক্ষ বলে, এটা রেডক্রসের হাসপাতাল। এখান থেকে কোনো রোগীকে কখনও ছাড়া হবে না। কাপ্টেন রোগীর সঙ্গে আসা লোকদের খুঁজতে থাকে। আজাদের মাকে পাওয়া যায়। ক্যাপ্টেন তাঁকে জিজ্ঞেস করে, ঘটনা কী? এরা গুলিবিদ্ধ হয়েছে কীভাবে। আজাদের মা ঘটনাটা যতটুকু বলা নিরাপদ মনে করেন, বিবৃত করেন। তাঁর ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে জানতে পেয়ে ক্যাপ্টেন জানতে চায়, ছেলের নাম কী। মা ছেলের ভালো নাম বলেন। ক্যাপ্টেন চমকে ওঠে। জানতে চায়, ডাকনাম কী। মা বলেন। ক্যাপ্টেন বলে, আজাদের কোনো তসবির তাঁদের সঙ্গে আছে কি না। আজাদের মা তাঁর সঙ্গে সারাক্ষণ রাখা আজাদের একটা পাসপোর্ট সাইজ ছবি বের করে দিলে ক্যাপ্টেন সেটা হাতে নেয়। ভালো করে দেখে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে ক্যাপ্টেনের দু চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি ঝরতে থাকে। ছবিটা ফেরত দিয়ে ক্যাপ্টেন কিছু না বলে চলে যায়। আজাদের মা ঘটনার কোনো কারণ বের করতে পারেন না, তবে ঘটনা শুনে অন্যরা এই অনুমান ব্যক্ত করে যে সম্ভবত এই ক্যাপ্টেনটা করাচি ইউনিভার্সিটিতে আজাদের সহপাঠী ছিল।

রক্ত জোগাড় করা দরকার। জায়েদ-টগরকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে রক্ত আর স্যালাইন দিয়ে। টাকা সংগ্রহ করতে হবে। হাতে কোনো নগদ টাকা নাই। এর মধ্যে আবার চেষ্টাচরিত করতে হবে আজাদ, মনোয়ার, বাশারকে ছাড়িয়ে আনার। তিনি কার কাছে যাবেন? টাকা জোগাড়ের সহজ পথ সোনার গয়না বিক্রি করা। ওটা করা যাবে। রক্তও যে কার কাছে পাওয়া যাবে, খোদা জানেন। তিনি নিজেই দিতে পারেন, কিন্তু ডাক্তাররা তাঁর রক্ত নিতে চায় না। কেন যে নিতে চায় না কে জানে।

ডাক্তাররা তাঁর কাছে একটা ফরম নিয়ে আসে-'জায়েদের পা কেটে ফেলতে হবে। আপনি গার্জিয়ান হিসাবে পারমিশন দেন। এখানে আপনার সাইন লাগবে। সাইন করেন।'

পা কেটে ফেলতে হবে? আজাদের মা চিন্তায় পড়েন। ছেলে তাঁর নয়। ছেলের মা বেঁচে থাকলে সে-ই সিদ্ধান্ত দিতে পারত। ছেলের বাবা তো থেকেও নাই। এখন এই সিদ্ধান্ত তিনি কীভাবে দেবেন। তখন তাঁর মনে পড়ে যায় জুরাইনের মাজার শরিফের বড় হুজুরের কথা। আজাদকে যুদ্ধে যেতে দেবেন কি দেবেন না, এই দোটানায় যখন তিনি ভুগছিলেন, তখন তিনি হুজুরের কাছে গিয়েছিলেন। হুজুর তাঁকে অনুমতি দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, 'আজাদকে যুদ্ধে পাঠাও।' এখন তার এই দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় হুজুরের কাছে বুদ্ধি নেওয়া যেতে পারে।

আমি একটু বুদ্ধিপরামর্শ নিয়ে আসি।

তিনি জুরাইনে চলে যান। বড় হুজুরের সঙ্গে দেখা করেন। হুজুরপাকের স্ত্রীর সঙ্গেও তাঁর সুসম্পর্ক। তাঁর সঙ্গেও দেখা করেন। তাঁদের খুলে বলেন তাঁর বিপদের কথা। ছেলেকে,

ছেলের বন্ধুকে, ভাগ্নিজামাইকে ধরে নিয়ে গেছে আর্মিরা। আর্মির গুলিতে দুই ভাগ্নে মরণাপন্ন। ছেলে কি তাঁর ফিরে আসবে না? আর জায়েদের পা কাটার অনুমতি তিনি দেবেন কি দেবেন না!

হজুর বলেন, 'উসকো পাও মাত কাটো।'

ব্যস। মা তাঁর সিদ্ধান্ত পেয়ে যান। 'আর আমার ছেলে আজাদের কী হবে হজুর!'

'ও আপাস আয়েগা। আসবে। ফিরে আসবে। সহিসালামতেই ফিরে আসবে।'

আজাদের মা কিছুটা আশ্বস্ত হন। হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে ফিরে আসেন। ডাক্তারদের বলেন, 'না, জায়েদের পা কাটতে পারবেন না। আমার অনুমতি নাই।' শুনে ডাক্তাররা বিরক্ত হয়। পায়ে গুলি লেগেছে। পা না কাটলে এ ছেলেকে তো বাঁচানোই যাবে না। জায়েদ এ কথা চিরদিনের মতো স্মরণ করে রাখবে যে, জুরাইনের হজুরের জন্যে তার পা-টা আজও আছে। নইলে তো কবেই সেটা কেটে ফেলে দিতেন হলি ফ্যামিলির ডাক্তাররা।

আজাদের মা বাসায় ফেরেন। ঘরের মধ্যে এখনও পড়ে আছে ভাঙা খাট। ইস্পাতের আলমারি এখনও গুলিতে ছ্যাঁদা হয়ে আছে। মেঝেতে রক্ত জমে কালো হয়ে গেছে, কে মুছবে আর এসব!

হঠাৎ করে কামরুজ্জামান আসে আজাদের মায়ের কাছে, তাকে জায়েদ সব সময়ই সন্দেহ করে এসেছে আর্মির ইনফরমার বলে, তার সঙ্গে আরেকজন ছেলে, সেই ছেলে বলে, 'নানি, অস্ত্রগুলা দ্যান।'

আজাদের মা বলেন, 'তুমি কে?'

'আমি বদির মামা। আজাদের বন্ধু। আজাদদের সাথে ছিলাম।'

আজাদের মায়ের মাথায় মুহূর্তে এ প্রশ্ন উদিত হয় যে, আজাদের কোনো বন্ধু তো তাকে নানি বলে না। এ কে? কেন এসেছে? তিনি বলেন, 'বাবা, এ বাসায় তো কোনো অস্ত্র নাই। তুমি ভুল শুনেছ!' কামরুজ্জামান আগন্তুককে নিয়ে চলে যায়। আজাদের মা ভাবেন, ভাগ্যিস অস্ত্রগুলো তিনি আগেই সরিয়ে ফেলেছিলেন।

মা সারাক্ষণ ব্যস্ততার মধ্যে থাকেন। এর মধ্যে যতটুকু সময় পান তিনি নামাজ পড়েন, রোজা রাখেন, আলাহর দরবারে মোনাজাত করেন।

৪৭

৩১শে আগস্ট ১৯৭১ সকাল ৭টা। রমনা থানা। বন্দিরা হঠাৎ গাড়ির আওয়াজ পায়। পাকিস্তানি সৈন্যরা এসে পড়ে। বন্দিদের আবার তোলা হয় একটা জানালা-বন্ধ বাসে। তাদের নিয়ে আসা হয় আবার এমপি হোস্টেলে। একটা কক্ষে সবাইকে কিছুক্ষণ রাখার পর তাদের নিয়ে যাওয়া হয় পেছনের আরেকটা বিল্ডিংয়ে। আজাদ শুনতে পায়, এখানে সবার স্টেটমেন্ট নেওয়া হবে। স্টেটমেন্ট মানে একজন আর্মি অফিসার বন্দিদের একে একে প্রশ্ন করবে। জবাব শুনে সেগুলো কাগজে লিখে নেবে। এই স্টেটমেন্ট নেওয়ার সময় যে টর্চার করা হয়, তা আগের দুদিনের অত্যাচারের চেয়েও ভয়াবহ।

আজাদের পালা আসে। একজন অফিসার নাম ধরে ডাকে। 'আজাদ।' আজাদ ওঠে না।

'আজাদ আলিয়াস মাগফার।' আজাদ ওঠে।

আজাদকে একটা কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে তিনজন অফিসার একসঙ্গে ঘিরে ধরে আজাদকে।

'আজাদ।'

আজাদ কোনো কথা বলে না।

'তোমাকে তোমার বন্ধুরা দেখিয়ে দিয়েছে তুমি আজাদ, তুমি সেটাই স্বীকার করছ না। এটা ঠিক না। আমাদের কাছে সবকিছুর রেকর্ড আছে। তুমি সিদ্ধিরগঞ্জ অপারেশনে গিয়েছিলে। ২৫ তারিখে তুমি রাজারবাগ অপারেশনে ছিলে। প্রথমটার কম্যান্ডার ছিল কাজী কামাল। পরেরটার আহমেদ জিয়া।'

'এসব ঠিক নয়। আমার নাম মাগফার। ওরা আমার বাসায় এসেছিল তাস খেলতে। ওরা তাসটা ভালো খেলে। এছাড়া আমি ওরা কোথায় কী করে না করে কিচ্ছু জানি না।'

'হারামজাদা।' সিপাইদের ডেকে তার হাওলায় সমর্পণ করা হয় আজাদকে, 'আচ্ছা করকে বানাও।' দুজন সিপাই এসে আজাদের পায়ে দড়ি বাঁধে। তারপর তাকে ঝোলায় সিলিং ফ্যানের সঙ্গে উল্টো করে। ফ্যান ছেড়ে দেয়। আজাদ উল্টো হয়ে ঝুলছে, ঘুরতে থাকে ফ্যানের সঙ্গে সঙ্গে। আর চলতে থাকে চড়-কিল-ঘুসি। আজাদ 'মা মা' বলতে বলতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

তাকে নামিয়ে তার চোখেমুখে পানি দেওয়া হয়। জ্ঞান ফিরে পেলে সে প্রথম যা বলে, তা হলো, 'মা।' যেন সে মায়ের কোলে শুয়ে আছে।

অফিসাররা আজাদের ফাইলটা আবার দেখে। মায়ের সঙ্গে বাবার সম্পর্ক নাই। মায়ের একমাত্র ছেলে। মায়ের সঙ্গে একা থাকে।

অফিসার বলেন, 'তুমি মাকে দেখতে চাও?'

'হুঁ।'

'মায়ের কাছে যেতে চাও?'
'হুঁ।'
'তাহলে তুমি বলো, অস্ত্র কোথায় রেখেছ?'
আজাদ বলে, 'জানি না।'
আবার একপ্রস্থ প্রহার চলে।
আজাদ আবার তার মায়ের মুখ মনে করে নির্যাতন ভোলার চেষ্টা করে।
'ওকে। তোমার মা বললে তুমি সব বলবে?'
'বলব।'
'ঠিক আছে। তোমার মাকে আনা হবে।'
অফিসার ইনটেলিজেন্সের এক লোককে ডেকে বলেন, 'এর মাকে আনো।'

আবুল বারক আলভী দেখে একে একে আলতাফ মাহমুদের বাসার সবাইকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে, তাকে তো ডাকে না। সে নিজেই উঠে যায়, বলে, 'আমাকে যে ডাকলেন না! আমি তো ওই বাসায় গেস্ট হিসাবে ছিলাম।'
তাকে ডাকা হয়। অফিসার বলেন, 'তোমার নাম কী!'
সে বলে, 'সৈয়দ আবুল বারক।'
অফিসার তালিকায় তার নাম পান না। 'তোমাকে কেন ধরেছে?'
'জানি না। আমি মিউজিক ডিরেক্টর সাহেবের বউয়ের পক্ষের আত্মীয়। কালকে বেড়াতে এসেছিলাম এ বাসায়। আমাকে ভুল করে ধরে এনেছে।'
আবুল বারক আলভীর চেহারা প্রতারণাময়, বয়স বোঝা যায় না, তার ওপর আগের দিনের মারে সমস্ত শরীরে কাটা কাটা দাগ, রক্ত শুকিয়ে ভয়াবহ দেখাচ্ছে, চোখমুখ ফোলা, ঠোঁট কাটা, হাতের আঙুল থেকে নখ বের হয়ে আসছে...
কর্নেলকে অনেক সহানুভূতিসম্পন্ন মনে হচ্ছে; এমন সময় আগের দিন ও রাতে যে সিপাইটা প্রচণ্ড মেরেছিল, তাকে দেখা যায় এদিকে আসছে, আবুল বারক প্রমাদ গোনে, কারণ ওই সিপাইটা সব জানে, সে জানে যে তার নামই আসলে আলভী, আর একজন মুক্তিযোদ্ধা তাকে আলভী বলে শনাক্ত করে গেছে।
আরো খানিকক্ষণ চলে জিজ্ঞাসাবাদ, আবুল বারক জানায় তার চাকুরিস্থলের কথা, সে রোজ অফিসে যায়, 'এই যে ফোন নম্বর, ফোন করেন,' এটা সে বলে আত্মবিশ্বাস থেকে যে তার অফিসে কেউ খোঁজ করলে তার সহকর্মী বা বড় কর্তা তাকে বিপদে ফেলবে না...
কর্নেল তাকে চলে যাওয়ার অনুমতি দেন।

আবুল বারক বেরিয়ে আসে। সে হাঁটতে পারছে না। তার ওপর ওই দূরে সেই ভয়ঙ্কর সিপাইটাকে দেখা যাচ্ছে। সে ভালো মানুষ সুবেদারটাকে পেয়ে যায়। এই সুবেদারটাকে পরশু থেকেই তার ফেরেশতা বলে মনে হচ্ছে। প্রথম দিন যখন ওই কসাই টাইপের সিপাইটা প্রচণ্ড মার মারছিল, তখন এক সময় এই সুবেদার সিপাইটাকে বলেছিল, 'ইতনা মার মাত মারো।' আজ সুবেদার সাহেবকে সামনে পেয়ে আবুল বারক বলে, 'আমি তো দাঁড়াতেই পারছি না। আমাকে কি তুমি রোড পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারো!'
শুনে সুবেদার বলে, 'আমি দোয়া করি তুমি একাই হেঁটে যেতে পারবে।'
'পারতেছি না চাচাজি।'
সুবেদার আরেকজন সিপাইকে বলে, 'ওকে পার করে দিয়ে আসো।'
আবুল বারক হেঁটে হেঁটে সিপাইয়ের সঙ্গে রাস্তায় আসে। দূর থেকে সেই ভয়ঙ্কর সিপাইটা তাকিয়ে দেখে তাকে। আবুল বারক আলভীর রক্ত হিম হয়ে আসে।
আবুল বারক এখনও নিশ্চিত নয়, তাকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, নাকি ক্যান্টনমেন্ট নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই সৈন্যটা তাকে রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে বলে, 'বাসায় গিয়ে একজন ভালো ডাক্তার দেখাবে।' আবুল বারকের মনে হয় সে নবজীবন লাভ করল। এয়ারপোর্ট রোডে আসে সে। দেখে একটা গাড়ি যাচ্ছে। সে হাত তোলে। গাড়িটা তাকে অতিক্রম করে চলে যায়। তারপর ব্রেক কষে। আবার ফেরে। আলভী ভয় পায়। গাড়ি থেকে বলা হয় : 'গাড়িতে ওঠো।'
আবুল বারক আলভী দেখতে পায়, গাড়ির চালক তার বন্ধু রানা ও নিমা রহমানের বাবা লুৎফর রহমান। আলতাফ মাহমুদের বাসার পাশে থাকেন। বড় পাট ব্যবসায়ী। আলভী তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে আলতাফ মাহমুদের বাসায় আসে। মহিলা-মহলে সাড়া পড়ে যায়। নিমার মা এসে সব মহিলার সামনে আবুল বারক আলভীকে খালিগা করে শুশ্রূষা করতে থাকেন। আলভী লজ্জা পায়, আবার মহিলাদের এই আদর সে উপভোগও করে।
ঘরে ফিরে আসে জামী, রুমীর বাবা শরীফ ইমাম। রুমী আসে না।
এইভাবে কেউ ছাড়া পায়, কেউ পায় না।

আজাদের মা মগবাজারের বাসায় পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গেই মহুয়া বলে, 'আম্মা, আপনে কই আছিলেন। কামরুজ্জামানে এক লোকরে আনছিল। কয় বলে, আজাদের মা কই। জরুরি দরকার আছে। আজাদরে ছাড়নের ব্যাপারে কথা আছে।'
মায়ের বুকের ভেতরটা যেন লাফিয়ে ওঠে। আজাদকে ছাড়িয়ে আনা যাবে! ফিরে আসবে তাঁর আজাদ। আশার সঞ্চার হয় খানিক। পরক্ষণেই কামরুজ্জামানের নাম শুনে তিনি খানিকটা হতাশ হন। মিলিটারির দালাল লোকটা। ইউনুস চৌধুরীর

বাসাতেও ঘুরঘুর করে। সে কী মতলবে এসেছিল, আলাইই জানে! মহুয়া বলে, ‘আপনেরে থাকতে কইছে। আজকা বিকালে ফির আইব।’

বিকালের জন্যে অপেক্ষা করেন মা। তাঁর বুক দুরুদুরু করে কাঁপছে। কিছুই ভালো লাগছে না। মহুয়ার কোলে ছোট মেয়েটা কাঁদে, মহুয়া তাকে স্তন্য পান করায়, মেয়েটা তখন চুপ করে, এই দৃশ্যের দিকে আজাদের মা তাকিয়ে থাকেন। তাঁর বুকের ভেতরটায় হাহাকার করে ওঠে। কোথায় তাঁর আজাদ!

বিকালবেলা কামরুজ্জামান আসে। দরজায় আওয়াজ শুনে মা দৌড়ে দরজা খোলেন। কামরুজ্জামানের সঙ্গে আরো একটা লোক। কামরুজ্জামান বলে, ‘চাচি। আলাহর কাছে শুকর করেন। আমি রইছি বইলা না সুযোগ আইছে। আজাদরে ছাইড়া দেওনের একটা ভাও করছি। ওনারে ক্যাপ্টেন স্যারে পাঠাইছে। কী কয়, মন দিয়া শুনেন।’

আজাদের মা তাদেরকে ঘরের ভেতরে আনেন। বসতে দেন। কামরুজ্জামানের সঙ্গের লোকটার মুখের দিকে তাকান। কালো প্যান্ট, শাদা শার্ট পরা। চুল ছোট। ছোট করে ছাঁটা গোঁফ। চেহারাটা পেটানো।

লোকটা বলে, ‘আজাদের সঙ্গে দেখা করতে চান?’

‘জি।’ মায়ের বুক এমনভাবে কাঁপছে, যেন তা তাঁর শরীরের অংশে আর নাই।

‘ছেলেকে ছাড়ায়া আনতে চান?’

‘জি।’

‘আজকা রাতে আজাদ রমনা থানায় আসবে। আপনারে আমি দেখা করায়া দেব। বুঝলেন?’

‘জি।’

‘তার সঙ্গে দেখা করবেন। দেখা করে কী বলবেন?’

‘জি!’

‘দেখা করে বলবেন, সে যেন সবার নাম বলে দেয়!’

‘জি?’

‘শোনেন, ছেলেকে যদি ফিরে পেতে চান, তাকে বলবেন, সে যেন সবার নাম বলে দেয়। বুঝেছেন?’

‘হুঁ।’

‘অস্ত্র কোথায় রেখেছে, সে যেন বলে দেয়। বুঝেছেন?’

‘হুঁ।’

‘সে যদি সব স্বীকার করে, তাকে রাজসাক্ষী বানানো হবে। বুঝেছেন?’

আজাদের মা তার মুখের দিকে তাকায়। শূন্য তাঁর দৃষ্টি।

কামরুজ্জামান বলে, ‘রাজসাক্ষী মানে হে সবাইরে ধরায়া দিব। যারা যারা আসল ক্রিমিনাল তাগো বিরুদ্ধে সাক্ষী দিব। পুরস্কার হিসাবে হেরে ক্ষমা কইরা দিব। আপনের ছেলেরে ছাইড়া দিব। আমি কইছি, আজাদ ভালো ছেলে। হে ইন্ডিয়া যায় নাই। আরে বন্ধুবান্ধবগো পালায় পইড়া...’

আজাদের মা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন।

লোকটা বলে, ‘আপনি বললে আপনার ছেলে আপনার কথা শুনবে। আমাদের কথা শুতেছে না। বাজে ছেলেদের সাথে মিশে ও কিছু ভুল করেছে। সব স্বীকার করলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। এরপর ছেলেকে দেখে রাখবেন। আর যেন খারাপ ছেলেদের সাথে না মেশে।’

যাওয়ার আগে কামরুজ্জামান বলে যায়, ‘রাতের বেলা রমনা থানায় যাইয়েন। আজাদ থাকব। যা যা কইছে, ঠিকমতন কইয়েন। বুঝছেন।’

তারা চলে যায়। কচি এসে বলে, ‘কী কইল আম্মা, আজাদ দাদাকে ছেড়ে দিবে? ও আম্মা।’

মা কিছুই বলেন না। একদিকে তাকিয়ে থাকেন। মহুয়ার মেয়েটা আবার কাঁদছে। কেন, কাঁদছে কেন। মহুয়া কি কাছে নাই? সে তাকে দুধ দিচ্ছে না কেন!

রাত্রিবেলা। গরাদের এপারে আজাদ। ওপারে তার মা। ছেলেকে দেখে মায়ের সর্বান্তকরণ কেঁপে ওঠে। কেঁদে ওঠে। কিন্তু তিনি ছেলেকে কিছু বুঝতে দিতে চান না। আজাদের চোখমুখ ফোলা। ঠোঁট কেটে গেছে। চোখের ওপরে ভুরুর কাছটা কাটা। সমস্ত শরীরে মারের দাগ। মেরে মেরে ফুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাটা জায়গাগুলোয় রক্ত শুকিয়ে দেখাচ্ছে ভয়াবহ।

এখন আজাদকে তিনি কী বলবেন? বলবেন, রাজসাক্ষী হও। সব স্বীকার করো। এটা তিনি তো বলতেই পারেন। ওর বাবা ইউনুস আহমেদ চৌধুরী এই শহরে এখনও সবচেয়ে ক্ষমতাবান লোকদের একজন। গভর্নরের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব। আর্মির অফিসাররা তার ইয়ার-বান্ধব। আজাদের ছোটমা, তিনি শুনতে পান, কর্নেল রিজভী নামের একজনকে ভাই ডেকেছে। কর্নেলের ছোট বোনের নামের সঙ্গে নাকি তার নাম মিলে গেছে। সাফিয়া বেগম যদি ইঙ্গিতেও চৌধুরীর কাছে ছেলের জন্যে তদবির করেন, তাহলেও তো ছেলে তাঁর মুক্তি পাবে। আবার চৌধুরীর নিজের ভাই আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক। ওই দিক থেকেও তাঁদের কোনো সমস্যা নাই। আজাদের ছোটমা নাকি আজাদের চাচাসহ আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দকে গাড়িতে করে নদীতীরে পৌঁছে দিয়েছেন।

কিন্তু তাঁর ছেলেকে তিনি রাজসাক্ষী হতে বলবেন? অন্যের ছেলেদের ফাঁসানোর জন্য? মুক্তিযোদ্ধাদের ধরিয়ে দেওয়ার জন্যে? মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রগুলো পাকিস্তানিদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্যে?

ছেলে তাঁর যুদ্ধে যাওয়ার পরে একদিন বলে, 'মা, তুমি কিন্তু আমাকে কোনো দিনও মারো নাই।' হ্যাঁ, তাঁর ছেলেকে তিনি কোনো দিনও ফুলের টোকাও দেননি। সেই ছেলেকে ওরা কী মারটাই না মেরেছে! আর ছেলে তাঁর করাচি থেকে চিঠি লিখেছিল, 'মা, ওরা আর আমরা আলাদা জাতি। অনেক ব্যবধান।'

না। তিনি আর যা-ই হন না কেন, বেইমান হতে পারবেন না। ছেলেকে যুদ্ধে যেতে তিনিই অনুমতি দিয়েছেন।

আজাদ বলে, 'মা, কী করব? এরা তো খুব মারে। স্বীকার করতে বলে। সবার নাম বলতে বলে।'

'বাবা, তুমি কারো নাম বলোনি তো!'

'না মা, বলি নাই। কিন্তু ভয় লাগে, যদি আরো মারে, যদি বলে ফেলি।'

'বাবা রে, যখন মারবে, তুমি শক্ত হয়ে থেকো। সহ্য কোরো। কারো নাম যেন বলে দিও না।'

'আচ্ছা। মা, ভাত খেতে ইচ্ছা করে। দুই দিন ভাত খাই না। কালকে ভাত দিয়েছিল, আমি ভাগ পাই নাই।'

'আচ্ছা, কালকে যখন আসব, তোমার জন্যে ভাত নিয়ে আসব।'

সেন্ট্রি এসে যায়। বলে, 'সময় শেষ। যানগা।'

মা হাঁটতে হাঁটতে কান্না চেপে ঘরে ফিরে আসেন। পাশেই হলি ফ্যামিলি, জায়েদ আর টগর সেখানে চিকিৎসাধীন আছে, কিন্তু সেখানে যেতে তাঁর ইচ্ছা করছে না।

সকালবেলা, যথারীতি গাড়ি এসে বন্দিদের নিয়ে যায় এমপি হোস্টেলের ইন্টারোগেশন সেন্টারে।

বদির ওপরে চলছে অকথ্য নির্যাতন, সে আর সহ্য করতে পারছে না, এক সময় সে দৌড়ে ঘরের ভেতরে ইলেকট্রিক লাইনের ভেতরে হাত ঢোকানোর চেষ্টা করে, চেষ্টা করে সকেটের দুই ফুটোর মধ্যে দু আঙুল ঢোকানোর, ব্যর্থ হয়ে সকেট ভেঙে ফেলতে আরম্ভ করে, শব্দ পেয়ে সেন্ট্রিরা এসে তার দু হাত পেছন দিক থেকে বেঁধে ফেলে। তখন সে ভাবে, পালানোর চেষ্টা করলে নিশ্চয় গুলি করবে। তাকে যখন এক ঘর থেকে আরেক ঘরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন সে অকস্মাৎ দৌড়ে গেটের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে, এ আশায় যে তাকে গুলি করা হবে, কিন্তু সৈন্যরা অতটা উদারতার পরিচয় দেয় না, তাকে ধরে নিয়ে এসে উল্টো রাইফেলের বাঁট দিয়ে প্রচণ্ড জোরে মারতে থাকে।

আজাদকে আবার নিয়ে যাওয়া হয় কর্নেলের সামনে। কর্নেল কাগজ দেখেন। আজাদকে তার মায়ের সঙ্গে দেখা করানো হয়ে গেছে। ইন্টেলিজেন্সের রিপোর্ট। এখন নিশ্চয় সে স্বীকার করবে সবকিছু। জানিয়ে দেবে অস্ত্রের ঠিকুজি।

'আজাদ, বলো, সিদ্ধিরগঞ্জ অপারেশনে আর কে কে ছিল?'

আজাদ বলে, 'জানি না।'

'বলো, সিদ্ধিরগঞ্জ অপারেশনের পরে রকেট লাঞ্চারটা কোথায় রাখা হয়েছে?'

'জানি না।'

কর্নেল ইঙ্গিত দেন। আজরাইলের মতো দেখতে একজন সৈনিক এগিয়ে আসে। আজাদের ঘাড়ে এমনভাবে হাত লাগায় যে মনে হয় ঘাড় মটকে যাবে। তাকে ধরে একটা চেয়ারে বসানো হয়। তাকে বাঁধা হয় চেয়ারের সঙ্গে। বিদ্যুতের তার খোলামেলাভাবে আজাদের চোখের সামনে খুলে বাঁধা হচ্ছে চেয়ারের সঙ্গে, তার পায়ের সঙ্গে। তাকে এখন শক দেওয়া হবে। আজাদের একবার মনে হয় ফারুক ইকবালের কথা, ৩রা মার্চ রামপুরা থেকে পুরানা পল্টনের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মিটিংয়ে আসার জন্যে মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছিল সে, টেলিভিশন ভবনের সামনে আর্মি গুলি চালায়, গুলিবিদ্ধ হয়ে রাজপথে লুটিয়ে পড়ে ফারুক ইকবালের শরীর, তখন সারাটা শহরে জনরব ছড়িয়ে পড়ে যে ফারুক ইকবাল নিজের বুকের রক্ত দিয়ে রাস্তায় মৃত্যুর আগে লিখেছিল 'জয় বাংলা', তখন খবরটা বিশ্বাস হয়নি আজাদের, এখন ঠিক অবিশ্বাস হচ্ছে না। তার মনে পড়ে লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের মৃত্যুর বর্ণনা, যা সারাটা শহরে ছড়িয়ে পড়েছে কিংবদন্তির মতো, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার দু নম্বর আসামি লে. কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসায় ২৫ মার্চ রাত ১১টার দিকে আর্মি ঢুকে পড়ে, তাঁকে জিজ্ঞেস করে, 'তুমহারা নাম কিয়া', তিনি বলেন 'কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন', তারা বলে, 'বলো পাকিস্তান জিন্দাবাদ', তিনি বলেন, 'এক দফা জিন্দাবাদ', পুরোটা মার্চে যখন নানা রকমের আলোচনা চলছিল, তখন মোয়াজ্জেম হোসেন এই এক দফার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছিলেন, 'এক দাবি এক দফা বাংলার স্বাধীনতা...' সৈন্যরা গুলি করল, লুটিয়ে পড়ল তাঁর দেহ...

প্রচণ্ড অত্যাচার চলছে আজাদের ওপর দিয়ে, কিন্তু আজাদ নির্বিকার, সে শুধু মনে করে আছে তার মায়ের মুখ, মা বলেছেন, 'বাবা, শক্ত হয়ে থেকো... কারো নাম বোলো না...'

এক সময় কর্নেল তাঁর হাতের কাগজ রাগে ছুড়ে ফেলেন, তারপর নির্দেশ দেন চূড়ান্ত শাস্তির... আজাদের ঠোঁট তখন নড়ে ওঠে, কারণ সে জানে চূড়ান্ত শাস্তি মানে এই

শারীরিক যন্ত্রণার চির উপশম, আজাদের মন এই টর্চারের হাত থেকে বাঁচার সম্ভাবনায় আশ্বস্ত হয়ে ওঠে।

পরদিন, কখন রাত হবে, কখন তিনি ভাত নিয়ে যাবেন রমনা থানায়, সারা দিন অস্থির থাকেন মা। দুপুরে তিনি আর ভাত মুখে দিতে পারেন না। তার ছেলে ভাত খেতে পায় না। তিনি বাসায় বসে আরাম করে ভাত খাবেন! তা কি হয়!

সন্ধ্যা হতে না হতেই তিনি চাল ধুতে লেগে পড়েন। দিনের বেলায়ই ঠিক করে জোগাড়যন্ত্র করে রেখেছেন কী রাঁধবেন! মুরগির মাংস, ভাত, আলুভর্তা, বেগুনভাজি। একটা টিফিন-ক্যারিয়ারে নেবেন। নাকি দুটোয়! তার কেমন যেন লাগে।

রাত নেমে আসে। সারাটা শহর নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে। কারফিউ দেওয়ার আগেই ভাত নিয়ে তিনি হলি ফ্যামিলিতে আশ্রয় নেন। রাত আরেকটু বেড়ে গেলে দুটো টিফিন-ক্যারিয়ারে ভাত নিয়ে তিনি যান রমনা থানায়।

দাঁড়িয়ে থাকেন, কখন আসবে গাড়ি। কখন এমপি হোস্টেল থেকে নিয়ে আসা হবে আজাদদের। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর গাড়ি আসে। একজন একজন করে নামে বন্দিরা। কই, এর মধ্যে তো তার আজাদ নাই। আর্মিরা চলে গেলে তিনি পুলিশের কাছে যান। 'আমার আজাদ কই?'

পুলিশকর্তা নামের তালিকা দেখেন। বলেন, 'না, আজাদ তো আজকে আসে নাই।'

'মাগফার চৌধুরী?'

'না। এ নামেও কেউ নাই।'

'আর কি আসতে পারে?'

'আজ রাতে? নাহ্।'

'কালকে?'

'বলতে পারি না।'

টিফিন-ক্যারিয়ারে ভাত নিয়ে আজাদের মা কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকেন। সারা রাত। থানার চত্বরে। বাইরে বাঙ্কারে পাকিস্তানি সেনাদের চোখ এলএমজির পেছনে ঢুলুঢুলু হয়ে আসে, ভেতরে পুলিশের প্রহরী মশা মারে গায়ে চাপড় দিতে দিতে, বিচারপতির বাসভবনের উল্টোদিকের গির্জায় ঘণ্টা বাজে, মা দাঁড়িয়ে থাকেন টিফিন-ক্যারিয়ার হাতে, তাঁর কেবলই মনে হতে থাকে সেই দিনগুলোর কথা, বিন্দু মারা যাওয়ার পরে যখন তাঁর পেটে আবার সন্তান এল, প্রতিটা মুহূর্ত তিনি কী রকম যত্ন আর উৎকণ্ঠা নিয়ে ভেতরের জীবনটাকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন, আর সন্তানের জন্ম দেওয়ার পরে কানপুরের ক্লিনিকেই চৌধুরী সাহেব আজান দিয়েছিলেন, আর ভারতবর্ষের আজাদির স্বপ্নে ছেলের নাম রেখেছিলেন আজাদ, তাঁর পেটের ভেতরটা গুড়গুড় করছে, যেন তিনি আজাদকে আবার এই পৃথিবীর সমস্ত বিপদ-আপদ-শঙ্কার প্রকোপ থেকে বাঁচাতে তাঁর মাতৃগর্ভে নিয়ে নেবেন, যদি তিনি পাখি হতেন, এখনই তাঁর পাখা দুটো প্রসারিত করে আজাদকে তার বুকের নিচে টেনে নিতেন। আস্সালাতু খায়রুম মিনান্নাউম, ভোরের আজান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দৌড় ধরেন তেজগাঁও থানার দিকে। ওখানে যদি তাঁর আজাদ থাকে! ঝিরঝির করে বৃষ্টি ঝরে, ছোট ছোট ছাঁদে, তিনি কিছুই টের পান না, তেজগাঁও থানার চত্বরে হাজির হন। তখনও তাঁর হাতে দুটো টিফিন-ক্যারিয়ার।

পুলিশকে দুটো টাকা চা খাওয়ার জন্যে উপহার দিয়ে তিনি আজকের হাজতিদের পুরো তালিকা দেখেন। গরাদের এ পাশে দাঁড়িয়ে হাজতিদের প্রত্যেকের মুখ আলাদা আলাদা করে নিরীক্ষণ করেন। না, আজাদ নাই।

এখান থেকে এমপি হোস্টেল বেশি দূরে নয়। তিনি এমপি হোস্টেলের দিকে দৌড় ধরেন। একজন সুবেদারের সঙ্গে দেখা হয় তাঁর। সুবেদারকে বলেন, 'আজাদ কোথায়? আমি আজাদের মা।'

সুবেদার বলে, 'মাইজি, উনি তো এখানে নাই। ক্যান্টনমেন্টে আছেন। আপনি বাড়ি চলে যান।'

মা কী করবেন, বুঝে উঠতে পারেন না। তাঁর হাতের ভাত ততক্ষণে পচে উঠে গন্ধ ছড়াচ্ছে। তাঁর নিজের পরিপাকতন্ত্রের ভেতরে থাকা পরশুদিনের ভাতও যেন পচে উঠছে...

'মাইজি, আপনি বাড়ি চলে যান।'

মা এক সময় বাসায় চলে আসেন। তাঁকে পাথরের মতো দেখায়। তিনি মহুয়াকে, কচিকে সংসারের স্বাভাবিক কাজকর্ম দেখিয়ে দেন, কিন্তু তবু মনে হয় সমস্তটা পৃথিবী গুমোট হয়ে আছে, কী অসহ্য ভাপসা গরম, বৃষ্টি হলে কি জগৎটা একটু স্বাভাবিক হতো! তিনি হাসপাতালে যান, দেখতে পান, জায়েদের জ্ঞান ফিরে এসেছে, টগরের অবস্থাও উন্নতির দিকে, তিনি জুরাইনের বড় হুজুরের কাছে, বেগম সাহেবার কাছে যান, তাঁরা তাঁকে আশ্বাস দেন যে আজাদ বেঁচে আছে, আজাদ ফিরে আসবে। 'ঘাবড়াও মাত। ও আপসা আয়ে গা।'

মহুয়া বলে, 'আম্মা কিছু খান, না খেয়ে খেয়ে কি আপনি মারা যাবেন, আজাদ দাদা ফিরা আসবে তো!'

মা কিছুই খান না। একদিন, দুদিন।

মহুয়া বলে, ‘আম্মা, আপনি কি আত্মহত্যা করতে চান? আত্মহত্যা মহাপাপ। আপনি মারা গেলে আমরা কার কাছে থাকব আম্মা।’

মায়ের হুঁশ হয়। তিনি তাঁর চোখের সামনে দেখতে থাকেন তাঁর ভাগ্নে-ভাগ্নি চঞ্চল, কচি, টিসুর অপ্রাপ্তবয়স্ক মুখ, জায়েদ, টগরের শয্যাশায়ী শরীর, তিনি মরে গেলে এরা কোথায় যাবে, কার কাছে থাকবে?

মহুয়া একটা থালায় ভাত বেড়ে টেবিলে রাখে। তাঁকে ধরে জোর করে এনে খাবার টেবিলে বসায়। মা খাবেন বলেই আসেন। দুদিন খান না। পেটে খিদেও আছে। তাঁর সামনে থালায় ভাত। মহুয়া আনতে গেছে তরকারি। ভাত। ভাতের দিকে তাকিয়ে মায়ের পুরো হৃৎদপিণ্ডখানি যেন গলা দিয়ে দুঃখ হয়ে, শোক হয়ে, শোচনা হয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তিনি ভাতগুলো নাড়েন-চাড়েন। তাঁর মনে পড়ে যায়, রমনা থানার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আজাদ কেমন করে বলেছিল, ‘মা, ভাত খেতে ইচ্ছা করে। দুই দিন ছেলে আমার ভাত খায় না। তারপরেও তো কেটে যাচ্ছে দিনের পর দিন। তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে। এই প্রথম, আজাদ নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার পরে, তিনি কাঁদেন।

তাঁকে কাঁদতে দেখে বাড়ির ছেলেমেয়েরাও বিনবিনিয়ে কাঁদতে থাকে। আজাদের মায়ের আর ভাত খাওয়া হয়ে ওঠে না। তখন সারাটা দুনিয়ায় যেন আর কোনো শব্দ নাই। কেবল কয়েকজন বিভিন্ন বয়সী নারী-পুরুষের কান্নার শব্দ শোনা যায়। তারা আপ্রাণ চেষ্টা করছে চোখের জল সামলাতে, বুকের ভেতর থেকে উঠে আসা রোদনধ্বনি দমন করতে, তারা পারে না।

রাত্রিবেলা সবাই ভাত খাচ্ছে। মহুয়া মায়ের কাছে যায়। ‘আম্মা, দুইটা রুটি সেঁকে দেই। খাবেন?’

মা মাথা নাড়েন। খাবেন।

তাঁকে রুটি গড়িয়ে দেওয়া হয়। একটুখানি নিরামিষ তরকারি দিয়ে তিনি রুটি গলায় চালান করেন।

খাওয়ার পরে, শোয়ার সময় তিনি আর খাটে শোন না; মহুয়া, কচি, টিসু অবাক হয়ে দেখছে গত দু রাত ধরে আম্মা মেঝেতে পাটি বিছিয়ে শুইছেন। তারা বিস্মিত হয়, বলে, ‘আম্মা, এইটা কী করেন, আপনে মাটিতে শুইলে আমরা বিছানায় শুই কেমনে’, কিন্তু আম্মা কোনো জবাব না দিয়ে মেঝেতেই শুয়ে পড়েন। মাথায় বালিশের বদলে দেন একটা পিঁড়ি।

তখন কচি, ১১ বছর বয়স, মহুয়াকে বোঝায়, ‘আম্মা যে দেখছে রমনা থানায় দাদা মেঝেতে শুইয়া আছে, এই কারণে উনি আর বিছানায় শোয় না, না বুজি!’

এর পরে আজাদের মা বেঁচে থাকেন আরো ১৪ বছর, ১৯৮৫ সালের ৩০শে আগস্ট পর্যন্ত, এই ১৪ বছর তিনি কোনো দিন মুখে ভাত দেননি। একবেলা রুটি খেয়েছেন, কখনও কখনও পাউরুটি খেয়েছেন পানি দিয়ে ভিজিয়ে। মাঝে মধ্যে আটার মধ্যে পেঁয়াজ-মরিচ মিশিয়ে বিশেষ ধরনের রুটি বানিয়েও হয়তো খেয়েছেন। কিন্তু ভাত নয়। এই ১৪ বছর তিনি কোনো দিন বিছানায় শোননি।

তিনি আবার যান জুরাইনের মাজার শরিফের হজুরের কাছে, হজুরাইনের কাছে। হজুর তাঁকে অভয় দিয়ে বলেন, ‘ইনশালাহ, আজাদ ফিরে আসবে। শিগগিরই আসবে।’

একদিন জাহানারা ইমাম আসেন আজাদের মায়ের কাছে। তাঁরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেন। অনেকক্ষণ কেউ কথা বলতে পারেন না। তারপর আজাদের মা মুখ খোলেন, ‘বোন, কী সর্বনাশ হয়ে গেল। আপনার রুমীকেও নাকি ধরে নিয়ে গেছে!’

আজাদের মার মুখে আজাদকে কীভাবে ধরা হলো, তার বৃত্তান্ত শোনেন জাহানারা ইমাম। তারপর আজাদের মা তাঁকে দেখান সেই ঘরটা, স্টিলের আলমারিতে এখনও রয়ে গেছে গুলির দাগ। মেঝেতে রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে আছে। দেয়ালে গুলি আর রক্তের চিহ্ন।

‘বোন রে, বড় মেরেছে আমার আজাদকে। চোখমুখ ফুলে গেছে। সারা গায়ে মেরে ফাটিয়ে দিয়েছে। গায়ে রক্তের দাগ। মারের দাগ।’ আজাদের মা বলেন।

‘আপনি দেখেছেন আজাদকে?’

‘হ্যাঁ। রমনা থানায়।’

‘দেখা করতে দিল আপনাকে!’

‘হ্যাঁ।’

‘কী বলল সে আপনাকে?’

‘বলল, মা, খুব মারে। ভয় লাগে, যদি মারের চোটে বলে দেই সবকিছু।

‘আপনি কী বললেন?’

‘বললাম, বাবা, কারো নাম বলোনি তো। বোলো না। যখন মারবে, শক্ত হয়ে থেকে সহ্য কোরো।’

জাহানারা ইমাম ইস্পাতের মতো শক্ত হয়ে যান। কী শুনছেন তিনি এই মহিলার কাছে? তাঁকে তিনি শক্তই ভেবেছিলেন, কিন্তু এত শক্ত! গভীর আবেগে জাহানারা ইমামের দু চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে। তিনি আবারও সাফিয়া বেগমকে জড়িয়ে ধরেন।

জুয়েলের মা ফিরোজা বেগম আসেন আজাদদের বাসায়। টগরের চাচি হিসেবে তিনি সাফিয়া বেগমের পূর্ব পরিচিত। এখন পরিস্থিতি তাদের আরেক অভিন্ন তলে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তাদের দুজনের ছেলেই ধরা পড়েছে পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে।
দুজন দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন নীরবে। কী করা যায়, এই বিষয়ে তারা মৃদুকণ্ঠে শলাপরামর্শ করেন।
তারা একদিন দুজনে মিলে যান সৈয়দ আশরাফুল হকদের বাসায়। আশারফুলের মাকে বলেন, বাবু (আশরাফুলের ডাকনাম) যেন বাসায় না থাকে। পারলে যেন ইন্ডিয়া চলে যায়...
আশরাফুল অবশ্য তার আগেই তার বাসা থেকে চলে গেছে অন্য গোপন আশ্রয়ে।

৪৮

হাসপাতালে বিছানায় শুয়ে আছে টগর আর জায়েদ।
লক্ষ লক্ষ পাখি স্বাধীনতা স্বাধীনতা বলে কানের কাছে কলকলিয়ে উঠতে শুরু করে।
টগর বুঝতে পারে, তার জ্ঞান ফিরে আসছে।
খানিকটা ধাতস্থ হলে তার মনে পড়ে, পাশের বিছানায় জায়েদেরও শুয়ে থাকবার কথা।
সে ঘাড় ঘোরায়। ওই তো জায়েদ।
সে বলে, 'জায়েদ, পা তো নাড়াইতে পারি না। তুই পারিস?'
টগরের বাবা আলাউদ্দিন চৌধুরী আসেন কার্গো-ভরা সুপারি নিয়ে, পটুয়াখালী থেকে সদরঘাটে। ঢাকায় পা রেখেই শুনতে পান দুঃসংবাদটা। ছেলে তার গুলিবিদ্ধ। তিনি দৌড়ে যান হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে।
ধীরে ধীরে জায়েদ আর টগর অনেকটা সেরে ওঠে। তাদের এই হাসপাতাল থেকে যত তাড়াতাড়ি সরিয়ে নেওয়া যায় ততই মঙ্গল। ডিসচার্জ করার কাগজপত্র সব তৈরি করাচ্ছেন টগরের বাবা আলাউদ্দিন চৌধুরী। হলি ফ্যামিলির ডাক্তাররা আর ফাদাররা যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন এবং করছেন। তারা বিল কয়েক হাজার টাকা কমিয়ে দিয়েছেন।
এই সময় টগর হাসপাতালের বিছানায় উঠে বসে। নিজের পেটের কাছে ক্ষতস্থানে হাত বুলোতে বুলোতে হঠাৎই দেখে, শক্তমতোন কী যেন দেখা যায়। ব্যাপার কী?
সে বলে, 'বাবা বাবা, আমার পেটে এটা কী দেখেন তো? শক্ত।'
বাবা আসেন। দেখেন। বুঝতে পারেন না ছেলের পেটে জিনিসটা কী আসলে। তিনি ডাক্তার ধরে আনেন একজন। ডাক্তার সাহেব টগরের পেটে হাত দিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, 'ওটা কিছু না। বুলেট।'
'বুলেট? বলেন কী?' টগরের বাবা আঁতকে ওঠেন।
ডাক্তার ভাবলেশহীন মুখে বলেন, 'ওতে কোনো ক্ষতি হবে না। থাকুক।'
'পরে যদি অসুবিধা হয়?' আলাউদ্দিন চৌধুরীর কণ্ঠে উদ্বেগ।
'পরেও হওয়ার কথা নয়। হলে আমরা তো আছিই।'
'না না। পরে আর আসা যাবে না। আপনারা এখনই এটা বের করার ব্যবস্থা নিনা।'
ডাক্তার হেসে বলেন, 'কী টগর। তুমি কী বলো? বুলেটটা পেটে রাখবে, না বের করবে?'
টগরও ঘাড় শক্ত করে বলে, 'বার করব।'
'আচ্ছা তাহলে তুমি বসো। আমি ব্যবস্থা করছি।' ডাক্তার সাহেব বাইরে যান।
কী বলেন ডাক্তার সাহেব। এখনই করবে নাকি? টগর বিস্মিত।
ডাক্তার এসে বলেন, 'এখানে তো এক্স-রে মেশিন নষ্ট। আপনি বাইরে থেকে এক্স-রে করিয়ে আনেন।'
টগরের বাবা টগরকে নিয়ে গিয়ে এক্স-রে করিয়ে আনান। ডাক্তার সাহেব রিপোর্ট দেখে বলেন, 'আরেকটা অপারেশন করতে হবে। তবে এটা ছোট অপারেশন। পেটের বাইরের দিকে আছে বুলেটটা।
লোকাল অ্যানেসথেসিয়া দিয়ে ডাক্তাররা টগরের পেটে অস্ত্রোপচার করেন। টগর সব বুঝতে পারে। বুলেটটা বের করে ডাক্তার সাহেব টগরের হাতে দিয়ে বলেন, 'ধরে থাকো।'
টগর ওটা ধরেই থাকে। সেই বিকালেই টগরকে হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে টগরের বাবা নিয়ে যান আজাদদের মগবাজারের বাসায়। টগরের হাতে তখনও ধরা আছে বুলেটটা। আজাদদের বাসার কাছেই শিল্পী আবদুল জব্বারের বাসা। তার সামনে একটা সজনে গাছ। সেই গাছের কাছে এসে কী মনে করে টগর বুলেটটা ফেলে দেয় গাছের গোড়াটা লক্ষ্য করে।
এর পরে টগরকে তার বাবা নিয়ে যায় বরিশালে।
ইতিমধ্যে জায়েদকেও হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে এনেছেন সাফিয়া বেগম।

৪৯

জাহানারা ইমাম রুমীর একটা ফটো দোকানে দিয়েছিলেন এনলার্জ করতে। ৮ বাই ১০ ইঞ্চি ছবিটা তিনি আজকেই নিয়ে এসেছেন দোকান থেকে। সঙ্গে এনেছেন ফটোস্ট্যান্ড। ফটোটা স্ট্যান্ডে লাগিয়ে তিনি তাকিয়ে থাকেন সেটার দিকে। কত দিন এই মুখ তিনি দেখেন না!

দিন কেটে যাচ্ছে। একটা একটা করে দিন কেটে যায়। আজ ৫০ দিন হলো রুমীকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে। 'রুমী, আজ ৫০টা দিন হলো তোমাকে আমি দেখি না, ভাবা যায়!' জাহানারা ইমাম দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। তাদের পরিবারে সবারই মনের অবস্থা খারাপ। দুঃখ, হতাশা, নিষ্ফল ক্রোধ, ভয়, ভীতি-সব মিলে তাদেরকে কি পাগল বানিয়ে ছাড়বে? তাঁর স্বামী শরীফ ইমামের শরীর দ্রুত ওজন হারাচ্ছে। তিনিও শুকিয়ে যাচ্ছেন। তবে সবাই বলে, রুমীর মাকে নিয়ে ভয় নাই, কারণ তিনি কাঁদেন, হাহুতাশ করেন, মনের বাষ্প বের করে দেন। কিন্তু রুমীর বাবা শরীফ কথা বলেন কম, কাঁদেন না, হা-হুতাশ করেন না। দৈনন্দিন সব কাজ তিনি করে চলেছেন নিখুঁতভাবে, সকালে উঠে শেভ, গোসল, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শোনা, অফিস, বিকালে টেনিস, সন্ধ্যায় আবার স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শোনা, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আলোচনা-সবই তিনি এমনভাবে করছেন, যেন তাঁর মনে কোনো দুঃখ নাই, যেন তাঁর ছেলেকে সৈন্যরা ধরে নিয়ে যায়নি।

কিন্তু জাহানারা ইমাম এতটা শান্ত ভাব বজায় রাখতে পারেন না। ছেলের ছবির দিকে তাকিয়ে তিনি বিড়বিড় করতে থাকেন : 'এই কি ছিল বিধিলিপি, রুমী? তুমি কি কেবল ছবি হয়েই থাকবে আমাদের জীবনে?'

রুমীর ধরা পড়ার রাতেই, জাহানারা ইমাম যখন রুমীর মাথায় বিলি কেটে দিচ্ছিলেন, হঠাৎ রেডিওতে গান বেজে উঠল, খুদিরামের সেই বিখ্যাত ফাঁসির গান, একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি, হাসি হাসি পরব ফাঁসি, দেখবে জগৎবাসী...

তবে কি রুমী চলেই গেল? ফিরে আসবে মাসীর ঘরে, গলায় ফাঁসির দাগ দেখে তাকে চিনে নিতে হবে?

তা কি হয়? রুমীকি চলে যেতে পারে? এই অল্প বয়সে? কেবল আইএসসি পাস একটা ছেলে? কেবল ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে যে ভর্তি হয়েছে!

রুমী আবৃত্তি করত খুব ভালো। জীবনানন্দ দাশের এই কবিতাটাও তার গলায় দারুণ ফুটে উঠত

আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়-হয়তো বা শঙ্খচিল মানুষের বেশে
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন এ কাঁঠাল ছায়ায়...

জাহানারা ইমামের দু চোখ জলে ভিজে আসছে। তিনি বিড়বিড় করেন, রুমী, তোমাকে ফিরে আসতেই হবে, আসতেই হবে।

চোখ মুছে ছবিটার নিচে এক টুকরো কাগজে বড় বড় অক্ষরে তিনি লেখেন : আবার আসিব ফিরে—এই বাংলায়। ফটোটা তিনি রাখেন নিচতলায় বসবার ঘরে, কোনার টেবিলে। আগামীকাল ২০ নভেম্বর, ঈদ। অনেক মানুষ আসবে এই বাসায়। সবাই দেখুক, কোমরে হাত দিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়ানো রুমী কীভাবে সদর্পে ঘোষণা করছে-আবার আসিব ফিরে-এই বাংলায়।

৫০

সাফিয়া বেগম সারা রাত ঘুমান না। রোজ রাতের বেলা মেঝেতে শাড়ি বিছিয়ে শোন বটে, কিন্তু দু চোখে তাঁর ঘুম আসে না। তাঁর মনে হয়, যদি আজাদ ফিরে আসে, এসে যদি দেখে দরজা বন্ধ, চারদিকে শত্রু, কারফিউ-কণ্টকিত একেকটা রাত, এর মধ্যে ও তো চিৎকার করে মা মা বলে ডাকতে পারবে না, আহা রে, ছেলেটা সারা রাত কি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে! তিনি চোখের পাতা এক করতে পারেন না। কোথায় নিতে পারে ওরা তার ছেলেকে? কোনো জেলখানায়? ঢাকা জেলখানায় তিনি গিয়েছিলেন নিজে, জেলারের সঙ্গে দেখা করেছেন, ওখানে আজাদ নাই। অবশ্য অন্য কোনো জেলখানায় থাকতে পারে। এমনও হতে পারে, ওরা ওকে নিয়ে যেতে পারে পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো জেলখানায়। বিচার না করে তো আর ফাঁসি দেবে না? নাকি দেবে?

জুরাইনের বড় হুজুর বলেছেন, আজাদ জিন্দা আছে। সহি-সালামতে আছে। তিনি দিব্যচোখে না দেখতে পেলে কেন বলবেন? তাঁর মিথ্যা কথা বলার কী আছে? জুয়েলের মাও আসে এই বাসায়। রুমীর মা আসে। সেকেন্দারের মা আসে। সেকেন্দারের বাবা তো জয়েন সেক্রেটারি। সবাই তো চেষ্টা কম করছেন না। এত তদবির উপেক্ষা করে কি ছেলেগুলোর অনিষ্ট করা সম্ভব?

আর তাঁর বুকটা কেঁপে ওঠে অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে তিনি শুনতে পান ছক্কু মিয়ার বিচ্চুগুলার নানা কাণ্ডকীর্তির কথা। মুক্তিযোদ্ধারা চারদিক থেকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে পাকিস্তানি সৈন্যদের। ওদের দিন আসছে ফুরিয়ে। দেশ স্বাধীন হবেই। জুরাইনের বড় হুজুরও তা-ই বলেন। ওরা নাকি মসজিদে

পর্যন্ত গুলি করেছে। মেয়েদের ওপর অত্যাচার করছে। এই অত্যাচার আল্লাহ কেন সহ্য করবেন।

মহুয়া কচি এরা কিছু বোঝে না। তারা তাঁকে বলে ভাত খেতে। আবার কচি বলে, 'আম্মা, তুমি কি আর কোনো দিনও ভাত খাইবা না?' আরে খাব না কেন? নিশ্চয় খাব। আজাদ ফিরে আসবে। ও খুবই ভাতের পাগল। এসেই তো ভাত খেতে চাইবে। এখন কি কাওরানবাজারে পাবদা মাছ পাওয়া যাবে? জায়েদ অসুস্থ হওয়ায় হয়েছে অসুবিধা। ওকে আর আগের মতো কথায় কথায় বাজারে পাঠানো যাচ্ছে না। আজাদ ফিরে এলে পাঠাতে হবে। পাবদা মাছের পাতলা ঝোল করতে হবে। বাজারে টমেটো উঠেছে। টমেটো ধনেপাতা দিয়ে সুন্দর করে রাঁধতে হবে। আজাদ ভাত খাবে। আ দেখব। তারপর আজাদ নিজেই আমার মুখে এক গ্রাস ভাত তুলে দেবে। ও যা পাগল। ও সব পারে।

দেশ যখন স্বাধীন হবে, তখন কি আর ওরা ওকে আটকে রাখতে পারবে? পারবে না। আল্লাহ মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে তুমি থেকো আল্লাহ। এরা ন্যায়ের পক্ষ। এদের ট্রেনিং কম, অস্ত্র কম, সব ছাত্রমানুষ, কিষান-মজুর—এরা হয়েছে মুক্তিযোদ্ধা! এদের পাশে থাকতে হবে, হে আল্লাহ, তোমাকে। তাই তো তুমি আছ। তাই তো শুধু খবর আসছে এখানে ওখানে প্রচণ্ড যুদ্ধের আর মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয়ের।

আজাদের মায়ের চোখ দুটো একটু ধরে আসে। দূরে কোথায় যেন গোলাগুলির শব্দ হয়। তাঁর ঘুম আবার যায় ভেঙে।

৫১

আজাদের মা ভাত খান না, বিছানায় শোন না, তবু দিন গড়িয়ে যায়, সূর্য ওঠে, সূর্য অস্ত যায়, মেলাঘরের মুক্তিযোদ্ধারা নতুন করে পরিকল্পনা আঁটতে থাকে, নতুন নতুন গেরিলারা প্রশিক্ষণ শিবির থেকে বেরিয়ে ঢুকে যেতে থাকে বাংলায়, কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে গেরিলাদের আক্রমণে সারাটা টাঙ্গাইলে ময়মনসিংহে পাকিস্তানি বাহিনী মার খেতে থাকে, হেমায়েতের নেতৃত্বে দক্ষিণ বাংলায় চলে দুর্ধর্ষ গেরিলা অভিযান, মাহবুব আলমেরা ঢুকে পড়ে তেঁতুলিয়া দিয়ে, সারা বাংলাদেশের প্রতিটা সীমান্তেসেক্টর কম্যান্ডারদের নেতৃত্বে বাংলাদেশের নিয়মিত বাহিনী, সেনাসদস্য, ইপিআর, পুলিশ, আনসার, আর লক্ষাধিক মুক্তিবাহিনী জলে-ডাঙায় শানাতে থাকে আক্রমণ, বাংলার নদ-নদী বৃষ্টি বর্ষা ধানক্ষেত কাদামাটি ফাঁদ পেতে রাখে হানাদারদের জন্যে, বাংলার ফুল-ফল পাখি-পতঙ্গ আশ্রয় দেয় মুক্তিদের, বাংলার প্রতিটা ঘর দুর্গ হয়ে ওঠে, বাংলার প্রতিটা মানুষ হয়ে ওঠে মুক্তিযোদ্ধা, আর যুদ্ধাহত হন খালেদ মোশাররফ, তবুও সেক্টর টু-র গেরিলা ওয়ারফেয়ার আরো গতি পেতে থাকে, আরবান গেরিলারা ঘিরে ফেলে ঢাকার চারপাশ, ওই তো গান গাইতে গাইতে এগিয়ে আসছেন শিল্পী আজম খান, ওই তো রক্তে আগুনে ক্যানভাস রাঙাবেন বলে ক্রলিং করে অ্যাম্বুশ পাতছেন চিত্রশিল্পী শাহাবুদ্দিন, কবির কলম ফেলে রাইফেলের ট্রিগারের সঙ্গে মিতালী গড়েছেন হেলাল হাফিজ, রফিক আজাদ, আবু কায়সার, মাহবুব সাদিক।

সারা বাংলাদেশ যুদ্ধ করছে। শাহাদত চৌধুরীর মাকে তাঁর এক গণিতজ্ঞ ভাই কিছুদিন আগে বলেছিলেন, 'আমাকে অঙ্কের হিসাবে বলো, এক পরিবারের কয়জন গেছে মুক্তিযুদ্ধে, ঢাকার রাস্তায় কয়টা পটকা ফোটালেই একটা প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীকে হারানো যায় না, ধরো তোমার ছয় ছেলে, কয়জন যুদ্ধে গেছে, আমার চার ছেলে, তারা তো বাসাতেই বসে আছে, আমি একজন মুক্তিযোদ্ধার মায়ের মুখ থেকে শুনতে চাই, আমার ছেলে যুদ্ধে গেছে।' তাঁকে মা তখন কিছু বলেননি; ৩০শে আগস্ট ৭১ তাঁর বাড়িতে পাকিস্তানি সৈন্যরা হানা দিয়ে তাঁর জামাতা বেলায়েতকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর তিনি আশ্রয় নেন তাঁর এই গণিতজ্ঞ ভাইয়ের বাড়িতেই। এবার তিনি ভাইয়ের পুরনো প্রশ্নের জবাব বুঝিয়ে দেন, 'আপনি মুক্তিযোদ্ধার মাকে দেখতে চেয়েছিলেন, আমাকে দেখেন, আমার ছয় ছেলের তিনজনই গেছে মুক্তিযুদ্ধে, আমি অঙ্কের হিসাবে দেখি দু কোটি যুবকের এক কোটিই যোদ্ধা, বলেন, দেশস্বাধীন হবে কি না?'

আজাদের মা ভাত খান না, বিছানায় শোন না, ঢাকায় এক রাতে ধরা পড়ে অনেক গেরিলা, অনেক অস্ত্রশস্ত্র, কিন্তু আবারও ঢাকায় ঢুকে পড়ে গেরিলারা, রাইসুল ইসলাম আসাদের নেতৃত্বে ওই তো এগিয়ে যাচ্ছে মুক্তিযোদ্ধারা বায়তুল মোকাররমে, সেনাবাহিনীর দুটো লরির মধ্যে হাইজ্যাক করা গাড়িতে বোমা পেতে রেখে একই সঙ্গে উড়িয়ে দিচ্ছে দুটো লরিই, বোমা বিস্ফোরিত হয় টিভি ভবনের ছয় তলায়, ঢাকার উত্তরে মানিক বাহিনীর তৎপরতা, আর দক্ষিণে ক্রাক প্লাটুন, ভায়াডুবি ব্রিজ ওড়াতে গিয়ে শত্রু বাহিনীর গুলি ভেদ করে মানিকের শরীর, পানি থেকে তার রক্তাক্ত গরম শরীরটাকে তোলে সহযোদ্ধা নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু, মৃত্যুর আগে ঠোঁট নেড়ে কী যেন বলতে চায় মানিক, কিন্তু কথা শেষ হওয়ার আগেই ঠোঁটের স্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়, বাচ্চুর বিশ্বাস হয় না মানিক নাই, কিন্তু মানিক ততক্ষণে শহীদ, মানিক নাই, মানিকেরা থাকে না, কিন্তু যুদ্ধ এগোতে থাকে, তখন সেকেন্ড ইন কম্যান্ড বাচ্চুগ্রহণ করে নেতৃত্ব; পানির নিচে নেমে যাচ্ছে নৌ কম্যান্ডোরা, একই সময়ে চট্টগ্রাম, খুলনা, চাঁদপুর, বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকায় ডুবিয়ে দেওয়া হবে জাহাজ, তিনশ নৌ কম্যান্ডো অপেক্ষা করছে কখন আকাশবাণীতে বাজবে আমি তোমায় শুনিয়েছিলাম আমার যত গান, নেমে গেল যোদ্ধারা জলে, আবার অপেক্ষা পরের গানের জন্যে, আমার পুতুল আজকে প্রথম যাবে শ্বশুরবাড়ি, জিরো আওয়ার, আঘাত করো, একসঙ্গে হঠাৎই ডুবে গেল ১০টা

জাহাজ : অপারেশন জ্যাকপট, সেপ্টেম্বরে আবার পরিচালিত হয় অপারেশন জ্যাকপট-২, ধীরে ধীরে ঘেরাও হতে থাকে ঢাকা, চারদিকে ১৬ হাজার গেরিলা... সাভারের উপকণ্ঠে অ্যাম্বুশ করে আছেন বাচ্চুরা, ডিসেম্বরের ১৩ তারিখ, ৩৩ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট ফিরে আসছে আহত ব্যাঘ্রের ক্ষোভ আর ক্রোধ নিয়ে টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ থেকে, তাদের আক্রমণ করতে, বাচ্চুদের সঙ্গে আজ আছে একটা কিশোর ছেলে টিটো, ও ঠিক যোদ্ধা নয়, অপারেশনে অতটুকুন ছেলের আসার কথা নয়, সে ক্যাম্পে থাকে, নানা কাজকর্মে সাহায্য করে, এ-ই তো যথেষ্ট এক কিশোরের জন্যে, ও কেন এসেছে, শুরু হয় ঘোরতর যুদ্ধ, মাথার ওপর দিয়ে শিস দিয়ে যাচ্ছে শত্রুর ছোড়া গোলাগুলি, একটা খবর জানানো দরকার মুক্তিযোদ্ধাদের একটা রিজার্ভড অংশকে, টিটোকে সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়, কিন্তু ও তো ছোট, ও তো যুদ্ধের নিয়মকানুন জানে না, হায় আলাহ, ওকে বাঁচিয়ে রাখো, ওই তো বাচ্চুর চোখের সামনে হাত তিরিশেক দূরে লুটিয়ে পড়ল টিটোর শরীর, ততক্ষণে টিটো অবশ্য তার ওপরে অর্পিত কাজটা সম্পন্ন করেছে, সঙ্গীদের জানিয়ে দিয়েছে তখনকার কর্তব্যনির্দেশ, শত্রুরা পিছিয়ে যায়, ছন্নছাড়া হয়, টিটোর রক্তাক্ত ছোট্ট শরীরটা আনা হয় ক্যাম্পে, টিটো বাঁচতে চায়, সে দেখতে চায় স্বাধীনতা, 'আমাকে বাঁচান, আমি স্বাধীনতা দেখতে চাই', কিন্তু টিটো মরে যায়, সাভারের মাটিতে তাকে সমাহিত করে রাখে সহযোদ্ধারা, তারপর এগোতে থাকে ঢাকার দিকে, এগিয়ে আসে মিত্রবাহিনী-মুক্তিবাহিনী...

সম্মুখসমরে ২৭ জন পাকিস্তানি সৈন্য খতম করে মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া আর ফতেহ চৌধুরীরা খানিক পিছিয়ে আসে বালু নদী থেকে। মধ্য ডিসেম্বরের এই সময়টায় বেশ কুয়াশা পড়ছে। ভোরের আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে তারা দেখতে পায় মেজর হায়দারকে। তাঁর পরনে পুরো কম্যান্ডো পোশাক। মেজর হায়দার বলেনঃ 'এবার ফাইনাল আঘাত। ঢাকা দখল। সবাই প্রস্তুত।'

আজাদের মাকে শুভার্থীরা পরামর্শ দেন মগবাজারের বাসা ছেড়ে দিতে, কেননা ওখানে থাকা নিরাপদ নয়, তিনি বাসাটা ভাড়া নেওয়া ছাড়েন না, নিয়মিত ভাড়া দেন, যদি আজাদ ছাড়া পায়, যদি এসে দেখে বাসায় কেউ নাই, কিন্তু তাঁরা চলে যান মালিবাগে, যাওয়ার আগে পড়শিদের ভালো করে বুঝিয়ে বলে যান, আজাদ এলে যেন তাকে তারা বলে যে মালিবাগের আগের বাসায় গেলেই হবে, '৭২ সাল পর্যন্ত মগবাজারের বাসার ভাড়া গুনেছেন তিনি, অবশেষে ছেড়ে দেন, এদিকে চৌধুরী সাহেবের পক্ষ থেকে কামরুজ্জামান আসতে থাকে আজাদের মায়ের কাছে, এখনও চলেন চৌধুরীর কাছে, আজাদের বাবাও তাঁর প্রথম ছেলেকে হারিয়ে মুষড়ে পড়েছেন, তিনি নানাভাবে চেষ্টা চালিয়েও ছেলের খোঁজ বের করতে পারেন না, আজাদের বাবার পানাসক্তি বেড়ে যায়, একেকটা রাতে তিনি 'আজাদ আজাদ' বলে নিজের চুল ছেঁড়েন, আজাদের ছোটমাকে অভিযুক্ত করেন নানা অভিযোগে, লোক পাঠিয়ে দেন সাফিয়া বেগমের কাছে, নানাভাবে মিনতি করেন যেন সাফিয়া বেগম তাঁর বাড়িতে ফিরে যান, কিন্তু আজাদের মা অনড়, প্রশ্নই আসে না চৌধুরীর কাছে ফিরে যাওয়ার, এ তাঁর নিজের যুদ্ধ, এ যুদ্ধে তিনি হেরে যেতে পারেন না।

আজাদের মা ভাত খান না, বিছানায় শোন না, অপেক্ষায় থাকেন ছেলে আসবে বলে, আর খোঁজ বের করার চেষ্টা করেন ছেলের, রমনা থানায় যান, তেজগাঁও থানায় যান, এমপি হোস্টেলে যান, ছেলের খবর পাওয়া যায় না, অথচ বড় হুজুর আশ্বাস দিয়েছেন আজাদ বেঁচে আছে, সে ফিরে আসবেই।

এই আশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকেন, দিনগুজরান করেন মহিলা।

রুমীর কোনো খবর নাই, প্রতিদিন মগবাজারের পাগলাবাবার দরবারে যান জাহানারা ইমাম। সেখানে গিয়ে দেখতে পান আলতাফ মাহমুদের আত্মীয়স্বজনদের, ঝিনু মাহমুদ, মোশফেকা মাহমুদ, দেখতে পান চট্টগ্রাম দুর্নীতি দমন বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর নাজমুল হকের স্ত্রীকে, বরিশালের এডিসি আজিজুল ইসলামের স্ত্রীকে, কুমিলার ডিসি শামসুল হক খানের স্ত্রীকে, রাজশাহীর রেডিও ইঞ্জিনিয়ার মহসীন আলীর স্ত্রীকে, চট্টগ্রামের চিফ পানিং রেলওয়ে অফিসার শফি আহমেদের স্ত্রীকে, কুমিলার লে. ক. জাহাঙ্গীরের স্ত্রীকে, কুমিলার মেজর আনোয়ারুল ইসলামের স্ত্রীকে এবং এ রকম বহু। এদের সবারই স্বামী নিখোঁজ। তাঁরা পরস্পরের দুঃখের কাহিনী শোনেন। এদের মধ্যে থেকে জাহানারা ইমাম তাঁর নিজের ছেলেকে হারানোর শোক অনেকটা ভুলে থাকতে পারেন। পিএসপি আওয়াল সাহেবের স্ত্রী আসেন ছোট ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে, জাহানারা জানেন তাঁর তিন ছেলে মুক্তিযুদ্ধে গেছে, কিন্তু ভুলেও সে কথা তারা আলোচনা করেন না, উলফতের বাবা আজিজুস সামাদ ছাড়া পাওয়ার পরে তাঁর স্ত্রী তাঁকে আনেন পাগলাবাবার কাছে, কিন্তু ভুলেও জাহানারা তাঁকে শুধান না উলফত বা আশফাকুস সামাদের কথা।

এরই মধ্যে একদিন খবর আসে, ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাতে, ইয়াহিয়ার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার আগের রাতে, ঢাকায় শখানেক মুক্তিযোদ্ধাকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে। জাহানারা ইমাম ছুটে যান আজাদের মায়ের কাছে, আজাদের মা আজাদের কোনো খবর আর পাননি। জাহানারা ইমামের মনে এই আশঙ্কা জাগে যে, কেউ নাই, রুমী নাই, বদি নাই, বাকের নাই, জুয়েল নাই, আজাদ নাই, বাশার নাই, আলতাফ মাহমুদ নাই...

রুমীর মা অপেক্ষায় থাকেন যে রুমী ফিরে আসবে, আজাদের মা ভাত বেড়ে নিয়ে বসে থাকেন যে তাঁর ছেলে এসেই ভাত খেতে চাইবে, রুমী আসে না, আজাদ আসে না,

জুয়েলের মা দিন গোনেন কবে ফিরে আসবে তার ছেলে, জুয়েল ফেরে না, বদির মা জানে না ছেলে তার কোন জেলখানায়, তার দিন যেন কাটতে চায় না, বাশারের মা ছেলেকে স্বপ্নে দেখে কেঁদে ওঠেন ঘুমের ভেতরে, জয়েন সেক্রেটারি এ আর খানের ছেলে সেকেন্দার হায়াত খান ফেরে না আর বাড়ি, তার মাও অপেক্ষা করেন, স্বামীকে মিনতি করেন আরেকটু সচেষ্ট হতে, ছেলেকে উদ্ধার করতে, তিনি এসে দেখা করেন আজাদের মায়ের সঙ্গে, মনোয়ার হোসেনের স্ত্রী দুলু রাতের বেলা বিনবিনিয়ে কাঁদে, লীনার বয়স বাড়ে একটু একটু করে মুক্তিযুদ্ধের বয়সের মতোই, আর স্বাধীনতা নিকটবর্তী হতে থাকে, ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়, পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করে, মুক্তিবাহিনী আর মিত্র বাহিনী দ্রুত এগিয়ে আসতে থাকে ঢাকার দিকে, গভর্নর হাউসে মিটিং চলাকালে আকাশ থেকে এসে পড়ে ভারতীয় বিমানের বোমা।

৫২

আজাদের মায়ের অনুরোধে পুলিশ সুবেদার খলিল একবার যান নাজিমুদ্দিন রোডের কেন্দ্রীয় কারাগারে। তখন ঢাকার আকাশ দিয়ে চক্কর দিচ্ছে ভারতীয় বিমান, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আর মুক্তিযুদ্ধে বিজয় তখন ঘণ্টার হিসাবে গণনা করার বিষয় মাত্র। জেলখানার এক বাঙালি কর্তার সঙ্গে দেখা করেন তিনি।

বলেন, 'আমার এক আত্মীয় অ্যারেস্ট হইছিল। খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না। দেখেন তো আছে নাকি?'

'নাম বলেন। পিতার নামসহ...'

'মাগফার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী আজাদ, পিতা ইউনুস আহমেদ চৌধুরী?'

অফিসারটি বন্দিদের নামের তালিকা উল্টেপাল্টে দেখেন। 'না, নাই তো?'

'আবুল বাশার চৌধুরী?' খলিল সাহেব আজাদের মায়ের নিজের হাতে লেখা তালিকাটা পকেট থেকে বের করে পড়েন।

'না নাই।'

'বদিউল আলম?'

'নাই।'

'আবদুল হালিম চৌধুরী জুয়েল?'

'নাই।'

'চুল্লু?

'আছেন'-কর্তাটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

'সামাদ?'

'আছেন'-কর্তাটির মুখ হাসি হাসি। 'মুক্তিযোদ্ধা আরো আছেন। বরিশালের কাজী ইকবাল...'

খলিল সাহেব শঙ্কিত বোধ করেন। তিনি তো বলেননি যে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের খোঁজে এসেছেন...

কর্তাটি তাঁর মুখের ভাষা পড়তে পারেন। বলেন, 'আর বেশি দেরি নাই। দেশ স্বাধীন হতে চলেছে...'

খলিল সাহেব বলেন, 'আর সবাই কোথায়?'

'অন্য জেলে থাকতে পারে।'

'তা পারে।' খলিল সাহেব মাথা নাড়েন।

এই একটা সান্ত্বনা হয়তো তিনি সাফিয়া বেগমকে দিতে পারবেন। ঢাকা জেলে আজাদ নাই। অন্য কোনো জেলে থাকতে পারে। তিনি ধীরে ধীরে কারাগার চত্বর ত্যাগ করেন। মালিবাগে যান আজাদের মায়ের কাছে।

সাফিয়া বেগম দরজা খুলে তাঁর দিকে তাকান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। তিনি বোঝার চেষ্টা করেন, কী নিয়ে এসেছে খলিল। সুসংবাদ, নাকি দুঃসংবাদ।

'কী খবর খলিল, কোনো খোঁজ পেলে?' তিনি কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করেন।

'না। এই জেলখানায় নাই।'

'তাহলে অন্য কোনো জেলখানায় রেখেছে!' সাফিয়া বেগম অকম্পিত স্বরে বলেন।

খলিল জোরে বলে ওঠেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ বুবু। অরা তা-ই কইল। বরিশালের মুক্তিযোদ্ধারে আইনা রাখছে ঢাকায়, ঢাকার ছেলেদের ঢাকার বাইরে পাঠায়া দিছে।'

'তুমি বসো। তোমাকে চা দেই।' সাফিয়া বেগম রান্নাঘরের দিকে চলে গেলে খলিল একটা বড় শ্বাস ফেলে যেন মুক্তির আস্বাদ পান।

এই মুহূর্তটা বড় কঠিন হবে বলে তিনি ভেবেছিলেন। কী করে তিনি আজাদের মাকে বলবেন যে আজাদের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি, এই নিয়ে তিনি সারাটা পথ ভেবে ভেবে সারা হয়ে যাচ্ছিলেন।

কী রকম শক্ত একজন মহিলা হতে পারেন, খলিল ভাবেন।

৫৩

আবাবিল পাখির ছোড়া ঢিলের মতো আকাশ থেকে নেমে আসছে পত্রাঘাত, পাকিস্তানি বাহিনীর প্রতি আত্মসমর্পণের আহ্বান সংবলিত লিফলেট, যত তাড়াতাড়ি পারো সারেন্ডার করো, তোমাদের জেনেভা কনভেনশন অনুসারে মর্যাদা আর নিরাপত্তা দেওয়া হবে, রেডিওতে ঘোষণা দেওয়া হতে থাকে আত্মসমর্পণের আহ্বান, মিত্রবাহিনীর সঙ্গে ঢাকায় ঢুকে পড়ে গেরিলারা, ট্রাকে ট্রাকে মুক্তিবাহিনী মিত্রবাহিনী, জনতা তাদের স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা নেড়ে অভিবাদন জানাচ্ছে, কারফিউ ভেঙে রাস্তা দখল করে নিচ্ছে উলসিত জনতা, মেজর হায়দার ওই তো লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছেন রেসকোর্স ময়দানের দিকে, যাচ্ছেন কাদের সিদ্দিকী, ৯০ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য নিয়ে জেনারেল অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করছে জেনারেল নিয়াজি, মাথা হেঁট, অস্ত্র ফেলে দিতে হচ্ছে মাটিতে...

৫৪

আজাদের মা থাকেন মালিবাগের একটা বেড়ার বাসায়। ১৬ ডিসেম্বরের সকাল থেকেই তিনি শুনতে পাচ্ছেন, দেশ স্বাধীন হয়ে যাচ্ছে, পাকিস্তানি আর্মি সারেন্ডার করতে যাচ্ছে, তাঁর বুকের ভেতরটা আশায় আনন্দে কেমন যে করে, তিনি মহুয়াকে বলেন, 'দেশ স্বাধীন হলে জেলখানা থেকে সব মুক্তিফৌজ তো ছাড়া পাবে, কী বলিস তোরা!' সকাল গড়িয়ে বিকাল হয়, তিনি একবার ঘরে যান, আবার বেরিয়ে আসেন, ডিসেম্বরের বিকালের হলদেটে আলো এসে পড়ে দাওয়ায় দাঁড়িয়ে থাকা আজাদের মায়ের মুখে। ডালু এসে বলে, 'আম্মা, মুক্তিবাহিনী আর মিত্রবাহিনী ঢুইকা পড়ছে, আর চিন্তা নাই, দেশ স্বাধীন', মা বলেন, 'তাহলে চল, যাই, মগবাজারের বাসায় যাই, আজাদ যদি ছাড়া পেয়ে চলে আসে!'

'এখন যাইবা। চারদিকে গোলাগুলির আওয়াজ, এর মাঝে?'

'হ্যাঁ।'

'কাইলকা যাই চলো।'

'না। আজকেই যাব।'

ডালু জানে তার খালার জেদ, তার খালার তেজ, সে আর 'না' করে না। সাফিয়া বেগম একটা থলেতে করে মগবাজারে বাসায় যাওয়ার জন্যে জিনিসপত্র গোছগাছ করেন। রিকশা জোগাড় করে সাফিয়া বেগমকে নিয়ে ডালু রওনা হয় মগবাজারের বাসার দিকে। একটা দোকানের সামনে এসে সাফিয়া বেগম বলেন, 'এই রিকশা, একটু দাঁড়ান না।'

ডালু বলে, 'কেন?'

সাফিয়া বেগম তার হাতে ১০টা টাকা দিয়ে বলে, 'দু সের ভালো চাল কেনো তো বাবা। আলু পেঁয়াজ মরিচ তেল সাথেই আছে।'

ডালু কোনো কথা না বলে চাল কিনে আনে।

ততক্ষণে সন্ধ্যা ঝুপ করে নেমে এসেছে এই ঢাকায়। শীতও পড়েছে প্রচণ্ড। চারদিকে জনতার কণ্ঠে জয় বাংলা ধ্বনি। মাঝে মধ্যে গুলির শব্দে প্রকাশ পাচ্ছে জয়োল্লাস।

মগবাজারের বাসায় আসতে আসতে অন্ধকার ঘন হয়ে নামে। বারান্দাটা অন্ধকার, অন্ধকারেই তালা খুলতে গিয়ে আজাদের মা বোঝেন তালার ওপরে ধুলার আস্তর পড়ে গেছে। তালা খুলে ভেতরে ঢুকে লাইটের সুইচ অন করলে বোঝা যায় বিদ্যুৎ নাই। ডালু দোকানে গিয়ে মোমবাতি কিনে আনে। দিয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে মোমবাতি জ্বালানো হয়। ঘরদোরেও ধুলার প্রলেপ পড়ে গেছে। মা ঘরদোর সাফসুতরো করে ফেলেন দ্রুত। ছেলে ফিরে এসে দেখুক ঘর অপরিষ্কার, এটা হতে দেওয়া যায় না। মোমবাতি হাতে নিয়ে মা রান্নাঘরে যান। হাঁড়ি-পাতিল এখানে যে কটা ছিল সেসব মাকড়সার জালে ছেয়ে গেছে। তিনি একটা হাঁড়ি পেড়ে নিয়ে লেগে পড়েন চাল ধুতে।

ডালু জিজ্ঞেস করে, 'আম্মা, কী করো?'

'একটু ভাত রাঁধি।'

ডালু আর কথা বাড়ায় না। খালা তার কার জন্যে ভাত রাঁধছে, এ সে ভালো করেই জানে। সে চোখের জল গোপন করে। বাইরে তখনও হঠাৎ হঠাৎ চিৎকার ভেসে আসছে : জয় বাংলা।

ভাতের চাল সেদ্ধ হচ্ছে। বলক উঠেছে। ভাতের মাড়ের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে রান্নাঘরের বাতাসে। মা অনেক যত্ন করে রাঁধছেন এই ভাতটুকু। ভাত হয়ে গেলে তিনি হাঁড়িটা মুছে আবার চুলার ওপরই রেখে দেন। কিছুক্ষণ গরম থাকবে। আজাদ কখন আসবে, বলা তো যায় না।

চুলার আগুন এক সময় নিভে আসে। ডিসেম্বরের শীতের স্পর্শে ভাত ঠাণ্ডা হয়ে আসে হাঁড়িতেই। সারা রাত কেটে যায় আশায় আশায়। মোমবাতি ক্ষয় হতে হতে এক সময় শেষ হয়ে যায়, আলো যায় নিভে। মেঝেতে একটা পাটি আর পাটির ওপরে একটা চাদরে বিছিয়ে শুয়ে থাকেন সাফিয়া বেগম। দু চোখের পাতা তাঁর কখনও এক হয় না। মাঝে মধ্যে উঠে বসেন। রাত ভোর হয়, ফজরের আজান ভেসে আসে মগবাজারের মসজিদ থেকে। আজাদ ফেরে না।

সকালবেলা রোদ উঠলে সাফিয়ার বোনের ছেলেমেয়েরাও চলে আসে এই বাসায়। চঞ্চল বলে, 'আম্মা, মগবাজারের মোড়ে পাড়ার পোলাপান আজাদ ভাইয়ের নামে ব্যানার টাঙাইছে।'

'কেন? চল তো দেখে আসি।'

'চলো।'

চঞ্চলের সঙ্গে মা হাঁটতে থাকেন।

মগবাজারের চৌরাস্তায় এসে দেখেন, পাড়ার ছেলেরা ব্যানার তুলেছে, 'শহীদ আজাদ, অমর হোক'। তিনি বলেন, 'এইসব কী তুলেছ, এইসব নামাও, আজাদ তো বেঁচে আছে, ও তো ফিরবে!'

৫৫

১৭ই ডিসেম্বরেই দুপুরবেলা বোন শাহনাজ আর মুক্তিযোদ্ধা ফতেহ আলী চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে হাবিবুল আলম একটা জিপ চালিয়ে যায় নাজিমুদ্দিন রোডের জেলখানায়। তারা জানতে পেরেছে, চুল্লু-ভাই আর সামাদ ভাই আছেন এখানে। তাদের মনে আশা, হয়তো আছে জুয়েল, রুমী, বারেক, আজাদ। তারা তাদের জন্যে ফুল নিয়ে যায়। আলম জেলারকে বলে, 'মুক্তিযোদ্ধাদের ছেড়ে দিতে হবে।' জেলার যথাযথ কর্তৃপক্ষের লিখিত হুকুম ছাড়া মুক্তি দেওয়া সম্ভব নয় বলে জানান। তখন হাবিবুল আলম নিজে সেক্টর টু আর প্রবাসী সরকারের পক্ষ থেকে মুক্তিযোদ্ধাসহ সব যুদ্ধবন্দিকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশপত্র লিখে স্বাক্ষর করে দেয়। জেলার তার উর্ধ্বতন কর্তার সঙ্গে ফোনে কথা বলে মুক্তিযোদ্ধাসহ যুদ্ধবন্দিদের ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

মুক্তিযোদ্ধারা বেরিয়ে আসে। কাজী ইকবাল, মাহবুবুলাহসহ অনেককেই দেখা যায় সেই দলে। তারা হাবিবুল আলম আর ফতেহর সঙ্গে মোলাকাত করে। শাহনাজ তাদের হাতে ফুল তুলে দেয়। মুক্তিপ্রাপ্ত অন্য মুক্তিযোদ্ধা আর যুদ্ধবন্দিরাও তাদের ঘিরে ধরে। তারা চিৎকার করে ওঠে : জয় বাংলা। তাদেরকেও ফুল দিয়ে বরণ করে শাহনাজ। তাদের অনেকেরই চোখে জল। তারা কেউ কেউ জেলখানা চত্বরে হাঁটু গেড়ে বসে মাথাটা ঠেকায় মাটিতে, মাটিকে চুমু দেয়, মুক্ত ভূমিকে, দু হাত মাটিতে বুলিয়ে নিয়ে সেই হাত বোলায় চোখে মুখে মাথায়...

শাহনাজ, হাবিবুল আলম আর ফতেহ তাদের জিপে ফিরে আসে। সঙ্গে নিয়ে আসে চুল্লু-ভাই আর সামাদ ভাইকে। গত কয়েক মাসে শাহনাজসহ হাবিবুল আলমের বোনেরা তাদের দিলু রোডের বাসায় এত অস্ত্র নেড়েছে, পরিষ্কার করেছে যে, একেকজন পরিণত হয়েছে একেকটা অস্ত্র-বিশেষজ্ঞে। আবার মুক্তিযোদ্ধারা তাদের বাসায় আসত, বিশেষ করে আহত হওয়ার পরে কয়েক দিন জুয়েল ছিল তাদের বাসায়, সেই সূত্রে জুয়েল, বদি, রুমী, আজাদদের জন্যে তাদের এক ধরনের মায়া জমে গেছে। শাহনাজ আগে থেকেই জানত, ঢাকা কারাগারে চুল্লু-ভাই আর সামাদ ভাই ছাড়া ঢাকার গেরিলাদের আর কেউ নাই। তবু তার একটা ক্ষীণ আশা ছিল, হয়তো জুয়েল ভাইকে পাওয়া যাবে, রুমী-বদি-আজাদদের দেখা মিলবে। কিন্তু যখন বাস্তবতা এসে তার সেই ক্ষীণ আশাটুকুকে উড়িয়ে নিয়ে গেল, শাহনাজ কিন্তু ভেতরে ভেতরে মন খারাপ করে। জিপে উঠে সে আলমের হাত থেকে স্টেনগান তুলে নিজের হাতে নেয়। তারপর যে হাতে এত দিন সে শুধু অস্ত্র পরিষ্কারই করেছে, আজ মুক্ত বাংলাদেশের আকাশ লক্ষ্য করে সেই হাত দিয়ে সে গুলি ছুড়তে থাকে। তাকে গুলি করতে দেখে মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দিরা আবার চিৎকার করে ওঠে : জয় বাংলা। সবাই ধরেই নেয় শাহনাজের মতো মেয়ে গুলি ছুড়ছে আনন্দে। কিন্তু শাহনাজ জানে না, গুলি কেন সে ছুড়ছে? বিজয়ের আনন্দে, ভাইকে ফিরে পাওয়ার প্রশান্তিতে, নাকি অন্য সব গেরিলাকে খুঁজে না পাওয়ার ক্ষোভে! গুলির আওয়াজে জেলখানার সানশেডে বাসা বানানো পায়রাগুলো উড়ে উঠে ছেয়ে ফেলে নাজিমুদ্দিন রোডের আকাশ-বাতাস।

জিপ স্টার্ট নেয়। একটু একটু করে তারা ছেড়ে আসছে জেলখানা চত্বর। ১৭ই ডিসেম্বরের এই দুপুর রোদে এমনভাবে ঝলকাচ্ছে, যেন বিজয়ের জমক এসে লেগেছে আকাশে-বাতাসে। মুক্ত পায়রাগুলো যেন ছড়াচ্ছে শান্তির আশ্বাস। শাহনাজ স্টেনগানটা হাতে নিয়েই বারবার পেছনে তাকায়, কারাগারের দরজার দিকে তার চোখ যেন আরো কাউকে কাউকে খোঁজে।

এক সময় কারাগারের দেয়াল তার দৃষ্টিসীমা থেকে অদৃষ্ট হয়ে যায়।

৫৬

১৭ই ডিসেম্বর, কাল শেষ হয়ে গেছে যুদ্ধ, আত্মসমর্পণ করেছে পাকিস্তানি সৈন্যরা, রুমীর মা জাহানারা ইমাম বিজয়ের আনন্দে হাসবেন, নাকি কাঁদবেন বুঝছেন না, সকালে সবাই মিলে বাসার ছাদে তুলেছেন স্বাধীন বাংলার পতাকা, কিন্তু দুদিন আগে মারা গেছেন তাঁর স্বামী শরীফ ইমাম সাহেব, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে, আসলে আর্মির নির্যাতনের সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ায়। আর তা ছাড়া রক্তহিম করা সব খবর আসছে, মুনীর চৌধুরী নাই, শহীদুল্লা কায়সার নাই, ডা. রাব্বি, ডা. আলীম চৌধুরী, তাঁদের

কারা যেন দুদিন আগে চোখ বেঁধে জিপে করে তুলে নিয়ে গেছে, বিকাল নাগাদ খবর আসে, রায়েরবাজারের জলা ডোবাটা একটা বধ্যভূমি, পড়ে আছে সবার লাশ... আরো পরে জানা যাবে, কারা করেছে এই অপকীর্তি, পাকিস্তানি জেনারেল আর সৈন্যদের পুরো ৯ মাসই সহযোগিতা করেছে এ দেশের কিছুসংখ্যক মানুষ, জামায়াতে ইসলামী আর মুসলিম লিগের অনেকেই, গঠন করেছে রাজাকার, আল বদর, আল শামস, পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের, তাদের শিবিরে তাদের লালসার কাছে জোর করে ঠেলে পাঠিয়েছে বাঙালি তরুণী কিশোরী নারীদের, আর যুদ্ধের শেষ দিকে এসে জামায়াতি ও তাদের ছাত্র উইংয়ের দ্বারা গঠিত আল বদররা তালিকা প্রণয়ন করেছে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের, বাছাই করে বাড়ি বাড়ি হানা দিয়ে চোখ বেঁধে পিঠমোড়া করে হাত বেঁধে তারা নিয়ে গেছে এ দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, লেখক, সাংবাদিকদের, তাঁরা সবাই পড়ে আছে লাশ হয়ে রায়েরবাজারে, মিরপুরে...

সন্ধ্যার পরে বিদ্যুৎ নাই বলে মোমবাতি জ্বালিয়ে বসে আছেন জাহানারা ইমাম, তাঁর দু বাহুর ভেতরে জামী, বাইরে গাড়ির শব্দ, তারপর দরজায় করাঘাত, কাঁধে স্টেন ঝুলিয়ে কয়েকটা তরুণ দাঁড়িয়ে, তিনি বলেন, 'এসো বাবারা এসো।'

'আমি মেজর হায়দার, এ শাহাদত, এ আলম, এ আনু, ফতেহ, জিয়া আর এই যে চুল্লু।' বড় গোঁফ, জুলফি নেমে এসেছে দাড়ির ধরনে, মিলে গেছে গোঁফের সঙ্গে, আলম বলে, 'চুল্লু-জেলে ছিল । আমি নিজেই এদের রিলিজ অর্ডারে সাইন করে এদের ছাড়িয়ে নিয়ে এলাম।'

আলমের চাইনিজ স্টেনগানটা জাহানারা ইমাম নিজের হাতে তুলে নেন। তারপর তুলে দেন জামীর হাতে।

৫৭

ইস্কাটন গার্ডেনে লেডিস ক্লাবে মেজর হায়দারের ক্যাম্প। সেখানে নিখোঁজ মুক্তিযোদ্ধাদের খোঁজে আসতে থাকে তাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবরা। জুয়েলের ভাইয়েরা আসে মেজর হায়দারের ক্যাম্পে, আলতাফ মাহমুদের খোঁজে আসে লিনু বিলাহরা। ডালু আসে, জায়েদ আসে, জায়েদ কথা বলে কাজী কামালের সঙ্গে, কিন্তু আজাদদের সন্ধান মেলে না। জাহানারা ইমাম বিভিন্নভাবে তালাশ চালান তার ছেলের আর ছেলের সহযোদ্ধা বন্ধুদের কোনো খোঁজখবর বের করতে, কিন্তু তাদের উদ্ধার তো করা যায়ই না, কোনো তথ্যও পাওয়া যায় না।

৫৮

প্রতিবেশীদের অনেকেই, এবং তাদের সূত্র ধরে ঢাকা নগরবাসীর অনেকেই জেনে যায় যে, পুরানা পল্টনের এক বাড়িতে মিলি নামের একটা মেয়ে সারাক্ষণ শুধু নীরবে চোখের পানি ফেলছে। সে কিছুই বলে না। তার কোনো অভিযোগ নাই। সে শুধু পথের দিকে তাকিয়ে থাকে, আর নীরবে অশ্রুবর্ষণ করে।

তার দুঃখের কারণ কেউ সঠিকভাবে বলতে পারে না। তবে নাগরিকেরা অনুমান করে, যুদ্ধের পরে সব মুক্তিযোদ্ধাই তো একে একে ফিরে আসছে, ফিরে এসেছে, হয়তো এই মেয়েটি যাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিল, সে ফেরেনি।

কার জন্যে অপেক্ষা করছিল মেয়েটা?

নগরবাসী সেটা আর অনুমান করতে পারে না। কারণ যারা মিলিকে চেনে, তারা আজাদকে চেনে না। আর যারা আজাদের কথা জানে, তারা মিলির কথা জানে না।

আর মিলিই তো একমাত্র মেয়ে নয় এই নগরে, যে পথের দিকে তাকিয়ে থেকে অশ্রু বিসর্জন করছে? আর আজাদই তো একমাত্র ছেলে নয় যে যুদ্ধের পরে দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে কিন্তু ফিরে আসছে না।

নগরবাসী একদিন মিলির কথা ভুলেই যায়।

১৪ বছর পর, আজাদের মায়ের মৃত্যু মুক্তিযোদ্ধাদের আবার একত্র আর আজাদের বিষয়েই স্মৃতিদষ্ট করে তোলার পরে, কারো কারো মনে হতে থাকে, তাই তো, এ রকম একটা মেয়ে তো ছিল, কী যেন নাম, যে শুধু কাঁদত।

মিলি হয়তো নীরবে অশ্রুবর্ষণ করেছে, মুখে শব্দ করেনি, কিন্তু এমন মেয়েও তো কিছু থেকে থাকবে, যারা প্রকাশ্যে অশ্রুও বর্ষণ করেনি, দীর্ঘশ্বাসটুকুও চেষ্টা করেছে গোপন করতে, অশ্রুটুকু বিসর্জন দিয়েছে গোপনভাবে, নিভৃতে, কাউকে জানতে না দিয়ে...

বাশারের জন্যে কি কেউ কাঁদেনি, জুয়েলের জন্যে, রুমীর জন্যে, বদির জন্যে, কী সুন্দর থোকা থোকা গুচ্ছ গুচ্ছ নাম, নক্ষত্রপুঞ্জের মতো, অসংখ্য নাম, নিযুত শহীদের নাম, এদের প্রত্যেকের জন্যে, অনেকের জন্যে...নিশ্চয় কেঁদেছে, সম্মিলিত, একাকী, প্রকাশ্য, সংগোপন কত কান্না কত অশ্রু ভাপ হয়ে মিশে গেছে আকাশে বাতাসে, কে তার হিসাব রেখেছে?

তরুণীদের কান্নার হিসাব কেউ রাখেনি, কিন্তু শহীদদের মায়েদের প্রকাশ্য কান্না, অশ্রুপাত, ব্যক্তিগত প্রতীক্ষা আর দীর্ঘশ্বাসের চিহ্নগুলোই বা কাল কোথায় ধরে রেখেছে?

৫৯

আজাদের মা কিছুদিন থাকেন মগবাজারের বাসায়, এই সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে কাজী কামাল উদ্দিন, হাবিবুল আলম আসে, সাফিয়া বেগম তাদের যত্নআত্তি করেন, তাদের ভাত না খাইয়ে ছাড়তে চান না, ছেলেরাও কথা না বাড়িয়ে হাত ধুয়ে খেতে বসে যায়, কাজী কামাল ভাত খায়, সাফিয়া বেগম তার পাতে ভাত তুলে দেন, কাজী কামাল ভাত চিবোয়, আজাদের মা তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে চোয়ালের ওঠানামা দেখেন, হাবিবুল আলম তার বড় জুলফিওয়ালা গাল নেড়ে ভাত খেতে খেতে গল্প করে, সেন্ট্রাল জেল থেকে সে বের করেছে চুল্লু-ভাইকে, সামাদ ভাইকে, আজাদের মা বলে, 'আমার আজাদও বেঁচে আছে, কালকে বড় হুজুর স্বপ্ন দেখে আমাকে বলেছেন...'

জাহানারা ইমাম আসেন আজাদের মায়ের মালিবাগের ডেরায়। জাহানারা ইমাম খোঁজখবর নেন অন্য মায়েদের, জুয়েলের মা কোথায়, বদির মা কোথায়, বাকেরের মা কোথায়, এইসব। আজাদের মা সবাইকে বলেন, আজাদ অবশ্যই বেঁচে আছে। সে ফিরে আসবেই। এই বিশ্বাস তিনি পান জুরাইনের বড় হুজুরের কাছ থেকে, আর তখন নানা জনরব শোনা যেতে থাকে, একজন এসে বলে সে আজাদকে দেখেছে লন্ডনে, টিউব রেলে, তার পাশের আসনেই বসা; আজমির শরিফ থেকে একজন আত্মীয় ফিরে এসে বলেন, ওখানকার খাদেম বলেছে, আজাদ বেঁচে আছে, ফিরে আসবে... একজন পাওয়া যায় প্রত্যক্ষদর্শী, পেশোয়ারে আজাদকে দেখা গেছে...

৬০

আজাদের মায়ের মৃত্যুর পরে, মালিবাগের শ্বশুরবাড়িতে বসে কচির মনে পড়ে, '৭২ সালে মাঝে মধ্যে আম্মাকে সে গান গেয়ে শোনাত। এই সময় আম্মার প্রিয় গান ছিল, আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি...

কচি গলা ছেড়ে গাইত। মা, ঘরে কুপি জ্বলছে, আলো নড়ছে, মায়ের মুখে আলো পড়ছে আর নড়ছে, চুপচাপ পাটিতে বসে গান শুনছেন :

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী!
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে॥

ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে, বাঁ হাতে তোর শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাটনেত্র আগুনবরন।
ওগো মা, তোমার কী মুরতি আজি দেখি রে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে॥

তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জ মেঘে লুকায় অশনি,
তোমার আঁচল ঝলে আকাশ তলে রৌদ্রবসনী!
ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে॥

যখন অনাদরে চাইনি মুখে ভেবেছিলাম দুঃখিনী মা
আছে ভাঙা ঘরে একলা পড়ে দুঃখের বুঝি নাইকো সীমা।
কোথা সে তোর দরিদ্র বেশ, কোথা সে তোর মলিন হাসি—
আকাশে আজ ছড়িয়ে গেল ওই চরণের দীপ্তিরাশি!
ওগো মা, তোমার কী মুরতি আজি দেখি রে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে॥

আজি দুখের রাতে সুখের স্রোতে ভাসাও ধরণী—
তোমার অভয় বাজে হৃদয়মাঝে হৃদয়হরণী!
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে॥

কচি গান গায় আর তার ভারি কান্না পায়। গানের কথাগুলো কি রবীন্দ্রনাথ আম্মাকে নিয়েই লিখে রেখেছিলেন? এই মা কি আম্মা, নাকি দেশ? আমার সোনার বাংলা, যাকে আমরা খুব ভালোবাসি, যাকেও আমরা মা বলে ডাকি? বলি, মা তোর বদনখানি মলিন হলে আমি নয়নজলে ভাসি... কী জানি, কচির ছোট মাথায় হিসাব মেলে না। কিন্তু দ্যাখো, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, আজি দুখের রাতে সুখের স্রোতে ভাসাও তরণী, এ তো তাদের আম্মারই রূপ। কোথা সে তোর দরিদ্র বেশ, কোথা সে তোর মলিন হাসি, এও তো তাদের আম্মাকেই কেবল বলা যায়।

কুপির সলতে জ্বলে, কুপির শিখাটা এমন যে শিখার ছায়া পড়েছে মেঝেতে, আশ্চর্য না, আলোর নিজের ছায়া পড়ে! আর আম্মাকে দেখা যাচ্ছে কী! মনে হচ্ছে, পিতলের তৈরি এক মাতৃমূর্তি। সত্যি তিনি আজ দুখের রাতে সুখের স্রোতে ধরণী ভাসিয়ে দিচ্ছেন, আম্মা বলেন, 'আজাদ বেঁচে আছে, দেখিস, ও আসবে, আর দ্যাখ, দেশটা তো স্বাধীন হয়েছে, জুলুম অত্যাচার তো বন্ধ হয়েছে, এখন তো আর সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকতে হয় না, আজাদ যেদিন আসবে, কত খুশি হবে সে...'

১৯৮৫ সালে, স্বামিগৃহে বসে, স্মৃতিতাড়িত কচি তার নিজের ছোট ছোট মেয়েদের ডেকে বলে, 'আম্মা আর আমি আর কী করতাম জানিস?'
তারা আধো আধো স্বরে বলে, 'কী করতা?'
'আম্মা যখন আমার ওপরে রাগ করতেন, আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইতেন না, আমি তার দরজায় দাঁড়িয়ে গান গাইতে আরম্ভ করে দিতাম :

বড় আশা করে এসেছি গো, কাছে টেনে লও,
ফিরায়ো না জননী॥
দীনহীনে কেহ চাহে না, তুমি তারে রাখিবে জানি গো।
আর আমি যে কিছু চাহি নে, চরণতলে বসে থাকিব।
আর আমি যে কিছু চাহি নে, জননী বলে শুধু ডাকিব।'

কচি গুনগুন করে গান গেয়ে চলে, মাকে গান গাইতে দেখে তার দুই মেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, কচি বলে, 'আম্মা চুপ করে এই গান শুনত, গান শেষ হলে দেখতাম তার রাগ আর নাই।'
কচির চোখ জলে টলমটল করে।
তার ছোট ছোট মেয়েরা অবাক হয়ে দেখে তাদের মা কাঁদছে।

৬১

আজাদের মা থাকেন মালিবাগের বাসায়, আর ভাড়া পরিশোধ করেন মগবাজারের বাসারও। এইভাবে যায় কিছুদিন। তারপর এক সময় মগবাজারের বাসার ভাড়া দেওয়ার সঙ্গতি চলে যায় তাঁর। মালিবাগের বাসাও তাঁরা ছেড়ে দেন, বাসা ছেড়ে দিয়ে ওঠেন বিক্রমপুরে আরেক বোনের ছেলের বাড়িতে, কিছুদিন চলে যায়, সেখান থেকে এসে ভাড়া নেন খিলগাঁওয়ের এক বাসা, যাকে ঠিক হয়তো বাসা বলা যাবে না, বলতে হবে বস্তিঘর, অন্তত যে রাজপ্রাসাদে তিনি একদা থাকতেন, তার তুলনায় এ তো বস্তি ই, নর্দমার গন্ধ ঘরের মধ্যে, কাঁচা বাঁশের বেড়া, চারদিকে গরিব মানুষের কোলাহল-খিস্তিখেউড়, জায়েদ কাজ নেয় গাড়ির ওয়ার্কশপে, সারা দিন কাটে তার কালিঝুলি মেখে গাড়ির নিচে। এই সময় আজাদের মায়ের কাছে আসতেন খোঁজখবর করতেন তাঁর খালাতো বোনের ছেলে শুভ, খুদু, খোঁজ নিতেন তাঁর খালাতো দুলাভাই আবদুস সালাম। জাহানারা ইমাম এ বাসায় আসেন, আজাদের মায়ের অবস্থা দেখে তাঁর বুকের ভেতরটা হাহাকার করে ওঠে, এতটা খারাপ অবস্থা কারো হতে পারে এ তাঁর কল্পনারও অতীত, দারিদ্র্যের কশাঘাতের চিহ্ন ঘরজুড়ে, আজাদের মায়ের চেহারাও খুবই খারাপ হয়ে গেছে, শুকিয়ে তিনি অর্ধেক হয়ে গেছেন, অথচ এই মহিলা একদিন এই শহরে রাজরানী ছিলেন। তার মনে পড়ে, ইস্কাটনের প্রাসাদোপম বাড়িতে বা ফরাশগঞ্জের বাড়িতে সাফিয়া বেগমের সুখী পরিতৃপ্ত সেই বেশটা, গা ভরা গয়না, আঁচলে চাবি, মুখে হাসি... তিনি দীর্ঘশ্বাস গোপন করেন।
জাহানারা ইমাম তাঁর ব্যাগ থেকে একটা খাম বের করে দেন সাফিয়া বেগমের হাতে, বলেন, 'আপা, কিছু মনে করবেন না, এটা রাখেন।'
সাফিয়া বেগম শান্তস্বরেবলেন, 'এটা কী?'
'কিছু টাকা আছে।'
'আপা, আপনি কিছু মনে করবেন না, এটা আমি নিতে পারব না।' এমন স্পষ্ট উচ্চারণে সাফিয়া কথা বলেন যে জাহানারা ইমাম খামটা ফেরত নিয়ে ব্যাগে রাখেন।

আজাদের মায়ের দু-একজন আত্মীয়স্বজন এসে তাঁকে বলেন, 'আপনার নামে না অনেক অনেক সম্পত্তি, ইস্কাটনের বাড়ি, ফরাশগঞ্জের বাড়ি, এসব বিক্রি করলেও তো টাকা আসে, বিক্রি করে দেন, দখল নেওয়ার দায়িত্ব আমাদের।'
আজাদের মা বলেন, 'দ্যাখো বাপু, ওসব সম্পত্তি আমার নামে বটে, কিন্তু ওসব তো আসলে চৌধুরীর, আমার নামে থাকলেই ওগুলো আমার হয়ে যায় না। ও চৌধুরীরই। উনি যা করার করবেন, আমি ওসবে লোভ করি না। তোমরাও এ নিয়ে কোনো কিছু বলতে এসো না।'

সৈয়দ আশরাফুল হক আসে এই বাসায়, ভুরু কুচকে চারদিকে তাকিয়ে বলে, 'মা, তোমার এ কি অবস্থা, তুমি এইটা কোন জায়গায় উঠছ?'
'কোন জায়গায় উঠেছি?'

'এই যে, এইটা তো বস্তি। ঢোকা যায় না, এইখানে তুমি থাকো কেমন কইরা?'
'আমার তো অসুবিধা হয় না।'
'তোমার আত্মীয়স্বজন কই?'
'আত্মীয়স্বজন দিয়ে কী হবে?'
'তোমাকে কেউ সাহায্য করব না? তুমি যে এদের জন্যে এত কিছু করলা?'
'আমি কারো সাহায্য নিলে তো বাবু।'
'আচ্ছা কাউরে লাগব না। তুমি আমার সাথে চলো আমার লগে থাকবা।'
মা হাসেন।কিছু বলেন না।
'কি চলো?'
'যাও, পাগলামি কোরো না। আমি কারো সাহায্য চেয়েছি কখনও? কেন নেব?'
'তাহলে তোমাকে এর চেয়ে ভালো জায়গায় থাকতে হবে।'
মা এ কথার জবাবেও শুধু হাসেন। সৈয়দ আশরাফুল হক তাকে কিছু টাকা দিলে তিনি সেটা গ্রহণ করেন। তারপর বলেন, 'শোনো, আজাদের খবর পেয়েছি। ওই খায়রুল আছে না বিক্রমপুরের, তার ভায়রার বড় ছেলে, ও লন্ডনে দেখে এসেছে, টিউবে ওর পাশে বসেছিল, হুবহু এক চেহারা, আরেকটু নাকি ফরসা হয়েছে...'
আশরাফুলের মনে হয় মাকে বলে, মা, আজাদ ভাই বেঁচে থাকলে তো তোমাকে চিঠি লিখতে পারত, তোমাকে ছাড়া আজাদ ভাই একদণ্ড থাকার ছেলে নাকি, কিন্তু সে কিছু বলে না। মহিলা একটা বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে বেঁচে আছেন, থাকুন...

মাঝে মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা কাজী কামাল আসে, সে তো আবার আজাদের সহপাঠী, তাকে তো আর তিনি 'না' করতে পারেন না, কাজী কামাল স্মৃতিতর্পণ করে, 'মাঝে মধ্যে জুয়া খেইলা হয়তো পাইলাম ৫০০ টাকা, তারে দিয়া আসলাম, জুয়ার টাকা সেইটা অবশ্য কই নাই...'
আজাদের আরেক বন্ধু হিউবার্ট রোজারিও এসে তাঁকে মা বলে ডাকে, সাফিয়া বেগম তার মাথায় হাত বোলান, সে তখন জোর করে তাঁর হাতে কিছু টাকা গছিয়ে দেয়, তিনি সেটাও গ্রহণ করেন। না, ভাত তিনি আর কোনোদিনই খান না, দুটো পাতলা রুটি, একটু সব্জি হলেই তাঁর দিন চলে যায়, কি শীত কি গ্রীষ্ম, তার বিছানা মেঝেতে, পাটি বিছিয়ে, খুব শীতের রাতে গায়ের ওপরে দুটো শাড়ি ভাঁজ করে ঢেকে দেওয়া থাকে।
জাহানারা ইমাম আবার আসেন তাঁর বাসায়, বলেন, 'আপনার এই কাহিনী আমি লিখতে চাই, আপনি আজাদের ফটো দেন, আপনার ফটো দেন', তিনি বলেন, 'না, আমি ইতিহাস হতে চাই না। কোনো কিছু লিখবেন না।'

কী জানি, হয়তো তিনি চৌধুরীর কাছে নিজেকে ছোট করতে চাননি।
'আপনি শহীদের মা। আপনার কথা সবাইকে জানাতে হবে। এটা আপনার জন্যে নয়, সারা দেশের মানুষের ভালোর জন্যে জানাতে হবে'-জাহানারা ইমাম যুক্তি দেখান।
সাফিয়া বেগম হেসে বলেন, 'কিন্তু আপা, আমার আজাদ তো শহীদ হয়নি। ও তো বেঁচে আছে। ও ফিরে আসবে।'
জাহানারা ইমাম চোখ মুছে সেই বস্তিঘর ত্যাগ করেন।
জাহানারা ইমামের কাছে তাঁর সম্পর্কে লেখার প্রস্তাবটা শুনে সাফিয়া বেগম এক রাতে তাঁর ছেলের চিঠিগুলো বের করেন। সেখান থেকে আলাদা করেন আজাদের একটা বিশেষ চিঠি।

মা,
কেমন আছ? আমি ভালোভাবেই পৌঁছেছি। এবং এখন ভালোই আছি। হরতাল বন্ধ হয়ে গেছে। রীতিমতো ক্লাস হচ্ছে। পরীক্ষা শীঘ্রই শুরু হবে। দোয়া কোরো। তোমার দোয়া ছাড়া কোন উপায় নাই। আমি নিজে কী ধরনের মানুষ আমি নিজেই বুঝতে পারি না। আচ্ছা তুমি বল ত সব দিক দিয়ে আমি কী ধরনের মানুষ। আমি তোমাকে আঘাত না দেওয়ার অনেক চেষ্টা করি। তুমি আমার মা দেখে বলছি না; তোমার মতো মা পাওয়া দুর্লভ। এই বিংশ শতাব্দীতে তোমার মতো মা যে আছে কেউই বিশ্বাস করবে না। আমি এগুলি নিজ হৃদয় থেকে বলছি, তোমার কাছে ভালো ছেলে সাজবার জন্য নয়। যদি আমি পৃথিবীতে তোমার দোয়ায় বড় বা নামকরা হতে পারি, তবে পৃথিবীর সবাইকে জানাব তোমার জীবনী, তোমার কথা।
আমি ভালো পড়াশুনা করার চেষ্টা করছি।
এবং অনেক দোয়া দিয়ে চিঠির উত্তর দিও।

ইতি তোমার
অবাধ্য ছেলে
আজাদ

আজাদ লিখেছিল, সে যদি নামকরা হয় কোনো দিন, সে লিখবে তার মায়ের জীবনী। পৃথিবীকে জানাবে তার মায়ের কথা। আজাদ যদি বেঁচে থাকে, যদি ফিরে আসে, অবশ্যই সে বেঁচে আছে, অবশ্যই সে ফিরে আসবে, নিশ্চয় এই কাজ সে-ই করবে। তিনি তো এই কাজ অন্য কাউকে করতে দিতে পারেন না।

৬২

জাহানারা ইমাম একা খোঁজখবর করেন আর সব শহীদের মায়ের, সময়ের চাকা ঘুরছে, পৃথিবী ঘুরছে, জীবনের চক্রে পড়ে কোথায় ছিটিয়ে পড়ছেন শহীদ জুয়েলের মা, শহীদ বদির মা, শহীদ বাকেরের মা, কত কত শহীদ এই দেশে, তাদের কতজনের মা, অভিযোগহীন, দুঃখ সয়ে পাথর হয়ে যাওয়া কখনো উচ্চবাচ্য না করা একেকজন মা!

চৌধুরী আবার প্রস্তাব পাঠান সাফিয়া বেগমকে বাসায় নিয়ে যেতে, কাকুতি-মিনতি করেন, তাঁর নিজেরও শরীর ভেঙে আসছে, তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন নিজের অতীত আনন্দময় সুখের জীবনের কথা ভেবে ভেবে, কিন্তু সাফিয়া বেগম রাজি হন না, রাজি হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ইতিমধ্যে আরো বিয়ে করেছেন চৌধুরী, চট্টগ্রামে পেতেছেন আরেক সংসার, তার কাছে যাওয়ার চিন্তাও তো অবান্তর। এখনও ইস্কাটনের বাসা সাফিয়া বেগমেরই নামে, ফরাশগঞ্জের বাসা, এবং ঢাকায় আরো অনেক জমাজমি...

জুরাইনের এক ঘোরতর বস্তিঘরে গিয়ে ওঠেন মা। সেখানে একদিন গিয়ে হাজির হয় সৈয়দ আশরাফুল হক।

'মা, তুমি এইসব জায়গা খুঁইজা বাইর করো কেমনে? এইসব জায়গায় আসা যায়?'

'এসো না।'

'না, আসুম না তো। তুমি এমন জায়গায় থাকবা যাতে আসা না যায়, আসুম ক্যান? চলো আইজকাই তোমারে নিয়া যামু। কাম অন। স্টে উইথ মি।'

'তোমাকে আসতেও হবে না, নিয়ে যেতেও হবে না। এখন তো তুমি এভাবেই কথা বলবে। অন্য সবাই যেভাবে কথা বলে, তুমিও যদি সে রকমই বলো... এসো না...'

সাফিয়া বেগম মৃদু হেসে তাকিয়ে থাকেন সৈয়দ আশরাফুলের চোখের দিকে। এরপর আর তাঁকে কিছু বলা যায়?

৬৩

১৯৮৫ সাল। আগস্ট মাস। আগস্ট মাস এলেই ঢাকার মুক্তিযোদ্ধাদের মাথার ভেতরটা কেমন করতে থাকে। জায়েদের হাত-পা ঘামতে থাকে দরদর। সারা শরীরের জ্বলুনিটা বেড়ে যায়। ২৯শে আগস্ট দিবাগত রাতে আজাদ চলে গিয়েছিল। ১৪ বছর আগে।

সেই রাতটা কাছে আসছে। এদিকে শাহজাহানপুরের এক দীনহীন বাসায় থাকা আজাদের মার শরীরটা খুবই খারাপ হচ্ছে। হাঁপানির টান যখন ওঠে, তখন তিনি এত কষ্ট পান যে মনে হয় এর চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়। এর মধ্যে একটা দিনের জন্যেও, সেই ১৯৬৯ থেকে, তিনি স্বামীর মুখ দেখেননি। নিজের মুখও তাকে দেখতে দেননি।

আজাদের মা জায়েদকে ডেকে বলেন, 'আমার আর সময় নাই।'

জায়েদ বলে, 'আম্মা, ডাক্তার ডাকি।'

মা বলেন, 'ডাকো। এত দিন ধরে আমাদের দেখছেন, বিদায় নিই।'

তাঁকে যে ডাক্তার দেখতেন, টাঙ্গাইলের লোক, ডাক্তার এস. খান, তাঁকে ডাকা হয়। ডাক্তার এসে দেখেন, আজাদের মা শুয়ে আছেন স্যাঁতসেঁতে মেঝের ওপরে বিছানো একটা পাটিতে। তিনি বিস্মিত হন না। কারণ তিনি জানেন, কেন এই ভদ্রমহিলা মেঝেতে শোন। তবে ঘরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তাঁকে চিন্তিত করে। গলিটা ময়লা, একধারে নর্দমা উপচে উঠেছে, দুর্গন্ধ ঘরের ভেতরে পর্যন্ত এসে ঢুকছে। ঘরটাতেও আলো তেমন নাই।

তবে সাফিয়া বেগমের মুখখানা তিনি প্রশান্তই দেখতে পান। তিনি তাঁর নাড়ি পরীক্ষা করেন, স্টেথোস্কোপ কানে দিয়ে তাঁর বুকের ভেতরের হাপরের শব্দের মর্ম অনুধাবন করেন। রোগীর অবস্থা বেশি ভালো নয়। এখনই ক্লিনিকে নিয়ে গিয়ে একটা শেষ চেষ্টা করা যায়।

ডাক্তার বলেন, 'বোন, কী করবা!'

মা বলেন, 'আপনাকে দেখলাম। দেখতে ইচ্ছা করছিল। তাই ডেকেছি। আপনার আর কী করার আছে! আমার সময় হয়ে এসেছে। আমাকে বিদায় দিন। ভুলত্রুটি যা করেছি, মাফ করে দেবেন।'

'হসপিটালে যাওয়া দরকার।'

'না। দরকার নাই।'

'আলাহ!' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডাক্তার কিছু ওষুধ দিয়ে বিদায় হন।

মা বলেন, 'উকিল ডাকো। গেন্ডারিয়ার জমিগুলো আমি লেখাপড়া করে দেব।'

উকিল ডাকা হয়।

তিনি গেন্ডারিয়ার জমি তাঁর ভাগ্নে-ভাগ্নিদের নামে আর জুরাইনের মাজারের নামে দলিল করে দেন।

২৯শে আগস্ট পেরিয়ে যায়। আসে ৩০শে আগস্ট। আজাদের ধরা পড়ার ১৪ বছর পূর্ণ হওয়ার দিন। তিনি ভাগ্নে-ভাগ্নিদের ডাকেন। জায়েদকে বলেন, 'শোনো, আমার মৃত্যুর পরে কবরে আর কোনো পরিচয় লিখবে না, শুধু লিখবে-শহীদ আজাদের মা। বুঝলে!'

'জি।' জায়েদরা কাঁদতে শুরু করে।

তিনি বলেন, 'শোনো, আসলে আজাদ যুদ্ধের সময়ই শহীদ হয়েছে। ওর বউয়ের জন্যে আমি কিছু গয়না রেখেছিলাম। এগুলো রেখে আর কোনো লাভ নাই। আজাদ তো

আসলে যুদ্ধের সময়ই শহীদ হয়েছে। এগুলো তোমাদের দিয়ে গেলাম। তোমরা বড় হজুরের সাথে আলাপ করে সৎকাজে এগুলো ব্যয় কোরো। আমার যাওয়ার সময় হয়েছে, আমি যাই বাবারা, মায়েরা...'

জায়েদ, টিসু, টগর, তাদের বউ-বাচ্চা, যারা তাঁর পাশে ছিল, তারা কাঁদতে থাকে।

তিনি ইশারা করে বলেন, 'কেঁদো না।' তিনি একটা ট্রাঙ্কের চাবি জায়েদের হাতে তুলে দেন। পরে, জায়েদ সেই ট্রাঙ্ক খুলে প্রায় একশ ভরি সোনার গয়না দেখতে পায়! আশ্চর্য তো মহিলা, এতটা কষ্ট করলেন, কিন্তু ছেলের বউয়ের জন্য রাখা গয়নায় এই ১৪টা বছর হাত দিলেন না!

১৩ই জিলহজ্ব, ৩০শে আগস্ট ১৯৮৫ বিকাল পোনে ৫টায় আজাদের মা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

জায়েদ অন্যান্য কৃত্যের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা কাজী কামাল বীরবিক্রমকে খবরটা দেওয়ার কর্তব্যটাও পালন করে। সেখান থেকে খবরটা পান জাহানারা ইমাম। তিনি আবার একে একে খবর দেন ঢাকার আরবান গেরিলাদের। হাবিবুল আলম বীরপ্রতীক, হ্যারিস, বাচ্চু, ফতেহ, উলফত, শাহাদত চৌধুরী, চুল্লু, আলভী, আসাদ, শহীদুল্লাহ খান বাদল, হিউবার্ট রোজারিও...

পরদিন সকালে লাশ নিয়ে যাওয়া হয় জুরাইন গোরস্তানে। জাহানারা ইমাম রয়ে যান গাড়ির ভেতরে, গোরস্তানের গেটের বাইরে।

জনা-তিরিশেক মুক্তিযোদ্ধা আর কিছু নিকটাত্মীয়ের শবযাত্রীদলটি কফিন বয়ে নিয়ে চলেন।

লাশ গোরে নামানোর পরে হঠাৎই রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ থেকে বৃষ্টি নামতে থাকে। একটা অচেনা মিষ্টি গন্ধে পুরো গোরস্তানের বাতাস আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। অনেক মুক্তিযোদ্ধারই মনে হয়, তাদের সহযোদ্ধা শহীদেরা আজ অনেকেই একত্র হয়েছে এই সমাধিক্ষেত্রে, যেন তারা পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করছে বেহেশত থেকে, যেন তারা মাটি দিচ্ছে কবরে। শহীদ জুয়েল, শহীদ বদি, শহীদ বাকের, শহীদ আলতাফ মাহমুদ, শহীদ রুমী, শহীদ বাশার প্রমুখ আর শহীদ আজাদ এখানে উপস্থিত।

সহযোদ্ধা শহীদের মাকে সমাহিত করতে এসে ঢাকার আরবান গেরিলা দলের সদস্যরা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, ঘোরগ্রস্ত হয়ে পড়েন, তাড়িত বোধ করেন; স্মৃতি তাদের দখল করে নেয়, স্বপ্ন আর দুঃস্বপ্ন তাদের জাগিয়ে তোলে, নিশি-পাওয়া মানুষের মতো তারা হাঁটাহাঁটি করেন, ত্রিকালদর্শী বৃদ্ধের মতো তারা একবার কাঁদেন, একবার হাসেন। তারা স্মৃতিতর্পণ করেন। আজাদের মায়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়ে যাবার পরের কটা দিন তারা একা একা, জোড়ায় জোড়ায়, কিংবা ছোট ছোট গ্রুপে বসে এই কাহিনী স্মরণ করেন। বলাবলি করেন। ঘাঁটাঘাঁটি করেন।

বিচিত্রা সম্পাদক শাহাদত চৌধুরীর চশমার পুরু লেন্স ঝাপসা হয়ে আসে বাষ্পে, তিনি কান্না লুকাতে পারেন না, আরেকটু সাবধান বোধহয় হওয়া উচিত ছিল, এই নির্দেশ হয়তো তাঁরই দেওয়া উচিত ছিল, আর আমরা কী রকম বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিলাম, ভেবে দ্যাখো, একদিন প্রকাশ্য দিবালোকে আমরা গাড়িতে যাচ্ছি আর ছেলেমানুষের মতো বাজি ধরছি, চল, এসএমজি পাশে রেখে নিয়ে যাই তো, দেখি না কী হয়, আর সত্যি আমরা এসএমজি পাশে রেখে ট্রিগারে আঙুল ধরে যাচ্ছি, সামাদ ভাই নির্বিকার গাড়ি চালাচ্ছেন, এটা তো ছিল শুধুই অ্যাডভেঞ্চার, খালেদ মোশাররফ বলতেন, কাউবয় অ্যাডভেঞ্চার। কাজী কামালের মনে হয়, অবশ্যই প্রত্যেকটা হাইড আউটে সেন্ট্রি রাখা উচিত ছিল, আর ওই রাতে এলএমজির দখলটা পুরোপুরি নিয়ে নিতে পারলে... জুয়েল, আজাদ, বাশার সবাইকে নিয়েই তো বেরিয়ে আসা যেত, হয়তো... সৈয়দ আশরাফুল হকের মনে হয়, কেন তিনি ছাড়তে গেলেন জুয়েলকে, ওই রাতে, আর কেনই বা বদি শেষের দুই রাত তাদের বাসায় না থেকে অন্য জায়গায় থাকতে গেল? জায়েদ হাহাকার করে ওঠে : 'দাদা ক্যান আমার কথা বিশ্বাস করল না, কামরুজ্জামানরে দেইখাই তো আমি বুইঝা ফেলছিলাম, ওই বেটা ক্যান ঘুরঘুর করে আমগো বাড়ির চারদিকে।' ইব্রাহিম সাবেরের মনে পড়ে, ওইদিন দুপুরবেলা দোকানে তিন যুবকের চোখমুখ দেখেই তিনি বুঝেছিলেন এরা ইনফরমার হতে পারে, তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন আজাদকে, আজাদ শোনেনি... শহীদুল্লাহ খান বাদল হিসাব মেলাতে পারেন না, ২৭শে মার্চ তারা রওনা দিলেন চার জন, যুদ্ধশেষে ফিরে এলেন দুজন, 'বদি যে আমাদের দুজনের হাত কেটে রক্তের সঙ্গে রক্ত মিশিয়ে বলে গেল আজ থেকে আমরা রক্তের ভাই, সে কেন আর আসে না, আশফাকুস সামাদ আশফি ভুরুঙ্গামারীর যুদ্ধে শহীদ হয়েছে, সে তো আর আসবে না... যেন এখনও বাদল শুনতে পান স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে প্রচারিত আশফির শহীদ হওয়ার সংবাদটা, সেক্টর টু'তে বসে তারা খবরটা শোনেন, তোপধ্বনি করা হয় এই বীরের সম্মানে, স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলেন হায়দার, তাঁর নিজের হাতে গড়া ছেলে!

নিদ্রাহীনতায় জেগে ওঠেন নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু, যখন তিনি তাকান বিগত ১৪টা বছরের দিকে, খেই খুঁজে পান না, খালেদ মোশাররফ বলতেন, স্বাধীন দেশ জীবিত গেরিলার চেয়ে পছন্দ করে শহীদ যোদ্ধাদের, কোথায় গেল সেই যুদ্ধ, কোথায় সেই আগুনের পরশমণি ছোঁয়ানো দিনগুলো, যুদ্ধের পরে শুধু ধ্বংসের শব্দ, শুধু অবক্ষয়ের চিত্র, একে একে মরে যাচ্ছে মুক্তিযোদ্ধারা, রক্ষীবাহিনীর হাতে মরল মুখতার, এখানে

ওখানে কতজন মরল, কয়েকজন অধঃপাতে গেল, চোখের সামনে একে একে কেবল মুক্তিযোদ্ধাদেরই চলে যাওয়ার ছবি, সার সার।
টগরের মাথার ওপর দিয়ে সব পাখি একে একে বিদায় নেয়, যাওয়ার আগে যেন শেষতম পাখিটা বলে যায় বঙ্গবন্ধু নাই, তাজউদ্দীন আহমদসহ চার নেতা নাই, খালেদ মোশাররফ নাই, হায়দার নাই, জিয়াউর রহমান নাই, কে আছে আর মুক্তিযোদ্ধাদের...
নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু ঘুমুতে পারেন না, বহু মুক্তিযোদ্ধা বিহ্বলের মতো আচরণ করে, চারপাশের মানুষগুলো তাদের বুঝতে পারে না...তারাও বুঝে উঠতে পারে না চারপাশের জগতকে।
ঘোর লাগা নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু যান শাহাদত চৌধুরীর বাসায়। 'বাচ্চু আসো, বসো'-শাচৌ বলেন।
বাচ্চু বলেন, 'শাহাদত ভাই, আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এলাম।'
'বসো। বসে বলো, কী তোমার কথা?' শাচৌ বলেন।
বাচ্চু বলেন, 'শাহাদত ভাই, আচ্ছা বলেন তো এই দেশে আম্মা, মানে জাহানারা ইমামের মতো মা আছেন?'
'হ্যাঁ। বলো।'
'আজাদের মায়ের মতো মা ছিলেন?'
শাচৌ চুপ করে তাকিয়ে থাকেন বাচ্চুর মুখের দিকে।
'তাঁরা তাদের ছেলেদের হাসিমুখে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন, দেশের জন্যে, মানুষের জন্যে, আমাদের সবার ভালো থাকার জন্যে...' বাচ্চু বলে চলেন।
শাচৌ মাথা নাড়েন। 'হ্যাঁ...'
'তাহলে বীরের এ রক্তস্রোত, মায়ের এ অশ্রুধারা, এসব কি ধরার ধুলায় হারা হয়ে যাবে? শাহাদত ভাই, ইতিহাসে এটা কি হতে দেখেছেন... এত এত লোক আত্মত্যাগ করল, নিজের জীবনের চেয়ে বড় আর কী হতে পারে, সেই জীবন দিয়ে দিল, আর মায়ের কাছে ছেলের চেয়ে বড় ধন আর কী, মায়েরা হাসিমুখে ছেলেদের তুলে দিলেন মৃত্যুর হাতে, সব বৃথা যাবে?'
পুরোটা ঘরে তখন অসহ্য নীরবতা।
বাচ্চু বলেন, 'শাহাদত ভাই, আবুল হাসানের একটা কবিতা আছে না, তোমরা আমার না পাওয়াগুলো জোড়া দাও, আমি তোমাদের ভালো থাকা হবো, আছে না? আছে। তাহলে আজাদের মায়ের না পাওয়াগুলো জোড়া দিলে আমাদের সবার ভালো থাকার দিন আসে না? এই দেশটার ভালো হবে না? শাহাদত ভাই বলেন।'

শাহাদত চৌধুরী মাথা নিচু করে থাকেন। বাচ্চুর এই প্রশ্নের জবাব নিশ্চয়ই 'হ্যাঁ'। এই দেশটার একদিন ভালো হবে, এই দেশের মানুষের সবার ভালো হবে, আমাদের সন্তানেরা সবাই দুধভাতে থাকবে, এত এত মানুষের এত এত আত্মত্যাগ বৃথা যেতে পারে না। কিন্তু কই, সেই সুসময় তো আসে না...
নীরবতা, পাথরের মতো নীরবতা নেমে আসে ওই ঘরটায়, তাদের বুকের ওপর, সমস্তটা দেশের ওপর। শাহাদত চৌধুরীর মনে পড়ে, আলমও প্রায়ই বলে, 'আমরা তো যুদ্ধ শেষেই পাস্ট টেন্স হয়ে গেছি। এখন আমার পরিচয় কী? হাবিবুল আলম বীরপ্রতীক, মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। ১৭ ডিসেম্বর থেকেই আমাদের অতীত ইতিহাস করে দেওয়া হয়েছে।' শাহাদত চৌধুরীরও মনে হয়, মুক্তিযুদ্ধকে জাতির সত্তায় বপন করতে দেওয়া হয়নি। খালেদ মোশাররফ তো বলতেনই, স্বাধীন দেশ জীবিত গেরিলা চাইবে না, তার চাই শহীদ...
খানিকক্ষণ নীরব থেকে শাচৌ বলেন, 'বাচ্চু, তুমি বসো। তোমার মনের কথাগুলো লিখে ফেলো। সামনে আমার বিজয় দিবস সংখ্যা, ওতে আমি তোমার এই কথাগুলো ছাপব।' তাকে টেবিলে বসিয়ে কাগজ কলম ধরিয়ে দেন তিনি।
সারা রাত জেগে বাচ্চু লিখে ফেলেন তাঁর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক আবেগময় স্মৃতিগাথা : ঘুম নেই।

৬৪

আজাদের মাকে দাফন করে এসে জাহানারা ইমাম কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে বসেন। কারণ তিনি মা। একটা লোক যখন মরে যায়, ভাইয়ের কাছে সেটা চলে যাওয়া, বোনের কাছে সেটা শূন্যতা, বাবার কাছে তার নিজেরই ধারবাহিকতার ছেদ, বন্ধুর কাছে সেটা অতীত স্মৃতি আর বিস্মৃতির দোলাচল, পড়শির কাছে তা দীর্ঘশ্বাস, দেশের কাছে কালের কাছে হয়তো তা প্রিয়তম পাতার ঝরে যাওয়া, কিন্তু মায়ের কাছে? মায়ের কাছে সন্তানের মৃত্যু হলো সমস্ত সত্তাটাই মৃতের দ্বারা দখল হয়ে যাওয়া, মায়ের স্মৃতি, মায়ের অস্তিত্ব, তাঁর নিদ্রা, তাঁর জেগে থাকা, তাঁর স্বপ্ন, সবটা জুড়েই পুনর্বার জন্ম নিয়ে বিপুলভাবে বেড়ে উঠতে থাকে তাঁর গতায়ু সন্তানটিই। তাঁর পরিপার্শ্ব, তাঁর চারপাশের জগৎ একজন সন্তানহারা মায়ের এই গোপন বিপুল রক্তক্ষয়ী নিজস্ব সংগ্রামটাকে বুঝতে পারে না, আসলে আনে না।
সন্তান নাই এই সত্যটা মেনে নিতে না পেরে মা করে চলেন তাঁর নিজস্ব সংগ্রাম, বিস্মৃতির বিরুদ্ধে স্মৃতির সংগ্রাম; বিলাপ করে, সন্তানের স্মৃতি বয়ান করে, তার ছবি বুকের মধ্যে,

ঘরের মধ্যে, ট্রাঙ্কের মধ্যে সংরক্ষণ করে, তার নামে কুরবানি দিয়ে, তার নামে গাছ লাগিয়ে, ফল ফলিয়ে তিনি চালিয়ে যান এই তাঁর এই একাকী নিজস্ব ব্যক্তিগত সংগ্রাম। তা-ই করতে বসেন জাহানারা ইমাম, লিখে চলেন একাত্তরের ডায়েরি, বুকে পাথর বেঁধে, দিনের পর দিন, পৃষ্ঠার পরে পৃষ্ঠা। নিশ্চয় শহীদ জুয়েলের মা, শহীদ বদিউল আলমের মা, শহীদ বাশারের মা, শহীদ বাকেরের মা, বাংলাদেশের আর লাখো শহীদের মা, নিজ নিজ ধরনে বিস্মৃতির সুষুপ্তির বিরুদ্ধে একা জেগে থাকেন। আর তাঁদের সেই একাকী স্মরণসংগ্রামের প্রতীক হয়ে শহীদ মিনারের মধ্য মিনারটা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে, মায়ের দুপাশে চারটা সন্তানসমেত, দিন নাই, রাত্রি নাই, কি রোদে, কি বৃষ্টিতে!

উপসংহার

আজাদ ধরা পড়ার পর ৩১ বছর পরে, আজাদের মাকে দাফন করার ১৭ বছর পরে একজন ক্ষুদ্র-সামর্থ্য লেখক, আরেক ৩০ আগস্টে আরম্ভ করে আজাদের অপূর্ণ একটা ইচ্ছা পূর্ণ করার অসম্ভব কাজটি : আজাদের মায়ের কথা সবাইকে জানানো, আজাদের মায়ের জীবনী রচনা করা। আজাদ মাকে লিখেছিল সে যদি নামকরা হয়, বড় হয়, তাহলে সে সবাইকে জানাবে তার মায়ের কথা। রচনা করবে তাঁর জীবনী! আজাদ অনেক বড় হয়েছে, এত বড় যে তার সমান আর কেই-বা হতে পারে, নামকরা হয়েছে, এর চেয়ে বেশি নামকরা আর কীভাবে হওয়া যাবে? এখন আজাদের বাবা বেঁচে নাই, ইস্কাটনের বাসাটাও বিক্রি ও ভাঙা হয়ে গেছে, ওখানে উঠছে বড় অ্যাপার্টমেন্ট, ৩৯ মগবাজারের বাসাটা একই রকম আছে, কামরুজ্জামান মারা গেছে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে ভুগে ভুগে। শহীদ ক্রিকেটার জুয়েলের নামে প্রতি বছর গঠন করা হয় শহীদ জুয়েল স্মৃতি একাদশ আর শহীদ মুশতাকের নামে গড়া হয় শহীদ মুশতাক একাদশ, দুদলের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় স্বাধীনতা দিবস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট।

জাহানারা ইমাম আর বেঁচে নাই, কিন্তু রয়ে গেছে তাঁর একাত্তরের দিনগুলি, মুক্তিযোদ্ধারা অনেকেই আছেন, কেউ কেউ নাই, বাংলাদেশ আছে, স্বাধীনতা আছে, কী জানি, এই বাংলাদেশ তাঁদের কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশের সঙ্গে মেলে কি না, টগর চাকরি করে ব্যাঙ্কে, তাদের দুলাভাই শহীদ মনোয়ার হোসেনের নামে একটা স্টেডিয়ামের নামকরণ হয়েছিল খিলগাঁও মসজিদের পশ্চিম দিকে মুক্তিযুদ্ধের পরপর, সেটা আর নাই, তাঁর মেয়ে লীনার বয়স এখন ৩১ কি ৩২, জায়েদ ও চঞ্চল দাঁড়িয়ে গেছে নিজের পায়ে, তাদের আম্মার দোয়ায় তারা এখন সচ্ছল, আর তারা তাদের আম্মার কবরটা পাকা করে টাইলস্-শোভিত করে রেখেছে আম্মারই রেখে যাওয়া টাকা দিয়ে; আজও যদি কেউ যায় জুরাইন গোরস্তানে, দেখতে পাবে কবরটা, আর দেখতে পাবে প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ মায়ের পরিচয় : মোসাম্মৎ সাফিয়া বেগম, শহীদ আজাদের মা।

গ্রন্থপঞ্জী ও তথ্যসূত্র

১. 'আগরতলা মামলা', শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ : ফয়েজ আহ্মদ, প্রকাশক : সাহিত্য প্রকাশ।

২. আমাদের সংগ্রাম চলবেই, প্রকাশক : অপরাজেয় সংঘ।

৩. একাত্তরের দিনগুলি : জাহানারা ইমাম, প্রকাশক : সন্ধানী প্রকাশনী।

৪. ঘুম নেই, নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু, প্রকাশক : চেতনা প্রকাশন।

৫. টিটোর স্বাধীনতা, নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু : চেতনা প্রকাশন।

৬. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র : সম্পাদনা-হাসান হাফিজুর রহমান, প্রকাশক : তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার।

৭. বাঙালির ইতিহাস, ড. মোহাম্মদ হাননান, প্রকাশক : অনুপম প্রকাশনী।

৮. ভুলি নাই, ভুলি নাই : গোলাম মোর্তোজা সম্পাদিত, প্রকাশক : সময় প্রকাশন।

৯. মুক্তিযুদ্ধ, সিদ্দিকুর রহমান, প্রকাশক : ঢাকা প্রকাশনী।

১০. মুক্তিযোদ্ধা হাবিবুল আলম বীরপ্রতীক-এর লেখা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রকাশিতব্য স্মৃতিচারণ গ্রন্থের ইংরেজি পাণ্ডুলিপি।

১১. শাশ্বত : তাহমীদা সাঈদা, প্রকাশক : সন্ধানী প্রকাশনী।

১২. সাধু গ্রেগরির দিনগুলি : শাহরিয়ার কবির, প্রকাশক : দিব্যপ্রকাশ।

১৩. সাপ্তাহিক ২০০০ পত্রিকায় প্রকাশিত হাবিবুল আলম বীরপ্রতীক লিখিত ঢাকার বিভিন্ন অপারেশনের স্মৃতিচারণ।

১৪. স্বাধীনতা সংগ্রাম, ঢাকায় গেরিলা অপারেশন : হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ, প্রকাশক : সময় প্রকাশন।

১৫. হাসান হাফিজুর রহমান, বিমুখ প্রান্তরে অনির্বাণ বাতিঘর : মিনার মনসুর, প্রকাশক : বাংলা একাডেমী।

লেখকের নেওয়া নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার
(আগস্ট ২০০২ থেকে মার্চ ২০০৩)

১. আজাদের ছোটমা

২. আবুল বারক আলভী, মুক্তিযোদ্ধা, শিল্পী

৩. ইব্রাহিম সাবের, সাবেক বাস্কেটবল খেলোয়াড়, শহীদ আজাদের বন্ধু

৪. গাজী আমিন আহমেদ, মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ আজাদের দূর-সম্পর্কিত ভাই প্রাক্তন বামপন্থী রাজনীতিক

৫. গাজী আলী হোসেন, মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ আজাদের দূর-সম্পর্কিত চাচা,

৬. ফেরদৌস আহমেদ জায়েদ, শহীদ আজাদের খালাতো ভাই, ৩০শে আগস্ট ১৯৭১ গুলিবিদ্ধ

৭. মুক্তিযোদ্ধা কাজী কামাল উদ্দিন আহমেদ বীরবিক্রম

৮. মুক্তিযোদ্ধা নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু

৯. মুক্তিযোদ্ধা হাবিবুল আলম বীরপ্রতীক

১০. মুসলেহ উদ্দিন চৌধুরী টগর, শহীদ আজাদের খালাতো ভাই, ৩০শে আগস্ট ১৯৭১ গুলিবদ্ধ

১১. শহীদুলাহ খান বাদল, মুক্তিযোদ্ধা

১২. শাহাদত চৌধুরী, মুক্তিযোদ্ধা, সম্পাদক সাপ্তাহিক ২০০০

১৩. শিমুল ইউসুফ; অভিনেত্রী

১৪. সৈয়দ আশরাফুল হক, সাবেক ক্রিকেটার, শহীদ আজাদের বয়ঃকনিষ্ঠ বন্ধু

১৫. আরো একাধিক ব্যক্তি (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক)

এবং

মাকে লেখা আজাদের চিঠি, ফেরদৌস আহমেদ জায়েদের সূত্রে প্রাপ্ত।